আবুল মনসুর আহমদ

বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা

আমাদের স্বাধীনতা

বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা

আমাদের স্বাধীনতা

আবুল মনসুর আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম সংস্করণ | জানুয়ারি ১৯৮২
পৌষ ১৩৮৮

পঞ্চম মুদ্রণ | জুলাই ২০১৪
শ্রাবণ ১৪২১

প্রচ্ছদ | সমর মজুমদার

বর্ণবিন্যাস | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য | তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

BESHI DAMEY KENA KOM DAMEY BECHA AMADER SWADHINATA : *(OUR FREEDOM : Purchased of high price & sold cheap) Selected Essay by Abul Mansur Ahmed Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : January 1982 & 5th Edition : July 2014*

Price : Tk. 350.00 & $ 20 Only.

ISBN 978 984 11 0723 9

ভূমিকা

জনাব আবুল মনসুর আহমদ (মরহুম) আমার সাংবাদিকতার গুরু। যাহাকিছু শিখিয়াছি তাঁহার নিকট হইতেই শিখিয়াছি। তাঁহার হাতে তৈরী বহু শিষ্যে-র মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে আমিই প্রবীণতম। জনাব আবুল মনসুর আহমদ আমার পরমাত্মীয়ও বটেন। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর আমি তাঁহার সহিত যত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি ততটা সম্ভবতঃ তাঁহার কোন শিষ্যই পান নাই। লেখার বাহিরেও অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মত বিনিময় হইয়াছে বিতর্কও হইয়াছে। মতবিভিন্নতাও যে একেবারে ঘটে নাই, তাহাও নয়। কিন্তু আমার মহান গুরু এতই মহৎ ও উদারপ্রাণ ছিলেন যে, নিজের বিশ্বাস ও মতবাদে তিনি অটল থাকিয়াও শিষ্যের বক্তব্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিতেন। এই ধরনের মহত্ব আজকাল ক্রমেই দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁহার প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের জন্য এতই প্রখ্যাত যে, তাঁহাকে পরিচিত করাইতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্ঠতা। ইহা লণ্ঠন জ্বালাইয়া সূর্য দেখাইবারই নামান্তর। তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার সুযোগ পাওয়াও আমার জন্য এক পরম সৌভাগ্য। ইহা আমার পক্ষে এক গর্বের বিষয়। স্বীয় ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ এ দেশে এক অনন্য প্রতিভা। লিখি আমরা অনেকেই। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদের লেখায় প্রজ্ঞা ও প্রফেটিক দূরদর্শিতা আমার বা আমাদের অনেকেরই লেখায় অবর্তমান। আবুল মনসুর সাহেব দশ বছর আগে যাহা বলিয়া বা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবি, এতো আগাম সত্য তিনি কি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন?

সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়স্বার্থের প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দল ও মহলকে সাবধান করিতে গিয়া তাঁহার ন্যায় মহান প্রতিভাধর প্রবীণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেও কখনও কখনও হুমকির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি সেসব হুমকির জবাব তাঁর অননুকরণীয় মিছরির ছুরিতে ও ভঙ্গিতে এমনিভাবে দিয়াছেন যাহার মোকাবিলায় ক্ষমতামত্তরাও স্তব্ধ হইয়া পরাভব মানিয়াছেন।

যদি বলি, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন জাতির বিবেকের সদ্য-জাগ্রত প্রহরী, তবে বোধ করি বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি হইবে না। জাতির সম্মুখে যখনই কোন সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে আমার বিজ্ঞ দূরদর্শী গুরু তখনই জাতির উদ্দেশে দ্ব্যর্থহীন সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। জাতির কর্ণধাররা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার সতর্কবাণী গ্রাহ্য করেন নাই। তাই তাঁহারা উহার মূল্যও নিদারুণ ও মর্মান্তিকভাবে দিয়াছেন।

'বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা' গ্রন্থে যে ৪২টি নিবন্ধ রহিয়াছে সেগুলির মধ্যে প্রথম ৩৯টি ১৯৭২ ও ৭৩ সালে দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এ প্রকাশিত হইয়াছে। আমার গুরু তখন অন্য কাগজে লিখিতেন। আমি সেই সময় ছিলাম 'ইত্তেফাক'-এর সিনিয়র লিডার রাইটার ও কলামিস্ট (স্পষ্টভাষী)। আমিই তাঁহাকে 'ইত্তেফাক'-এ লিখিতে সম্মত করাই। গুরুশিষ্যের এমনি সম্পর্ক ছিল যে, শিষ্যের আবদার তিনি কখনও ফেলতে পারিতেন না। তিনি এতই উদার ছিলেন। এবং আমার উপর তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, প্রয়োজনবোধে তাঁহার লেখা 'সংশোধনের' জেনারেল পাওয়ার-অব-এ্যাটর্নি তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। অবশ্য সেই পাওয়ার আমার প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে নাই, উঠিতে পারে না।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত ৪২-টি নিবন্ধ পাঁচ মিশালী হইলেও প্রত্যেকটির মূল বক্তব্য অভিন্ন। অর্থাৎ নানান দিকে উদ্ভূত জাতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেরই পথ-নির্দেশনা তিনি লেখাগুলিতে দিয়াছেন। অনেক বিষয়ে তিনি লেখা ও আলোচনা শুরু করিয়া উহাকে আগাইয়া যাইবার দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন আমার ন্যায় অযোগ্য শিষ্যের উপর। আমি সাধ্যানুসারে সেই ইস্যুগুলিকে জাতির সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফল হইয়াছি 'স্পষ্টভাষী' ও 'মর্দে মু'মীন'-এর পাঠকগণই তাহা বলিতে পারেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাট-এর কথাই বলি। প্রস্তাবিত জুট ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে আট-নয় বছর আগে আমার গুরু যে-হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন (এবং যাহা লইয়া আমি এবং মোহাম্মদ আখতার-উল-আলমও অনেক লিখিয়াছি) কোন কোন মহলের একগুঁয়েমিতে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পাট সম্মেলনের (জেনিভা) ব্যর্থতা তাহারই নির্ভুলতা প্রমাণ করে। এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে কিন্তু ভূমিকাকে দৃষ্টান্ত ভারাক্রান্ত না-করিয়া বক্ষ্যমান বিষয়সমূহের বিচারের ভার আমি আমার গুরুর এই মূল্যবান গ্রন্থের বিজ্ঞ পাঠকদেরই জন্য রাখিয়া দিলাম। আজ ৩০শে মে (৮১)' আমাদের 'এক' নিদারুণ জাতীয় শোকের দিন। আজ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া আমার গুরুকেই বার বার মনে পড়িতেছে।

'আহমদ পাবলিশিং হাউস' এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জাতির যুগ সন্ধিক্ষণে একটি অমূল্য অবদানই রাখিয়াছেন। আমার জান্নাতবাসী গুরুর এই অমূল্য গ্রন্থ জাতিকে অনেক বিষয়ে সঠিক পথ-নির্দেশনা দান করিবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আহমদ পাবলিশিং হাউস-কে আমার শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

"মালঞ্চ"
১৮-বি, ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা।
৩০-৫-১৯৮১ ইং

খোন্দকার আবদুল হামিদ
(স্পষ্টভাষী)

এই বই প্রসঙ্গে দু'টি কথা

'বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা' মরহুম আবুল মনসুর আহমদের রচিত স্বাধীনতা উত্তর রচনাবলীর সমাবেশ। এর বেশিরভাগই দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছিল। এর আগে প্রকাশিত 'শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু' ও 'End of a betrayal' গ্রন্থ দুইটি ছিল প্রাক স্বাধীনতা যুগের প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। এই জাতীয় বইয়ের সবচাইতে বড়ো আকর্ষণ ছিল লেখকের স্বলিখিত ভূমিকা। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান বইয়ে লেখকের স্বলিখিত ভূমিকার স্থান পাইবার কোন উপায় নাই। বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতির অঙ্গনের অতিমানব আবুল মনসুর আহমদ ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন দূরে বহুদূরে। তাঁর বইয়ের ভূমিকাই ছিল বইগুলির প্রধান আকর্ষণ। ইহা ছাড়া এই ভূমিকাতেই থাকিত বিভিন্নমুখী প্রবন্ধগুলির সার্থক সারমর্ম। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব পালনের অনুরোধ লইয়া উপস্থিত হইলাম তাঁরই সুযোগ্য ভাবশিষ্য বিখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার জনাব খোন্দকার আবদুল হামিদের কাছে। অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটি প্রকাশ করিবার গুরুদায়িত্ব পালন করিলেন আহমদ পাবলিশিং হাউসের স্বত্ত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় মহিউদ্দীন আহমদ সাহেব। ধন্যবাদ জানাই তাঁহাকেও।

আবুল মনসুর আহমদ নিছক সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই কলম ধরেন নাই। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন ছিল একটি নিবেদিতপ্রাণ মিশনারীর জীবন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সাফল্য ছিল অসাধারণ এবং অনন্য। প্রচুর রক্তপাত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এই স্বাধীনতা আবুল মনসুর আহমদের দৃষ্টিতে বিপন্ন বলিয়া ধরা পড়ে। এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে লব্ধ স্বাধীনতা; নেতৃত্বের দুর্বলতায় ও ভুলের ফলে আজ সব দিক দিয়াই বিপন্ন। বৈদেশিক নীতি প্রায়-তাঁবেদারিতে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বের বহুদেশই আমাদের সার্বভৌমত্বের দাবির প্রতি সন্দিহান। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সস্তায় বিকাইয়া দেওয়ার মত অবস্থার উৎপত্তিতে শঙ্কিত রাজনৈতিক-দার্শনিক আবুল মনুসরের হুঁশিয়ারী ছিল সময়োচিত। সাহিত্য-সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই হুঁশিয়ারী ছিল বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই সাংস্কৃতিক বিপত্তির দিকেই ছিল আবুল মনসুর আহমদের এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত। এই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা লইয়াই ছিল তাঁর আগাগোড়া আপোষহীন সংগ্রাম।

বন্ধুবর বিচারপতি মোস্তফা কামাল ২৩শে মার্চ ১৯৮০-র দৈনিক ইত্তেফাকে 'আবুল মনসুর আহমদ' শীর্ষক নিবন্ধে বলিতেছেন: "আবুল মনসুর আহমদ" একজন বিস্ময়কর প্রতিভা। ...স্বদেশী আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙ্গালিদের স্বাধিকার আন্দোলন–এদেশের অর্ধশতাব্দীব্যাপী তাবৎ রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কখনও সক্রিয় কর্মীর, কখনও নেতার, কখনও পরামর্শদাতার। ...তাঁর গোটা সাহিত্যকর্মই তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও মতাদর্শের একটা অন্যতম বহিঃপ্রকাশ।

...তাঁর কথাটি অত্যন্ত সহজ। পাকিস্তান আমলে তিনি বলতেন, পূর্ব-বাংলা কৃষ্টিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষ্টি ও পূর্ববাংলার কৃষ্টি বিভিন্ন। অথচ ইসলামী কৃষ্টির চিন্তানায়কেরা তাঁর এই বক্তব্যকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। একই সঙ্গে, তিনি বলতেন ঐতিহাসিক পূর্ববাংলার কৃষ্টি পশ্চিমবাংলার কৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র। অখণ্ড বাঙ্গালি কৃষ্টির ধারক ও বাহকরা তা'তে প্রমাদ গুনতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পরও তিনি সমান গুরুত্বের সাথে বলে গেছেন পশ্চিম বাংলা টাওয়ার বাংলা। ঐ টাওয়ার থেকে সব সময় উচ্চারিত হচ্ছে তোমরা মুসলমান থাক, ভদ্রলোক হয়ে টাওয়ার বাংলায় প্রবেশের চেষ্টা কোরো না। ...এক ভাষাভাষি হওয়া সত্ত্বেও দুই দেশের সাহিত্য আজ পরিষ্কারভাবে বিভিন্ন। নতুন চলার এই ইঙ্গিত দিয়েই আবুল মনসুর আহমদ বিদায় নিয়েছেন।"

বন্ধুবর মোস্তফা কামাল মরহুমের জীবন-দর্শনের সূক্ষ্মসুরটি সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা দৃষ্টিগ্রাহ্য কিন্তু কৃষ্টিক পরাধীনতা ধরাছোঁয়া ও দৃষ্টির ঊর্ধ্বে। তাই এই পরাধীনতা মারাত্মক ক্ষতিকর। আমরা রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যাই, অর্থনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সমাজবাদী হই, কিন্তু কৃষ্টিক স্বাধীনতার জন্য আমাদের কোন চেতনার লক্ষণই অনুপস্থিত, যুদ্ধ করা তো দূরের কথা। এই ব্যাপারে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর রচিত "শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু" বইয়ের ভূমিকায় বলিতেছেন, "এ প্রসঙ্গে একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করা আমি কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার অভ্যুদয়কে অভিনন্দিত করিতে গিয়া কেউ কেউ অতি উৎসাহে বলিতে শুরু করিয়াছেন যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে। কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি না করিয়াই এরা এমন কথা বলিতেছেন। স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ে যেটা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে সেটা আসলে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' নয়। শুধু ইসলামের দোহাই দিয়া দু'টি দূরবর্তী ভৌগলিক, ভাষিক ও কৃষ্টিক দেশকে এক রাষ্ট্রে গড়ার যে পাকিস্তানী চেষ্টা হইয়াছিল স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ে সেটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যে ভিত্তিতে ভাগ হইয়াছিল, সেটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নাই, ভ্রান্ত প্রমাণের চেষ্টাও কেউ করে নাই। ....৪৭ সালের বাঁটোয়ারাটা হইয়াছিল ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ধর্মাবলম্বির ভিত্তিতে। হিন্দু মেজরিটি

ভারত আর মুসলিম মেজরিটি ভারত এই দুইটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিকেই 'টুনেশন' থিওরী, বলা হইত। ...আর একটি ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি গণতান্ত্রিক সেকিউলার নেশন স্টেট হিসাবে বাংলাকে গড়িয়া তোলার ব্যাপারে এটি একটি মৌল প্রশ্ন। প্রশ্নটা জটিল এই কারণে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা রাষ্ট্রের বাহিরেও রেস্ ভাষা কৃষ্টিতে বাঙ্গালি এমন একটি মানব-গোষ্ঠী আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নাগরিক। বাংলাদেশের নাগরিকরা আমরা যদি এককভাবে বাঙ্গালি হই তবে ওরা কি? এখানেই বিভ্রান্তির সূচনা। কেউ কেউ 'এপার বাংলা' ও 'ওপার বাংলার' শ্লোগানে এই বিভ্রান্তিকে জটিল করিয়া তুলিতেছেন। এ বিভ্রান্তির নিরসন হওয়া অত্যাবশ্যক। আমাদের রাষ্ট্র নেতারা 'সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালির' বাঙ্গালিত্ব ঘোষণা করিয়া এই তর্কের মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। এর তাৎপর্য এই যে ১৯৪৭ সালের বিভক্ত বাংলার যে অংশ গোড়ায় পূর্ববাংলা ও পরে পূর্ব পাকিস্তান ছিল, বর্তমানে বাংলাদেশ হইয়াছে, এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরাই শুধু রাজনৈতিক অর্থে বাঙ্গালি। এ দেশের বাইরের নাগরিকরা সে অর্থে বাঙ্গালি নন। ...রেস্ ভাষা ও কৃষ্টিতে বাঙ্গালি হইয়াও পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরা ভারতীয়।"

শুরুতে স্রেফ একাকী হইলেও আবুল মনসুর আহমদের সাংস্কৃতিক লড়াই ও জাতীয়তাবাদের উদাত্ত আহবান পরবর্তীকালে দেশবাসীর সাগ্রহ সমর্থন-পুষ্টতার লক্ষণে ভরপুর ছিল। তাঁর রচিত "আত্মকথা"র ভাষায় "ইমার্সনকে বুঝিতে আমেরিকাবাসীর ৫০ বছর লাগিয়াছিল। আমাকে বুঝিতে ১০০ বছর লাগিলেও আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইব না।"

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলিতে বোধহয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। আবুল মনসুর আহমদের মতে এর কোন প্রয়োজন ছিল না। ন্যায়তঃ ও আইনতঃ বাংলা ও বাঙ্গালি নামের প্রকৃত হকদার এই দেশবাসী। এটা আমরা যত তাড়াতাড়ি হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিব ততই আমাদের মঙ্গল। আবুল মনসুর আহমদ এই বইয়ে এর ইংগিত দিয়ে গিয়েছেন নানাপ্রকারে। আমাদের কাজ হইবে তাঁহাকে বুঝিবার বা হৃদয়াঙ্গম করিবার মূদ্দতটা যত কমাইয়া আনিতে পারিব ততই তাড়াতাড়ি আমাদের প্রায় বিক্রীত স্বাধীনতা পুনঃর্জিত হইবে।

৫৪৩-এল, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
রোড নং ১৩, ঢাকা।
১–১–১৯৮২

মহবুব আনাম

সূচিপত্র

গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম	১১ — ১৬
আমাদের কাজ শেষ হয় নাই, শুরু হইয়াছে মাত্র	১৭ — ২২
বাংলাদেশ সরকার কি বিপ্লবী সরকার, না নির্বাচিত সরকার?	২৩ — ২৮
নির্বাচন যেমন ভোটারদের ট্রেনিং স্কুল পরিষদের সেশন তেমনি মেম্বরদের ট্রেনিং স্কুল	২৯ — ৩৪
দেশের রাষ্ট্র-নামে সরকারী চরিত্রের উল্লেখ কি আবশ্যক?	৩৫ — ৩৯
রাষ্ট্র পরিচালনায় যৌবনের অধিকার স্বীকৃতি	৪০ — ৪৪
সংবিধানের বাংলা মুসাবিদায় পরিভাষার উৎপাত	৪৫ — ৫০
সংবিধানে আওয়ামীলীগের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষিত হউক	৫১ — ৫৭
সোহরাওয়ার্দীর জীবনদর্শন—গণতান্ত্রিক পথের দিশারী	৫৮ — ৬২
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থিক পুনর্নির্মাণ	৬৩ — ৬৭
শিমলা-চুক্তির বাস্তবায়ন ও উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি	৬৮ — ৭৩
দ্রব্য-মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি রুখিবে কে?	৭৪ — ৭৮
আমাদের নয়া রাষ্ট্রের জীবনে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব	৭৯ — ৮৪
উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি ও জেনারেল এ্যাসেম্বলীর প্রস্তাব	৮৫ — ৯০
আজিকার বিজয় দিবস হউক আমাদের হলফ নিবার দিন	৯১ — ৯৬
ঐতিহাসিক এগার দফার আলোকে আমাদের শিক্ষা-সংস্কার	৯৭ — ১০০
খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভরতা লাভই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পয়লা শর্ত	১০১ — ১০৫
শিল্পনীতির আগে বাণিজ্য-নীতির মানে ঘোড়ার আগে গাড়ি	১০৬ — ১১১
সরকারী শিল্পলগ্নিনীতি অসম্পূর্ণ কিন্তু বাস্তবানুগ	১১২ — ১১৮
সুখী ও সন্তুষ্ট শ্রমিক-শক্তিই শিল্পোন্নয়নের একমাত্র গ্যারান্টি	১১৯ — ১২৩
পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালিদের ভাগ্য বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়	১২৪ — ১২৮
সংবাদপত্রকে সাংবিধানিক অধিকার ফিরাইয়া দাও	১২৯ — ১৩৩
এবারে খাদ্য-সংকট এড়াইতে সামগ্রিক প্রয়াস লাগিবে	১৩৪ — ১৩৮
পাট বাঁচিলে আমরা বাঁচিব ঃ এ কথা আজো সত্য	১৩৯ — ১৪৪

খাদ্যাভাব পূরণে ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থান	১৪৫ — ১৪৯
প্রথম নির্বাচনেই সংবিধানকে সফল করিতে হইবে	১৫০ — ১৫৪
উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির জন্য সবাইকে 'বাস্তবতা' মানিতে হইবে	১৫৫ — ১৬০
উপমহাদেশের বাস্তবতা আমরা সত্যই বুঝিয়াছি কি?	১৬১ — ১৬৭
শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা আমরা কবে দিব?	১৬৮ — ১৭৩
গণতন্ত্রী সমাজবাদী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা	১৭৪ — ১৮০
প্রস্তাবিত জুট ইন্টারন্যাশনালের উভয় দিক দেখিতে হইবে	১৮১ — ১৮৭
ইমার্জেন্সী বিধান ইমার্জেন্সী আনে, নিরাপত্তা আইন নিরাপত্তা হানে	১৮৮ — ১৯২
দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষণে আমরা যথাকর্তব্য করি নাই	১৯৩ — ১৯৯
'ঐক্যজোটের' যুক্ত ইশতাহার নিতান্ত নৈরাশ্যজনক	২০০ — ২০৭
'গণ ঐক্যজোট' কি আওয়ামী লীগের স্থলবর্তী হইতে চায়?	২০৮ — ২১৩
ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ যত আগে তত ভাল	২১৪ — ২১৮
পাট ব্যবসা বাঁচাইবার চেষ্টা এই মুহূর্তেই করিতে হইবে	২১৯ — ২২৭
আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দলনির্বিশেষে জাতীয় দায়িত্ব	২২৮ — ২৩৪
সাবসিডি নয় সুষ্ঠু পরিচালনাই পাটশিল্পের রক্ষাকবচ	২৩৫ — ২৪৩
আদর্শগত বিভ্রান্তি দূর করাও একটা বড় কাজ	২৪৪ — ২৫১
রেভলুশনের বৃত্ত-চক্র অন্তে বৃত্তান্ত-চক্রান্ত আসিবেই	২৫২ — ২৫৮
শিল্পকারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের শরীক কর	২৫৯ — ২৬৪

গণতন্ত্র সমাজবাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম

আমাদের বর্তমান সরকারের ঘোষিত চারটি মৌলনীতির দুইটি গণতন্ত্র ও সমাজবাদ। দেশবাসী আশা করিয়াছিল, অন্ততঃ শাসকদল ঐ চারটি মৌলনীতি সম্বন্ধে একমত। কিন্তু স্বাধীনতার ছয় মাস যাইতে না-যাইতেই শাসকদলের শক্তিশালী সমর্থক ছাত্রলীগের মধ্যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ লইয়া মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। সে মতভেদ বিভেদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। খোদ আওয়ামী লীগের মধ্যে এই বিরোধ সংক্রমিত হইয়াছে। গণতন্ত্রে মতভেদ শুধু সহনীয় নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে। সে মত-বিভিন্নতা বিরোধ ও সংঘাতে রূপান্তরিত হইবে এবং তা' শেষপর্যন্ত দল ভাঙ্গাভাঙ্গিতে পরিণত হইবে, কোনও সময়েই তা বাঞ্ছনীয় নয়, নয়া রাষ্ট্রের ফর্মেটিভ মুদ্দতে ত নয়ই।

অথচ এ মতবিরোধ অনিবার্য ছিল না। বিতর্ক ও আলোচনার দ্বারা এ মতভেদের অবসান করা যাইত। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি যে, নেতারা অনেক সময় ব্যক্তিক বিরোধকে আদর্শিক বিরোধের রং দিয়া ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে জাস্টিফাই করিয়া থাকেন। ফলে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, দেশী ও বিদেশী এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতীয় অনেক বিরোধ ও সংঘাতকে আদর্শিক বিরোধ বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা যাইবে, তার অনেকগুলিই আসলে আদর্শিক বিরোধ নয়। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক বিরোধ সম্বন্ধেও মোটামুটি একথা সত্য। আর যদি বিচারে কোনও বিরোধ সত্যসত্যই আদর্শিক বিরোধ প্রমাণিত হয়, তবে তাও দোষের নয়। কারণ, তাতে দেশবাসীর কাছে উভয় পক্ষের বক্তব্য স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। দেশবাসী নিজেরা বিচার-বিবেচনা করিয়া গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে। এটাই গণতন্ত্র।

আওয়ামী লীগ পার্টি ও তার সমর্থক ছাত্রলীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। দেশবাসীর বিপুল মেজরিটি গণতন্ত্র চায়। এই কারণেই তারা আওয়ামী লীগের মধ্যে আজও কোন বিরোধ বাধে নাই। কিন্তু বিরোধ বাধিয়াছে সমাজবাদ লইয়া। এক দল বলিতেছেন, তাঁরা 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ' চান। তার মানে তাঁরা শুধু সমাজবাদে সন্তুষ্ট নন। আরেক দল স্পষ্টতঃই সমাজবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য 'মুজিববাদ' কথাটাও ব্যবহার করিতেছেন। এ বিষয়ে আমি অন্যদিন আলোচনা করিব। আজ শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, এঁরা 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ' কথাটা বলিতে চান না, শুধু সমাজবাদেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে' ও শুধু সমাজবাদে ঘোরতর পার্থক্য

রহিয়াছে বলিয়া উভয়পক্ষই বিশ্বাস করেন এবং দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেন। নইলে উভয় দলের মধ্যে এতটা তীব্র বিরোধ ও ভাঙ্গাভাঙ্গি দেখা দিত না। এখন দেখা যাক, এই বিরোধটা কোথায়? তার কারণ কি?

দৃশ্যতঃ সমাজবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে কোনও পার্থক্য করা উচিত না। কারণ, সমাজবাদ নিজেই একটা বিজ্ঞান। সকলেই জানেন সমাজবাদ একটা অর্থনীতি। অর্থনীতি একটা বিজ্ঞান। সেই হিসাবে অর্থ বিজ্ঞানের একটা শাখা সমাজবাদও একটা বিজ্ঞান। পুঁজিবাদও একটা বিজ্ঞান। অতএব, বৈজ্ঞানিক পুঁজিবাদ বলা যেমন অনাবশ্যক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বলাও তেমনি অনাবশ্যক। যেমন অনাবশ্যক বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি বলা। কিন্তু যতই অনাবশ্যক হউক, প্রশংসাসূচক গুণবাচক বিশ্লেষণ হিসাবে বৈজ্ঞানিক শব্দটা আমরা নিজ নিজ পছন্দের বিষয়-বস্তুতে প্রয়োগ করিয়া থাকি। সোসিয়ালিযম ও কমিউনিযমের মত আধুনিক মতবাদগুলি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক মতবাদ হওয়া সত্ত্বেও ঐ মতবাদের আদি জন্মভূমির বই-পুস্তকেও 'সায়েন্টিফিক সোসিয়ালিযম' 'সায়েন্টিফিক কমিউনিযম' কথাগুলি বেদেরেগ ব্যবহৃত হইতেছে। কতকটা দেখাদেখি, কতকটা অতি উৎসাহে আমাদের তরুণরাও 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ' দাবী করিতেছেন। কোনও কোনও মন্ত্রী-মেম্বরও বলিয়া ফেলিতেছেন। কাজেই এটা এতদিন দোষের ছিল না। এখন দোষের হইয়াছে। কারণ, এ লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে।

বিরোধটা বাধিয়াছে এই জন্য যে, 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীদের কেউ কেউ 'শ্রেণী-সংগ্রামের' কথা বলিতেছেন। এখান হইতে বিরোধ দানা বাধিয়াছে। 'সংগ্রাম' 'শ্রেণী-সংগ্রাম' 'বিপ্লব' 'চিরস্থায়ী' বা 'চিরন্তন বিপ্লব' ইত্যাদি কথা সমাজবাদী দেশসমূহের গণ-মুক্তি আন্দোলনে এক বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে। শোষণমুক্ত সমাজ গড়নের জন্য, বিশেষত সমাজবাদ কায়েম করিবার জন্য শ্রেণী-সংগ্রাম আবশ্যক, এ কথা ঠিক। কিন্তু যুগ ও পরিবেশ-ভেদে তার আকৃতি ও প্রকৃতির কথা মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজি ক্লাশ-স্ট্রাগল অথবা বাংলা শ্রেণী-সংগ্রাম কোনোটাই আকৃতি-প্রকৃতিতে, সুতরাং প্রয়োগে, উনিশ শতক ও বিশ শতকে একার্থবাচক নয়। সংগ্রাম কথাটা আমরা আজ নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পন্থাতেও অবাধে প্রয়োগ করিতেছি। 'শ্রেণী' চরিত্রও উনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপে যা ছিল, বিশ শতকের শেষার্ধে এশিয়ায় তা নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরিবেশ যা ছিল–যুদ্ধের পরে আজ তা নাই।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। উনিশ শতকে ইউরোপে যখন শিল্প বিপ্লব ঘটে, তখন সবগুলি দেশই জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে সুগঠিত ছিল। সব দেশের অধিবাসীরাই জাতীয়তাবোধে সচেতন ছিল। ফরাসী ও মার্কিন বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধ, সেনস অব ন্যাশনালিজম তাদের তখন খুবই তীব্র ছিল। জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে

তখন বিষম প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতা শিল্পে বাণিজ্যে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রসারিত। সে প্রতিযোগিতায় দেশের রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, সবাই নিজেদের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতেন। এটাই সব যুগে দেশপ্রেম মাপার মাপকাঠি। দেশের স্বার্থ ফেলিয়া নিজের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের কথা চিন্তা করা তৎকালে দেশদ্রোহী স্বার্থপরতার শামিল ছিল। শিল্প মালিকের স্বার্থ আলাদা করিয়া দেখা তখন খুব কঠিন ছিল। অবস্থাটাকে যুদ্ধকালীন মনোভাবের সাথে তুলনা করা যায়। সেই সময়ে রাজা-মন্ত্রীর প্রাসাদবিলাসিতা বা সেনাপতির নিরাপদ দূরত্বের কথা, সে তুলনায় বেতনের স্বল্পতা ও বিপদের ঝুঁকির বিপুলত্ব, যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদের মনেও পড়ে না। তেমন মনে পড়াটা দেশপ্রেমের অভাব বলিয়াই বিবেচিত হয়। তেমনি ছিল উনিশ শতকের ইউরোপের শ্রমিকদের মনোভাব। শ্রমিকদের তেমন মনোভাব মার্ক্সীয় সমাজবাদীর পক্ষে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করা দুরূহ ছিল। সে চেতনা জাগাইবার জন্যই এটাকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলা তাঁদের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। এই কারণেই তৎকালীন সমাজবাদীদের কথার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের উপর এত জোর।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আফ্রো-এশিয়ার যেসব দেশ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাদের জনতার মধ্যে শ্রেণী-চেতনা স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথেই এবং তার মধ্যেই জাগ্রত ছিল। এই অবস্থার পার্থক্য এইভাবে ঘটিয়াছে। ইউরোপে আগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পরে গণতন্ত্রবোধ। আমাদের দেশে আগে গণতন্ত্রবোধ, পরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ইউরোপে স্বাধীনতার ফল গণজাগরণ; এশিয়ায় গণজাগরণের ফল স্বাধীনতা। ইউরোপের জনগণের স্বাধীনতার ওয়ারিশী পাওয়া। আমাদের জনগণের স্বাধীনতা উপার্জন করা। এর ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই গণ-চেতনা পরিস্ফুট ছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপারে দেশের রাজা জমিদার প্রভৃতি বড় লোকেরা হয় বিদেশী শাসকদের পক্ষে থাকিয়া স্বাধীনতার বিরোধিতা করিয়াছেন; নয়ত নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকিয়াছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন চালাইতে হইয়াছে জনগণের সমর্থনে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাদেরই। ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই ধনী-গরীব, ছোট-বড় শ্রেণী-চেতনা স্বাভাবিকরূপেই আসিয়া পড়িয়াছিল। একটা নজির লওয়া যাক। আমরা যখন ছাত্র-তরুণরা এই শতকের গোড়ার দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে কংগ্রেসের স্বরাজস্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেই, তখনই আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রাথমিক উদ্দীপনা কাটিয়া যাওয়ার সাথে সাথেই প্রশ্ন জাগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী তাড়াইয়া দেশ স্বাধীন করিলে আমাদের দেশের কৃষক-প্রজা-শ্রমিকদের তাতে কি লাভ হইবে? স্বাধীনতার ফল এরা কতটুকু ভোগ করিতে পারিবে? কংগ্রেসের মধ্যেই আমরা এসব দাবি তুলি। বাংলা প্রজা সমিতি (পরে কৃষক প্রজা সমিতি) ও ভারতের অন্যত্র কিষাণ সভা গঠন করি।

কলকারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করি। আমাদের নেতা ও মুরুব্বী কংগ্রেস প্রধানরা আমাদের হুঁশিয়ারি দিয়া বলিতেন : ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলাকালে তোমরা কৃষক-প্রজা-শ্রমিকের দাবি দাওয়া তুলিয়া জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাইও না। আমরা নেতাদের হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম; কারণ, আমরা বিশ্বাস করিতাম, আমাদের শ্রেণী-চৈতন্য ও শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অনিষ্ট করিবে না। এ সম্পর্কে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কমরেড মানবেন্দ্র নাথ রায়ের সাথে আমাদের মতভেদের কথাটি এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না। দেশে ফিরিয়া কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর পরই তিনি আমাদের কৃষক-প্রজা সমিতি ছাড়িয়া কংগ্রেসে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। যুক্তি হিসাবে তিনি কৃষক-প্রজা-শ্রমিক দলগুলিকে জাতীয় ঐক্য বিরোধী শ্রেণী প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেন। আমরা এইরূপ জবাব দেই: কংগ্রেস আমাদের ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম। কংগ্রেস কর্মীরা স্বাধীনতার সৈন্যবাহিনী। আমরা কৃষক কর্মীরা সে জাতীয় মুক্তি বাহিনীর একটা রেজিমেন্ট। কৃষক-প্রজা সমিতি সে রেজিমেন্টের ক্যাম্প। জাতীয় মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ড আমরা মানিয়া চলিব। কিন্তু আমাদের এই স্বতন্ত্র ক্যাম্প ভাঙ্গিব না। স্বাধীনতা সংগ্রামে বা স্বাধীনতা লাভের পরে ধনিক-বণিকরা জাতীয় নেতৃত্বকে বিপথগামী করিতে না পারে, এই সব শ্রেণী-ক্যাম্প হইতে আমরা সে বিষয়ে প্রহরীর কাজ করিব। শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিলে এটা সম্ভব হইবে না। বামপন্থী রাজনীতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষজ্ঞ কমরেডরাও আমাদের এ যুক্তিখণ্ডনের পক্ষে কিছু বলেন নাই এবং কৃষক-প্রজা সমিতি ভাঙ্গিয়া দিবার অনুরোধও অতঃপর আর করেন নাই।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময়েও আমরা নিচের তলার মুসলিম লীগ কর্মীরা তেমনি শ্রেণী-চেতনার পরিচয় দিয়াছি। পাকিস্তানে যাহাতে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতার স্বার্থ পদদলিত না হয়, সে উদ্দেশ্যে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগানের সাথে সাথে আমরা 'কৃষাণ-শ্রমিকের পাকিস্তান,' 'সর্বহারার পাকিস্তান,' 'লাংগল যার মাটি তার,' 'জমিদারি-মহাজনি ধ্বংস হউক,' 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ চাই' ইত্যাদি শ্লোগানও মুসলিম লীগ প্ল্যাটফর্ম হইতে হাইকমাণ্ডের সামনেই দিতাম। শুধু কথায় নয়, কাজেও নেতাদের দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছি, বাংলার হক মন্ত্রিসভার জমিদারি-মহাজনি আইন ও সালিশীবোর্ড তার দৃষ্টান্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও লীগ ও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থে অনেক কাজ করিয়াছেন।

এইসব দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, সারা ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা (এবং পাকিস্তান) আন্দোলনের সময়েই জনগণের মধ্যে এবং অন্ততঃ দ্বিতীয় কাতারের নেতাদের মধ্যেও শ্রেণী-চৈতন্য সুস্পষ্টরূপে জাগ্রত ছিল। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরে আজও তা আছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যেও সে চৈতন্য সুস্পষ্ট। তাই আওয়ামী লীগকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান রাখিয়া সাথে সাথে কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ইত্যাদি মেহনতী

শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রলীগ ও ওলামা লীগ ইত্যাদি শিক্ষিত শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান গঠনে আওয়ামী-নেতারা উৎসাহ দান ও সক্রিয় সহায়তা করিতেছেন।

অতএব আমাদের দেশে 'শ্রেণী-সংগ্রামের' মধ্যে 'যুদ্ধের' তীব্রতা থাকিবার কোন মওকা নাই। আরেক কারণে এ দেশে 'শ্রেণী-সংগ্রাম' উৎসাহ পাইবে না। প্রথমত: প্রায় দুই শ' বছরের ইংরাজ শাসনে আমাদের দেশে পুঁজিবাদ গড়িয়া উঠে নাই। যা কিছু গড়িয়াছিল তা আসলে কমপ্রেডরিয়ম বা গোমস্তাবাদ। পাঠান-মোঘল আমলের সামন্তরাজ ও ইংরেজের সৃষ্ট জমিদাররাই ছিলেন আমাদের দেশের দৃশ্যমান শোষকশ্রেণী। স্বাধীনতার পরে ভারত ও পাকিস্তানের উভয়তঃ ইহাদের অবসান ঘটিয়াছে। উঠন্ত বা গড়ন্ত পুঁজিপতিরা আজও এ অঞ্চলের কোথাও সুস্পষ্ট শ্রেণী হিসাবে আকৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। জাতীয়করণ অথবা পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের টানা-পোড়নে পুঁজিপতিরা আজও নিরাকার। এই নিরাকার শোষকদের শোষণ কার্যও গাছের শিকড়ের মতই শতধা-বিভক্ত ও সহস্র ডালে প্রসারিত। আমাদের দেশের এবং আমাদের মতো সদ্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত সাবেক ঔপনিবেশিক দেশসমূহের সর্বত্র পুঁজিবাদের অবস্থা এই যে, ইউরোপীয় সমাজবাদী দেশসমূহের বিশেষজ্ঞদের অনেকের মত এইসব দেশ পুঁজিবাদের স্তর পার না হইয়াই সোজাসুজি সমাজবাদের স্তরে পৌছিতে পারিবে। কাজেই শ্রেণী-সংগ্রাম এখানে অনাবশ্যক।

এটা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় আমাদের দেশের তথাকথিত অতিবিপ্লবীদের কেউ কেউ বলিতে শুরু করিয়াছেন ঃ 'গণতন্ত্র ও সমাজবাদ একসঙ্গে চলিতে পারে না।' এখানেই এই বিপ্লবীদের কল্পিত সমাজবাদের সাথে আমাদের সরকারের সমাজবাদের বিরোধ। কারণ, আমাদের সরকার গণতন্ত্রও চান, সমাজবাদও চান। রাজনীতিতে তাঁরা গণতন্ত্রী আর অর্থনীতিতে তাঁরা সমাজবাদী। গণতন্ত্র ও সমাজবাদের মধ্যে কোনও বিরোধ আছে, এ কথা আমাদের সরকার মনে করেন না।

আমাদের জনগণও যে তাই চায়, তার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গত সাধারণ নির্বাচনে বিপ্লবীরা সোজাসুজি এই কথা ভোটারদের সামনে তুলিয়াছিলেন। তাঁরা বলিয়াছিলেন 'ভোট চাও, না ভাত চাও?' ভোটাররা জবাব দিয়াছিলেন; 'ভোটও চাই, ভাতও চাই।' তাই তাঁরা ভোট ও ভাত দুইটাতেই বিশ্বাসী আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়াছিলেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী সরকার সমাজবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না, এমন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই।

তেমন প্রমাণ পাওয়া যাইবেও না। ঠিক পথে চলিলে আওয়ামী লীগকে গণতন্ত্রও ছাড়িতে হইবে না, সমাজবাদও ছাড়িতে হইবে না। কারণ যে পণ্ডিত যাই বলুন, গণতন্ত্রই আজও দোষ-গুণে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কাজেই জনকল্যাণের দিক হইতে

এটা চূড়ান্ত রাষ্ট্র-নীতি। আর একশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুষম সম্পদ বণ্টনের দ্বারা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিক হইতে সমাজবাদই শ্রেষ্ঠতম অর্থনীতি। পুঁজিবাদী শোষণ হইতে সমাজবাদী সুষম সম্পদ বণ্টনে উদ্বর্তন নিশ্চয়ই একটা বিপ্লব। কিন্তু এ বিপ্লব গণতন্ত্রী সরকার পার্লামেন্টে আইন করিয়া ঘটাইতে কেন পারিবেন না? পুঁজিবাদী শোষকরা যদি রক্তপাত করিবার জন্য অস্ত্র না ধরেন তবে আমরাই তাঁদের রক্তপাত করিতে যাইব কেন? আমরা যে আইন করিয়া জমিদারি-মহাজনি উচ্ছেদ করিলাম, তাতে কয়টা শোষকের রক্তপাত ঘটাইতে হইয়াছিল? ভারত সরকার যে আইন করিয়া শত শত রাজন্যবর্গকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁদের ধন-দওলত, রাজপ্রাসাদ বাজেয়াফত করিলেন, তাতে কোথায় রক্ত-বিপ্লবের দরকার হইয়াছিল? যেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার বিনা রক্তপাতে এসব বিপ্লব ঘটাইতেছেন, সেখানে 'ডিক্টেটরশিপ অব-দি প্রলেটারিয়েটের দরকার কি? ডিক্টেটরশিপ যারই হোক, ডিক্টেটরশিপ ত? যারই হোক ওটা শক্তির ভীতি ত? শক্তির ভয় দেখাইয়া মানুষের কল্যাণ করা যায়, এই বিজ্ঞানোন্নত সভ্যতার যুগে কোনও চিন্তাবিদ সত্যই কি তা বিশ্বাস করিতে পারেন? এটা কি অবুঝ শিশু রোগীকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া তার ভাল করিবার ব্যাপার? মানুষ কি সত্যই অবুঝ শিশু রোগী? আর ডিক্টেটর কি সত্যই মানুষের কল্যাণকামী ডাক্তার? আর এই ডাক্তার নির্বাচন করে কে? 'ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেটারিয়েটের' অর্থ কি কালেকটিভ নেতৃত্ব, না ব্যক্তি-নেতৃত্ব, পার্টি ডিক্টেটরশিপ না পার্সনাল ডিক্টেটরশিপ? বিপ্লবীরা যদি নির্বাচনকে 'বর্জুয়া ধাপ্পা' মনে করেন, তবে তাঁদের এই নেতৃত্ব নির্ধারিত হয় কিরূপে? 'বন্দুকের নলে শক্তির অবস্থান' বলিয়া যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের নেতৃত্ব আসে যেমন বন্দুকের নলের ভিতর দিয়া, যায়ও তেমনি বন্দুকের নলের ভিতর দিয়াই। কার আসা উচিত, আর কার যাওয়া উচিত, সেটাও ঠিক করে বন্দুকধারীরাই, বন্দুকের গুলীতেই।

তাই মানুষ বন্দুকের বুলেটের বদলে ব্যালটকেই নিজেদের কল্যাণের শ্রেষ্ঠতর উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছে। ব্যালট বাক্সকেই সরকার বসানো-নামানোর বেহ্‌তের পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ পরিবর্তনটা ঘটে একের ইচ্ছায় নয়, বহুর ইচ্ছায়।

এই কারণেই গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমাদের তরুণরা আশা করি তা বুঝিবেন। সরকারকে যত উপদেশ, যত চাপ দিবার, এই কাজেই, এই পথেই দিবেন।

১৮ই আগস্ট, '৭২

আমাদের কাজ শেষ হয় নাই
শুরু হইয়াছে মাত্র

আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনার কাজ শেষ হইয়াছে। গণ-পরিষদ তার কর্তব্য সমাধা করিয়াছে। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর সংবিধান চালু হইবে। এ দিককার কাজ মোটামুটি ভালভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে।

আমাদের সংবিধান ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তা নিয়া দুই রকম মতই দেশবাসী শুনিয়াছেন। যাঁরা এটা রচনা করিয়াছেন; তাঁরা বলিতেছেন, এমন জিনিস আর হয় না। যাঁরা সংবিধান রচনায় শরিক হইতে পারেন নাই তাঁরা বলিতেছেন, সংবিধানটা মোটেই ভাল হয় নাই। গণতন্ত্রী দেশে মত-বিভিন্নতা থাকিবেই। এটাই গণতন্ত্রের প্রাণ। সব ব্যাপারের মতই সংবিধান সম্বন্ধেও মত-পার্থক্য আছে, থাকিবে। উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া দেশবাসী যে সিদ্ধান্ত করিবেন, সেটাই ঠিক সিদ্ধান্ত। দেশবাসী সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে এই সংবিধানে ভালও আছে, মন্দও আছে। দুনিয়ার সব বস্তুর মতই আমাদের সংবিধানটি ভালমন্দে মিশ্রিত দলিল। দেশবাসী এটাও বুঝিবেন যে, এটাই স্বাভাবিক। মানুষের তৈয়ারী কোনও বস্তুই ত্রুটিহীন হইতে পারে না। আমাদের সংবিধান ফেরেশতারা রচনা করেন নাই, ফেরেশতাদের জন্যও রচনা করেন নাই। কাজেই এটা নির্দোষ হইতে পারে না। আমাদের সংবিধান শয়তান রচনা করে নাই, শয়তানের জন্যও রচনা করে নাই; কাজেই এটা শুধু দোষে-ভরা হইতে পারে না। আমাদের সংবিধান রচনা করিয়াছেন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মানুষেরাই। মানুষের জন্যই তাঁরা এটা রচনা করিয়াছেন। আমাদের প্রতিনিধিরা আমাদের মতই দোষেগুণে মানুষ। তাঁদের রচিত সংবিধানও কাজেই দোষে গুণে মিশ্রিত। এ সংবিধানের গুণের ভাগ আমাদের কল্যাণে লাগিবে। দোষের ভাগ আমাদের অকল্যাণ করিবে। এটা সবারই জানা কথা। সেই সঙ্গে এটাও সবার জানা কথা যে, সব বিষয়ের ভালমন্দ সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। দুনিয়ায় এমন কতকগুলি বিষয় ও ব্যাপার আছে, যাদের সম্বন্ধে সকলের মত এক নয়। কেউ এটাকে ভাল আর ওটাকে মন্দ বলেন। আর কেউ এটাকেই ভাল এবং ওটাকেই মন্দ বলেন। আমাদের সংবিধানেও এমন বিষয় আছে, যা আমার কাছে দোষের মনে হইলেও অপরের কাছে গুণের। শুধু আমাদের সংবিধানেই নয়, দুনিয়ার সব লিখিত সংবিধানেই এমন দোষ গুণ মিশিয়া আছে। ঐ ঐ দেশ যদি ঐ ধরনের সংবিধান লইয়া

রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশবাসীর কল্যাণ করিতে পারেন, তবে আমরাই বা পরিব না কেন? তাঁদের সংবিধানের যেমন ভাল-মন্দ দুইই আছে, তাঁদের দেশবাসীর মধ্যেও তেমনি বিভিন্ন মতের লোকও আছে। তাঁরা যেভাবে যে পথে যাঁর যাঁর সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশবাসীর কল্যাণ করিতেছেন, আমরা সেভাবে পারিব না কেন?

কাজেই আসল কথা সংবিধানের নির্দোষিতা ও ত্রুটিহীনতা নয়। আসল কথা সংবিধানের প্রয়োগ ও ব্যবহার। দেশের সংবিধান সকল আইনের শ্রেষ্ঠ আইন, সকল হাতিয়ারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার; আইন ও হাতিয়ারের ভাল-মন্দ কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করে প্রয়োগকারীর উপর। আমাদের সংবিধান সম্বন্ধেও অবিকল এই কথাই সত্য। আমাদের শাসকদল ভাল হইলে এই সংবিধান তাঁদের হাতে আমাদের কল্যাণের অস্ত্র হইবে। আর আমাদের শাসকদল মন্দ হইলে এই সংবিধানই আমাদের অকল্যাণ অস্ত্র হইবে। সমালোচকরা এই সংবিধানের যত দোষই দেখান না কেন, এতে অন্ততঃ একটি বিধান ভাল আছে। সেটি এই যে, আমাদের শাসকদলকে ভোটারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হইতেই হইবে। অতএব, কোনও সময়ে আমাদের শাসকদল যদি মন্দ হনও, তবে তখনও তাঁরা ভোটারদের নির্বাচিত সরকার হিসেবেই মন্দ হইবেন। নির্বাচিত সরকারীদল মন্দ হন কখন? একমাত্র উত্তর ঃ ভোটাররা যখন মন্দ হন। ভোটার মানেই দেশবাসী, দেশের জনগণ। গোটা দেশবাসী অথবা তাঁদের মেজরিটি কখনও মন্দ হইতে পারে না। এটা সত্য সত্যই এবং কার্যতঃই অসম্ভব। তথাপি তাঁরা বা তাঁদের মেজরিটি মন্দ লোককে ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন কিরূপে? এটাই চিন্তা ও বিবেচনার বিষয়। এটাই পরখ হইবে আমাদের স্বাধীন দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে। খুব সম্ভব আগামী সালের ৭ই মার্চ সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রসঙ্গেই আজ দু'চারটি কথা আমি বলিতেছি।

দেশের মেজরিটি ভোটার ভুল বা মন্দ কাজ করিতে পারেন একাধিক পথে, উপায়ে ও রকমে। মেজরিটির সকলে একযোগে একত্রে বা ঐক্যবদ্ধভাবে সে ভুল বা মন্দ কাজ কখনও করেন না। তেমন ঐক্যবদ্ধভাবে কোন এক দলকে মেজরিটি ভোটাররা যদি ভোট দিয়া নির্বাচিত করেন, তবে সেটা খুব কম ক্ষেত্রেই ভুল বা মন্দ কাজ হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথক-পৃথকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভুল ও মন্দ কাজ করিয়া দেশের মেজরিটি ভুল করিয়া থাকেন। এমনটা ঘটিয়া থাকে দেশবাসী যখন বহু দলে বিভক্ত থাকে। দেশবাসীদের শত দলে বিভক্ত করিতে পারে দেশের শিক্ষিত সমাজ। শিক্ষিত সমাজ বলিতে আমাদের দেশে ছাত্র সমাজ। এঁরাই জনমত সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

নির্বাচনের সময় ছাত্ররা যে দলকে যত বেশি সমর্থন করেন সেই দলের জয়ের সম্ভাবনা তত বেশি। ছাত্ররা ছাড়া আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজ মানে চাকুরিয়া ও শিক্ষক সম্প্রদায়। ছাত্রদের মতো এঁরা প্রকাশ্যে রাজনীতি করিতে পারেন না বলিয়া বিভিন্ন দল গঠনে এঁদের ভূমিকা খুব কম। কিন্তু নির্বাচনে এঁদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। চাকুরিয়া বলিতে আমাদের দেশে প্রধানতঃ সরকারী চাকুরিয়ারা। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সরকারই সবচেয়ে বড় চাকুরিদাতা। পক্ষান্তরে, শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেসারকারী চাকুরিয়াই বেশি। এঁদের মধ্যে সুগঠিত শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সরকারী চাকুরিয়াদের মধ্যে সকল শ্রেণীর তেমন কোনও সুগঠিত সংগঠন না থাকিলেও এঁরা প্রকারান্তরে সংঘবদ্ধ। প্রকাশ্যভাবে সভা-সমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নির্বাচনে দলবিশেষকে সমর্থন না দিলেও এঁরা কার্যতঃ দলবদ্ধভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন। কাজেই নির্বাচনের ফলাফলের উপর সরকারী কর্মচারীদের প্রভাব যে অত্যন্ত বেশি এটা স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব, যে দল নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক ও সরকারী চাকুরিয়াদের অধিকাংশের সমর্থন পাইবেন, তাঁদের জয় একরূপ সুনিশ্চিত। আমাদের দেশের বিগত কালের সবগুলি নির্বাচনই এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টি, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ও সর্বশেষ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ সবের মূলে ছিল ছাত্র-শিক্ষক-সরকারী চাকুরিয়ার সমবেত সমর্থন। অন্যান্য দেশের নির্বাচনেও এই তিন শ্রেণীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় সত্য, কিন্তু সেখানে এঁদের প্রভাব একক নয়। কারণ, ঐ সব দেশে শিক্ষিতের হার অনেক বেশি। শিক্ষিত লোকেরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মত অনুসারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন। সেজন্য গণতন্ত্রের সফলতা সেই সব দেশেই নিশ্চিত যে সব দেশের জনসাধারণ সবাই শিক্ষিত। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার নিতান্ত কম বলিয়া আমাদের জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া থাকে।

এই তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া আমাদের মতো অনুন্নত দেশে যে দল নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিতে পারেন তাঁরা ক্ষমতাসীন দল। সরকারী দল নানা উপায়ে নির্বাচনের ফলাফলকে নিজেদের অনুকূলে আনিতে পারেন। ভাল ভাল কাজ করিয়া জনগণকে নিজেদের পক্ষে আনার এবং সেই কারণে নির্বাচনে জয়ী হইবার সুবিধা সব ক্ষমতাসীন দলেরই রহিয়াছে। কিন্তু জনপ্রিয় না হইয়াও এবং মেজরিটি ভোটার

ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী হইলেও তাঁরা নানা কৌশলে নির্বাচনে জয়ী হইতে পারেন। এসব পন্থাকে 'ইলেকশন রিগ্ করা' বলা হয়। রিগ করা মানে তঞ্চকতা করা। 'রিগ্ড্-ইলেকশন' মানে তঞ্চকী নির্বাচন। জনমত যাই হউক, তঞ্চকী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল সকল অবস্থায় জয়ী হইতে পারেন। অনুন্নত দেশসমূহেই নির্বাচন রিগ্ড্ হইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উন্নত দেশসমূহে এটা ঘটিতে পারে না। কারণ, সেসব দেশে ভোটার ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষ সবাই সচেতন। রিগ্ড ইলেকশন গণতন্ত্র বিকাশের বড় শত্রু। এতে ভোটাররা নির্বাচনের প্রতি, তার মানে গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, শুধু সংবিধান ত্রুটিহীন হইলেই গণতন্ত্র নিশ্চিত ও নিরাপদ হয় না। দেশের সংবিধান হাজার ভাল হইলেও যদি সংবিধানমত নির্বাচন না হয়, আর হইলেও সে নির্বাচন যদি তঞ্চকী নির্বাচন হয়, তবে সে দেশে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পাকিস্তানের কথাটাই বিচার করা যাউক। ১৯৫৬ সালের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান উভয় অঞ্চলের পাকিস্তানীরা মোটামুটি মানিয়া লইয়াছিল। তবু সে সংবিধান কোনও কাজে লাগিল না। পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিকাশের কাজে সে সংবিধান ব্যবহার করাই গেল না। কেন গেল না? তঞ্চকী ইলেকশন করার প্রশ্নই উঠিল না। 'ফ্রি এণ্ড ফেয়ার' ইলেকশন ত দূরের কথা। কারণ, তার আগেই দেশের প্রধান সেনাপতির রাষ্ট্রনায়ক বনিবার সখ হইল। তিনি মিলিটারী 'ক্যু' করিয়া বসিলেন। এই ঘটনায় এটা প্রমাণিত হইল যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দ্বারা নির্বাচন রিগ্ করা ছাড়াও গণতন্ত্রের দুশমনির আরও পথ খোলা আছে। সেটা সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহে এ ধরনের নাটকীয় ঘটনা প্রায়শঃ ঘটিতেছে। এই ধরনের গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপে শুধু গণতন্ত্র বিকাশই ব্যাহত হয় না, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাও বিপন্ন হয় এবং রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়াও যায়। পাকিস্তান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে আমাদের বাংলাদেশে সেদিক হইতে গণতন্ত্রের উপর হামলা হইবার আপাততঃ কোন আশংকা নাই।

আমাদের দেশে গণতন্ত্রের বিপদ আসিতে পারে অন্য দিক হইতে। সে পথও একাধিক। আমাদের দেশ নয়া রাষ্ট্র বলিয়া সেসব পথও নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়। কাজেই যাঁরা মনে করেন সংবিধান রচিত হইয়া যাইবার সংগে সংগেই আমাদের সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তাঁরা ভুল করিতেছেন। বরঞ্চ বলা চলে, সংবিধান রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর আমাদের দায়িত্ব আরো ভারি ও কর্তব্য আরও কঠিন হইয়াছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধটার স্ফুরণ সরকারী দলের জন্য যেমন আবশ্যক, অপজিশন দলসমূহের জন্যও সমভাবে আবশ্যক।

সংক্ষেপে এই উভয় দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় আগামী নির্বাচনটা 'ফ্রি এণ্ড ফেয়ার' হইতে হইবে। অনেক অসাবধান লোকের ধারণা নির্বাচনকে 'ফ্রি এণ্ড ফেয়ার' করিবার দায়িত্বটা সরকারের একার। এ বিষয়ে সরকারী দায়িত্বই সর্বপ্রধান তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অপজিশন দলসমূহ ও ভোটার সাধারণেরও দায়িত্ব এ বিষয়ে মোটেই কম নয়।

আওয়ামী লীগ সরকার নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন দিবেন, এটা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিপদ দেখা দিতে পারে এরপর হইতে। সে বিপদ অনেক প্রকারের হইতে পারে। তার মধ্যে এই কয়টি প্রধান: এক. নির্বাচনী প্রচারণায় বিঘ্ন; দুই. নির্বাচনে বাধা; তিন. নির্বাচনে তঞ্চকতা। এই তিনটি বিপদের আশংকার কোনটাই কম সাংঘাতিক নয়। প্রথমে নির্বাচনে প্রচারণায় বিঘ্নের কথাটাই বলা যাউক। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হইতে হইলে নির্বাচনী প্রচারণায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা থাকা দরকার। প্রচার মাধ্যমেও সকল দলের সমান অধিকার থাকা আবশ্যক। সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে সকল দলের নির্বাচনী ইশতেহার, নেতাদের বক্তৃতা ও সভা সমিতির পক্ষপাতহীন সংবাদ প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। ক্ষমতাসীন দলসহ সব দলের নেতাদের রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা সরকারকেই করিতে হইবে। কারণ, রেডিও টেলিভিশন সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া সভাসমিতি করিবার পূর্ণ ও নিরাপদ ব্যবস্থা, প্রচার-পত্র ছাপিবার কাগজ প্রয়োজন ও চাহিদা-মতো সকল দলকে সরবরাহ করিবার বিধি-ব্যবস্থাও সরকারকেই করিতে হইবে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ সরকার অপজিশন দলসমূহের প্রচার কাজে কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করিবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু সরকার সমর্থক এমন কিছু অতি উৎসাহী লোকও আছেন, সরকারকে খুশী করিয়া মতলব হাসিলই যাঁদের উদ্দেশ্য; গণতন্ত্রের সুতরাং রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের কি হইবে, তা নিয়া এঁদের মাথা ব্যথা নাই। এই ধরনের লোকেরা অপজিশন দলসমূহের নির্বাচনী প্রচারণায় যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন, সেদিকে সরকারের এবং আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তা না করিলে দ্বিতীয় বিপদের রাস্তা পরিষ্কার হইবে। এই দ্বিতীয় বিপদটা আসিবে নির্বাচন-বিরোধী, তার মানে গণতন্ত্র-বিরোধী, অতি বিপ্লবীদের তরফ হইতে। এঁরা বড় বড় বিপ্লবী কথা বলিয়া নির্বাচন ভণ্ডুল করিবার চেষ্টা করিবেন। নির্বাচন বয়কটের ডাক দিবার সুযোগ খুঁজিবেন; সরকারী দলের পক্ষ হইতে অবাধ প্রচারণায় বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হইলেই এই

অতি-বিপ্লবীদের কাজের সহায়তা করা হইবে। এ বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তৃতীয় বিপদের আশংকা নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। জনগণের চরম অর্থ সংকট ও দুরবস্থার ফলে ভোটারদের অসন্তোষ মাথায় লইয়াও যে আওয়ামী নেতৃত্ব সাধারণ নির্বাচন দিয়াছেন, এটা তাদের গণতন্ত্রী মনোভাব ও জনগণের প্রতি পূর্ণ আস্থারই সূচনা করে। চরম অসন্তোষের মধ্যেও জনগণের ও ভোটারদের মোকাবিলা করিবার সাহস ও ঐতিহ্য আওয়ামী লীগের আছে। কাজেই আওয়ামী লীগ সরকারের তরফ হইতে নির্বাচন রিগ করিবার কোনও আশংকা নাই। কিন্তু এখানেও আওয়ামী নেতৃত্বের অজ্ঞাতে বাড়াবাড়ি করিয়া কোন কোন অতি-উৎসাহী লোক সরকারের বদনাম অর্জন করিতে পারেন। এদের সম্বন্ধেও সরকারকে এবং আওয়ামী নেতৃত্বকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

অতএব, দেখা গেল, সংবিধান রচনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় নাই; বরঞ্চ আমাদের কর্তব্য শুরু হইয়াছে মাত্র। গণতন্ত্রের পথেই আমাদের দেশে গণতন্ত্রের সাফল্য অর্জন করিতে হইবে।

১লা সেপ্টেম্বর,'৭২

বাংলাদেশ সরকার কি বিপ্লবী সরকার, না নির্বাচিত সরকার?

প্রশ্নটা নিতান্তই একাডেমিক। এই হিসাবে এটা কোনও সমস্যাই নয়। কিন্তু প্রাকটিসের দিক হইতে এটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াইয়াছে। সরকারী দল নিজেরা যেসব সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন, এটা তার মধ্যে অন্যতম। তাই প্রশ্নটার আলোচনা ও মীমাংসা হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যেই আজকার আলোচনার অবতারণা।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বর্তমান সরকার বিপ্লবী সরকার নন। বরঞ্চ তারা দস্তুর মত বৈধ নির্বাচিত নিয়মতান্ত্রিক সরকার। দেশের প্রচলিত সংবিধান ও আইন-কানুনের খেলাফে যবরদস্তিমূলে শাসক বদল হইলে তাকেই বলা হয় রাষ্ট্রবিপ্লব। এই বিপ্লব চলাকালে বা বিপ্লবের শেষে বিপ্লবের নেতারা যে সরকার গঠন করেন, তাকেই বলা হয় বিপ্লবী সরকার। বিপ্লবের আগে, দেশের প্রচলিত কোনও আইনের বলে দেশ শাসনের কোনও অধিকার তাদের থাকে না বলিয়াই এদের বিপ্লবী সরকার বলা হয়। আমাদের বর্তমান সরকারকে এই ধরনের সরকার বলা যায় না। দেশের তৎকালীন আইন অনুসারেই তারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সে নির্বাচনে তারা নিরংকুশ মেজরিটি হইয়াছিলেন। এ সবই ঘটিয়াছিল মুক্তিযুদ্ধের আগে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধটাকে যদি বিপ্লব বলিয়া ধরা হয়, তবু এ সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলা যায় না। কারণ এই সরকারকে বিপ্লবের সৃষ্টি বলা চলে না। বরঞ্চ বলা চলে বিপ্লবটাই সরকারের সৃষ্টি। এইখানে মুক্তিযুদ্ধরূপী বিপ্লবের আগের ঘটনা-পরম্পরার একটু পর্যালোচনা করা যাক।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তৎকালীন সরকার প্রণীত আইন অনুসারে। তাদেরই তত্ত্বাবধানে। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ মেজরিটি লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক সংবিধান ছিল না। সে সরকারও কোন নিয়মতান্ত্রিক বৈধ সরকার ছিলেন না। তারা ছিলেন অস্থায়ী সামরিক সরকার। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা আইনতঃ অটম্যাটিক্যালি আসিয়া পড়িয়াছিল। যা বাকি ছিল তা ছিল ফরম্যাল হস্তান্তর মাত্র। শুধু চার্জ মেকওভার করাটা। এটাই ঘটিত '৭১ সালের ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য পরিষদের বৈঠকে। সামরিক শাসনকর্তা ১লা মার্চ বিনা কারণে এই বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করিয়া দিলেন। দেশের আসন্ন সরকার আওয়ামী নেতৃত্ব এই বেআইনী স্থগিতের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা

করিলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রের বৃহত্তর অংশ মেজরিটির দেশ এই বাংলাদেশে হাইকোর্ট জজকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েট হইতে শুরু করিয়া ভার্সিটি-স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, হাট-বাজার পর্যন্ত সর্বত্র অভূতপূর্ব ঐক্যের সাথে সে হরতাল প্রতিপালিত হইল। সামরিক শাসন কর্তৃত্বের শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ অচল হইল। তাদের উপর আওয়ামী লীগ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হইল। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সে যন্ত্র আর চালু হইল না। ইতিমধ্যে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুবিধার খাতিরে আওয়ামী লীগ দফতর হইতে দিনের পর দিন যে যে নির্দেশ জারি করিতে লাগিলেন, তদনুসারে হাট-বাজার, দোকান-পাট, রেল, স্টিমার ও বিমান চলিতে লাগিল। পুলিশ বাহিনীও তাঁদের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ডিউটিতে অবতীর্ণ হইলেন। রেডিও-টেলিভিশনও আওয়ামী লীগের নির্দেশমত তাদের কর্তব্যে নিয়োজিত হইল। এইভাবে ক্ষমতাসীন জংগী সরকারের চোখের সামনে দেশের দেওয়ানী শাসনযন্ত্রে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। এমনকি সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই মুদ্দতে যে ঢাকা আসিয়াছিলেন, তাও করিয়াছিলেন আওয়ামী লীগের আগাম সম্মতি লইয়া। এইভাবে আওয়ামী লীগই ছিল এই মুদ্দতে বাংলাদেশের ডিফ্যাকটো সরকার। তাছাড়া তৎকালীন প্রচলিত আইন অনুসারেই তাঁরা ক্ষমতার আসনের অধিকারী ছিলেন। পক্ষান্তরে, যাঁরা আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় বসাটা ঠেকাইয়া রাখিতেছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিছক সামরিক শক্তি। দেশের কোনও আইন তাঁদের পক্ষে ছিল না। ফলে ২রা মার্চ হইতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এই মুদ্দতটায় সামরিক সরকার আওয়ামী লীগের পক্ষে এ্যাবডিকেট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তারপর ২৫শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বরের ঘটনাবলীর তাৎপর্য কি? ২৫শে মার্চ পাক-বাহিনী অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের নেতাকে কিডন্যাপ করিয়া তাদের দেশে লইয়া যায়। কিন্তু তার আগেই আমাদের নেতা ফরম্যালি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সহকর্মীদের মুজিবনগরে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দেন। নেতার অবর্তমানে সহকারী সভাপতিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়া 'বাংলাদেশ সরকার-ইন-একযাইল' মুক্তিযুদ্ধ চালাইতে থাকেন। যদিও বাংলাদেশের কতকাংশ বরাবরই বাংলাদেশ সরকারের দখলে ছিল, তথাপি সমস্ত বিতর্ক এড়াইবার জন্য এই সরকারকে 'গভর্নমেন্ট-ইন-একযাইল' বলিলাম। এই প্রবাসী সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার মাধ্যমে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়া যাইতে লাগিলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর, পুলিশ বাহিনী, জেলা ও মহকুমা প্রশাসকগণ, ভার্সিটি-কলেজ-স্কুলের অধ্যাপক ছাত্রগণ সকলে প্রবাসী সরকারের নির্দেশে কোথাও সম্মুখযুদ্ধ, কোথাও গ্যারিলা যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। প্রবাসী সরকার প্রতিবেশী

বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। সারা বাংলাদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। কৃষকেরা তাদের লুংগি-লাংগলে, শ্রমিকরা তাদের টুল ব্যাগে, ফেরিওয়ালারা তাদের ঝাঁকায়, ভিক্ষুক-ফকিররা তাদের ঝোল্নায় বন্দুক, গ্রেনেড, বোমা লইয়া শত্রু সৈন্য নিধনে নিয়োজিত হইল। এইরূপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হইয়া উঠিল একটি জনযুদ্ধ। এইভাবে আটমাস চলার পর পাক-বাহিনী পশ্চিম সীমান্তে ভারত আক্রমণ করিল। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন দিল। পাক-বাহিনী বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ করিল। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ঢাকায় আসিয়া দেশ শাসন শুরু করিলেন।

এই বিবরণী হইতে বোঝা গেল যে, বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব ডিফ্যাকটো সরকাররূপে '৭১ সালের ২রা মার্চ হইতেই ছিল। তারপর ২৬শে মার্চ হইতে ডিজুরী প্রবাসী সরকাররূপে বিদ্যমান ছিলেন। এই সরকারের নির্দেশ ও পরিচালনায় গোটা দেশবাসী দখলদার পাক-বাহিনীর হাত হইতে দেশ উদ্ধারের জন্য লড়াই করিয়াছে। এই সরকারের অনুরোধেই প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করিয়াছে। এতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নির্বাচিত বৈধ নিয়মতান্ত্রিক সরকার। বিপ্লবের সৃষ্ট বিপ্লবী সরকার নন।

তথাপি দুইটি কারণে বর্তমান সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলিয়া ভুল করা হইতেছে। তার প্রথম কারণ এই যে, যুদ্ধ করিয়া দেশ স্বাধীন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মেজরিটি হইয়াছিল, সেটা স্বাধীন বাংলাদেশের নির্বাচন ছিল না। দুইটা যুক্তিই অমূলক। প্রথম যুক্তির জবাবে বলা যায়, এ যুদ্ধে আমাদের সরকার আক্রমণকারী নন। আক্রান্ত হইবার পর শুধু আত্মরক্ষার জন্যই তাঁরা অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। অতএব, এ সরকারের জন্ম নিয়মতন্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লবে নয়।

সশস্ত্র সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিলেই দেশের সরকার বিপ্লবী সরকার হইয়া যায় না। দুনিয়ায় এমন নজির অনেক আছে যেখানে বিদেশী আক্রমণে দেশের নির্বাচিত সরকার পালাইয়া বন্ধুরাষ্ট্রে আশ্রয় লইয়াছেন। বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় বিদেশ হইতে যুদ্ধ চালাইয়াছেন। যুদ্ধে জিতিয়া দেশ মুক্ত করিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। হিটলারের আমলে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই এমনটা ঘটিয়াছিল। ঐ কারণে ঐ সব দেশের সরকার বিপ্লবী সরকার হইয়া যান নাই। এই ঘটনায় এটাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের মর্যাদা অস্ত্রবলে রক্ষা করিতে রাজি; কিন্তু অস্ত্রের মর্যাদা গণতন্ত্রবলে রক্ষা করিতে রাজি নয়। এটাও গণতন্ত্রী সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচনের কথাটা? আওয়ামী লীগ ছয়দফা দাবিতেই নির্বাচনে লড়িয়াছিল, এটা ঠিক। কিন্তু এটাকে রেফারেণ্ডামও বলিয়াছিল। আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা ভোটারদের বলিয়াছিলেন : 'ছয়দফা মানেই পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা। অতএব ছয়দফা সরকার বা পশ্চিমা নেতারা মানিবেন না।' তার উত্তরে আওয়ামী নেতারা বলিয়াছিলেন; 'ছয়দফা যদি না মানে তবে এক দফা মানিতে হইবে।' তার মানে পশ্চিমারা যদি এক দফা না মানে তবে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে, ভোটাররা তা আগেই জানিতেন। এটা জানিয়াও দেশের শতকরা আশিটা ভোট ও শতকরা নিরানব্বইটা আসন আওয়ামী লীগকে দিয়াছেন। তার মানে এই যে, ছয়দফা অগ্রাহ্য হইলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অনুমতি ভোটাররা আওয়ামী লীগকে আগেই দিয়া রাখিয়াছিলেন। আওয়ামী লীগ ঠিক নির্বাচনী ওয়াদামতই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। এতেও প্রমাণিত হইল যে, বর্তমান সরকার নির্বাচিত নিয়মতান্ত্রিক সরকার। নির্বাচনী ওয়াদামতই তাঁরা সরকার গঠন করিয়াছেন বলিয়া অনির্বাচিত কোনও লোককে তাঁরা মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন নাই। বিপ্লবী সরকার হইলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের প্রতিনিধি লইয়াই মন্ত্রিসভা গঠিত হইত।

বর্তমান সরকারের নিয়মতান্ত্রিক চরিত্র ও সত্তা এমন সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা এই সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলিতেছেন, তাঁরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এই সরকারকে এমনকি গোটা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী করিতেছেন। এ কাজে তাঁরা অনেকটা সফলও হইয়াছেন। একদিকে ছাত্র তরুণরা এই সরকারকে বিপ্লবী সরকার মনে করিয়া অতি উৎসাহে যা-তা দাবী করিতেছেন। অপর দিকে মন্ত্রী-সচিবরা নিজেদের বিপ্লবী সরকার মনে করিয়া যা-তা কাজ করিয়া যাইতেছেন। ভুলের পর ভুল করিতেছেন। এক ভুল ঠেকাইতে গিয়া দশটা ভুল করিতেছেন। যা করিতেছেন, তার প্রায় সবগুলিই অগণতান্ত্রিক। এসব কাজ করিয়া তাঁরা আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতি ও বিশ-বছরের ঐতিহ্য নষ্ট ও ইমেজ ধ্বংস করিতেছেন। আওয়ামী লীগের যেসব নীতির জন্য দেশবাসী তাকে ভালবাসিয়া আসিয়াছে, সকল প্রতিকূলতার ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করিয়া আসিতেছে, মাত্র নয় মাসের ক্ষমতার আসনে থাকিয়া একে একে তার সব নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগের আদর্শে, কর্মসূচীতে ও নেতৃত্বে যে লক্ষ-লক্ষ আওয়ামী-কর্মী গৌরব বোধ করিয়া আসিতেছেন, তাঁরাই আজ আওয়ামী নেতৃত্বের ব্যর্থতায় নৈরাশ্য ও লজ্জায় মাথা হেট করিতেছেন। দেশের যে জনগণ নিজেদের মুক্তি ও প্রগতির প্রতিকাররূপে আওয়ামী লীগের দিকেই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিল, তারাই আজ আওয়ামী লীগ হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতেছে। আওয়ামী লীগের শ্রমিক শাখা জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রকাশ্য সভায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

দাবী করিতেছে। এটাকে দালালদের কাজ বা গণদুশমনদের 'ষড়যন্ত্র' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 'উৎসাহী সমর্থকরা এত অল্পদিনে প্রতিবাদ-মুখর সরকার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন কেন, সময় থাকিতে তার কারণ অনুসন্ধান করা ও তার প্রতিকার করা কি সরকারের আশু কর্তব্য নয়?'

কিন্তু সে কর্তব্য সম্বন্ধে মন্ত্রীরা ও তাঁদের সমর্থক ছাত্র-তরুণরা একমত নন। একদিকে মন্ত্রীরা সাবেক মন্ত্রীদের মতই মন্ত্রিত্ব করিয়া চলিয়াছেন। আর তাঁদের অনুসারী ছাত্র-তরুণরাও, সাবেক অপজিশনের মতই পল্টন করিয়া চলিয়াছেন। মন্ত্রীরাও মনে করিতেছেন না তাঁরা আওয়ামী মন্ত্রী। তাঁদের অনুসারী ছাত্র-তরুণরাও ভাবিতেছেন না তাঁরা আওয়ামী কর্মী। মন্ত্রীরা যেমন ভাবিতেছেন, আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁদের কোনও দায়িত্ব নাই, কর্মীরাও তেমনি ভাবিতেছেন আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁদেরও কোন কর্তব্য নাই। গত নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগ জিতিয়াছে, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জিতেন নাই, এ কথা উভয়পক্ষই ভুলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সরকার যে একটা পার্টি সরকার, এ কথা কারও মনে নাই। কারণ, সরকার নিজেই মনে করেন, তাঁরা বিপ্লবী সরকার। শুধু মনে করেন না, কাজও করিতেছেন বিপ্লবী সরকারের মতই। ভাল কাজও যে তাঁরা করেন নাই, তা নয়। ভাল মানুষ কাজ করিলে প্রশংসা পান না। কারণ, ওটা ত সবাই তাঁর কাছে আশা করে। তিনি খারাপ কাজ করিলেই নিন্দার পাত্র হন। কারণ, এটা কেউ তাঁর কাছে আশা করে না। বর্তমান সরকার যে সব খারাপ কাজ করিয়াছেন, তাঁদের কাছে কেউ এসব আশা করে না। কারণ, এসবই আওয়ামী লীগের বিশ বছরের ঐতিহ্য ও বিঘোষিত নীতিবিরোধী। বিনা-বিচারে বন্দী করা, হাইকোর্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুন হাইকোর্ট বসানো, হাইকোর্ট সহ সব আদালতের ক্ষমতা হরণ করা, রাজনৈতিক বিরোধী দলসমূহ বেআইনী ঘোষণা করা, রাজনৈতিক অপরাধ সৃষ্টি করিয়া তাকে রিট্রসপেকটিভ প্রয়োগ দেওয়া, রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির ভোটদানের প্রাইমারী অধিকার হরণ করা, গেরেপ্তারী ব্যক্তিকে দণ্ড দিবার কাজে প্রচলিত দণ্ডবিধি ও সাক্ষ্য আইন যথেষ্ট না হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কয়েদ রাখিয়াই ঐ সব আইনের পছন্দমত সংশোধন করা, সর্বনিম্ন দণ্ডের বিধান করা এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইট স্ট্রাইক করার অধিকার বাতিল করা ইত্যাদি এমন সব কাজ তাঁরা করিয়াছেন যার নজির সভ্যজগতের কোথাও নাই, ডিক্টেটররাও যা করেন নাই।

এতসব করিতে পারিয়াছেন সরকার নিজেকে বিপ্লবী সরকার মনে করেন বলিয়া। সরকারকে বিপ্লবী মনে করিয়াই ছাত্র-তরুণরা এসব কাজকে যথেষ্ট বিপ্লবী মনে করিতেছেন না। তাঁরা আরও মারাত্মক মারাত্মক 'বিপ্লবী' কাজ দাবি করিতেছেন। মন্ত্রীরা 'বিপ্লবী' কাজ করার সুবিধার জন্য আইন-পরিষদকে গণ-পরিষদ আখ্যা দিয়া 'ঠুটো জগন্নাথ' করিয়া রাখিয়াছেন। ছাত্র-তরুণরা এটাকে যথেষ্ট 'বিপ্লবী' না মানিয়া আইন-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐ আপদটা একেবারে চুকাইয়া ফেলিবার দাবি করিতেছেন। মন্ত্রীরা

প্রচলিত আইনে 'দালালদের' শাস্তি দিতে না পারিয়া নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করিতেছেন। ছাত্র-তরুণরা এটাকে যথেষ্ট বিপ্লবী মনে না করিয়া দাবী করিতেছে: 'আদালত-টাদালত আবার কি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে ধরা না-ধরা সব দালালকে কাতারবন্দি করিয়া নিপাত কর।'

মন্ত্রীরা এবং তাদের সমর্থক ছাত্র-তরুণরা এতসব করিতেছেন শুধু 'দালাল' ধরিবার জন্য। পাকিস্তানের শাসকরা প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত শুধু 'ষড়যন্ত্র' ও 'ভারতের দালাল' খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছিলেন। দেশ গড়িবার দিকে মনোযোগ দিবার ফুরসত তারা পান নাই, আমাদের সরকারও সেই কাজেই সময় অতিবাহিত করিতেছেন। সেদিন জনৈক আওয়ামী এম, সি, এ-র একটি লেখা পড়িলাম। তিনি আফসোস করিয়া বলিয়াছেন, 'সরকার যেভাবে দালালদের খোঁজ করিতেছেন তাতে কেয়ামত পর্যন্ত এ কাজ শেষ হবে না'। কথাটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। বস্তুতঃ দালালের খোঁজে সরকার ও ছাত্র-তরুণ যে সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিতেছেন, খাদ্য-দ্রব্য-মূল্য শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ঐ পরিমাণ সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিলে ঐ সব সমস্যার কিনারা করা যাইত।

'বিপ্লবী সরকার' হওয়ার দরুন কয়েকটি পার্টির নেতারা সর্বদলীয় অথবা 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবী করিতেছেন। 'বিপ্লবী সরকার' হইতে হইলে এ দাবি ন্যায়সঙ্গত। মুক্তিযুদ্ধে যেসব পার্টি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁদের সবাইকে শামিল করিয়াই 'বিপ্লবী সরকার' হইতে পারে। আর 'জাতীয়' বা 'সর্বদলীয়' সরকার করিতে হইলে যাঁরা স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, তাঁদেরও নিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত স্বাধীনতার বিরোধিতা দেশদ্রোহিতা নয়, রাজনৈতিক মত-বিভিন্নতা মাত্র। ভারত স্বাধীন হইবার আগে পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও পার্টি স্বাধীনতার বিরোধিতা ও ইংরাজ সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগের দিন পর্যন্ত অনেক হিন্দু-মুসলিম ব্যক্তি ও পার্টি পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন ও পাকিস্তান হাসিল হইবার পর ঐ কারণে কেউ দণ্ডিত হন নাই। বাংলাদেশের অখণ্ডতা ছিল রাজনৈতিক মতপার্থক্যের প্রশ্ন। এখন সেটা হইয়াছে আনুগত্যের প্রশ্ন। মতবিভিন্নতা দণ্ডনীয় নয়, আনুগত্যের অভাবই দণ্ডনীয়।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় 'সর্বদলীয়' বা 'জাতীয় সরকার' কোনটারই দরকার নাই। দরকার শুধু নিজেকে বিপ্লবী না বলিয়া আওয়ামী সরকার স্বীকার করা। তার অর্থ, অর্ডিন্যান্সে 'বিপ্লবী' আইন পাস না করিয়া আওয়ামী লীগের বহুবিঘোষিত নীতি অনুসারে পার্লামেন্টারী পার্টি ও আইন পরিষদের অনুমোদনক্রমে দেশ শাসন করা; যথাসম্ভব শীঘ্র একটি নিরংকুশ গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিয়া তারই বুনিয়াদে সাধারণ নির্বাচন দেওয়া।

৮ই সেপ্টেম্বর, '৭২

নির্বাচন যেমন ভোটারদের ট্রেনিং স্কুল
পরিষদের সেশন তেমনি মেম্বরদের ট্রেনিং স্কুল

আগের প্রবন্ধে আমি বর্তমান সরকারকে আওয়ামী লীগ পার্টি গবর্ণমেন্ট বলিয়াছি। বিপ্লবী সরকার বলিতে আপত্তি করিয়াছি। কারণ সুস্পষ্ট। মন্ত্রী-মেম্বররা সবাই আওয়ামী লীগার। সবাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত।

পার্টি হিসাবে আমি আওয়ামী লীগের এবং সরকার গঠনের পন্থা হিসাবে আমি নির্বাচনে পক্ষপাতী। বিপ্লবকে সরকার গঠনের পন্থা হিসাবে আমি সমর্থন করি না। বিপ্লবে সরকার গঠিত হইলে তা বদলাইতে আরেকটা বিপ্লব লাগে। অথচ নির্বাচিত সরকার বদলাইতে আরেকটা নির্বাচনই যথেষ্ট। বিপ্লব সাধারণত সশস্ত্র আর নির্বাচন সব সময়ে শান্তিপূর্ণ। বিপ্লবে সরকার বদলটা হয় কতিপয়ের ইচ্ছায়। নির্বাচনে সরকার বদল হয় দেশের অধিকাংশের ইচ্ছায়।

যে কারণে আমি যুদ্ধ-বিরোধী, ঠিক সেই কারণেই আমি সশস্ত্র বিপ্লব-বিরোধী। দুনিয়ার বড় বড় মনীষী যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালাইতেছেন। কিন্তু যুদ্ধ এড়ান যায় নাই। আন্তর্জাতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যুদ্ধকে যতটা সমর্থন করা যায়, অভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটাইবার পন্থা হিসাবে বিপ্লবকে ততটা সমর্থনও করা যায় না। আন্তর্জাতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির অলটারনেটিভরূপে লীগ অব নেশনস, ইউনাইটেড নেশনস, হেগ কোর্ট সম্পূর্ণ সফল প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির অলটারনেটিভরূপে নির্বাচনী গণতন্ত্র সফল প্রমাণিত হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিপ্লব মানে আমূল পরিবর্তন। আমূল পরিবর্তন মানে সামগ্রিক সংস্কার। সামগ্রিক সংস্কারের উদ্দেশ্য সকলের কল্যাণ। সকলের কল্যাণের প্রথম পদক্ষেপ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। তার অর্থ পুঁজিবাদী শোষণ ও বে-ইনসাফির অবসান। দৃশ্যতঃ পুঁজিবাদের অবসানে পুঁজিবাদীদের লোকসান। তাই স্থূল দৃষ্টির লোকেরা এটাকে শ্রেণীসংগ্রাম বলেন। শোষক শ্রেণীর ধ্বংস ও শোষিত শ্রেণীর জাগরণও কল্যাণ। কিন্তু আসল সত্য এই, পুঁজিবাদের শোষণের অবসানে শুধু শোষিতের মুক্তি ও কল্যাণ হয় না। খোদ শোষকেরও মুক্তি ও কল্যাণ হয়। তাই পুঁজিবাদের অবসানকে আমি শুধু শোষিতের কল্যাণ না বলিয়া সমাজের সকলের কল্যাণ বলিলাম। কিন্তু শোষকরা নিজেদের স্বার্থের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করেন বলিয়া গোড়ার দিকে এটাকে শত্রুতা মনে করেন। অবিভক্ত বাংলায় আমরা যখন

জমিদারি উচ্ছেদের আন্দোলন করিতাম, তখন জমিদাররা এই আন্দোলনকে তাঁদের দুশমনি মনে করিতেন। সমাজ ত বড় কথা। পরিবারের সংকীর্ণ এলাকাতেও পুরুষরা গোটা নারী জাতিকে, তার মানে নিজেদের মা-বোন স্ত্রীকে আর্থিক দাসত্বের শিকলে বাঁধিয়া রাখার বে-ইনসাফটা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই নারী জাতির মুক্তি আন্দোলনকে অধিকাংশ পুরুষ কুনজরে দেখিত। নারীর মুক্তি আন্দোলন যে পুরুষ সহ সমাজের সকলের সামগ্রিক মুক্তির আন্দোলন, এটা বুঝিতে পুরুষদের অনেক দিন লাগিয়াছে।

স্বার্থপর কায়েমীস্বার্থীদের বিচারে এইসব আমূল পরিবর্তনের নামই বিপ্লব। গোটা উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর মানব কল্যাণকামীরা পুঁজিবাদ উচ্ছেদের যে সব চেষ্টা করিয়াছেন, তাতে সে বিপ্লবগুলি স্বতঃই হইয়া উঠিয়াছে সশস্ত্র। কারণ সেসব সংঘর্ষে পুঁজিবাদীদের এ্যাটিচুড ছিল : 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'। গণতন্ত্র তখনও শক্তিশালী হয় নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিয়াছে। আজ গণতন্ত্র শক্তিশালী। সামন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদও আগের মতো শক্তিশালী নাই। বিপ্লব বা আমূল সংস্কার করিতে হইলে একমাত্র এবং প্রথম পদক্ষেপ রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল। রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের পরে সেই ক্ষমতার জোরে মেহনতী জনতার অনুকূলে আর্থিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করিতে হয়।

এই রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলটা দুইভাবে করা সম্ভব: এক. সশস্ত্র বিপ্লবের খুনাখুনিতে, দুই. নিরস্ত্র নির্বাচনের ভোটাভুটিতে। যাঁরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রবর্তনের বিশ্বাস করেন, তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবটা এড়াইবার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, সশস্ত্র বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিলে ওটা রক্ষাও করিতে হয় অস্ত্রের জোরে। সকলেই জানেন, বিপ্লবীরা বিপ্লবকে 'মহান বিপ্লব' আখ্যা দিয়া তাকে 'জিন্দাবাদ' দেন। কিন্তু সেটা করেন শুধু নিজেদের 'বিপ্লবকে' তাদের কাজের দোষ ধরিয়া যদি আর কেউ এ 'গণ মুক্তির মহান উদ্দেশ্যে'ই তাদের বিরুদ্ধে আরেকটা বিপ্লব করিতে চান, তবে সেটা কায়েমীস্বার্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল 'প্রতিবিপ্লব' আখ্যা দিয়া তাঁদের নিপাত করিবার চেষ্টা করেন। তাদের দিক হইতে এটা দরকারও। বিপ্লবী সরকারই হউন, আর নির্বাচিত সরকারই হউন তাদের স্থায়িত্ব অত্যাবশ্যক। সরকারের নির্দিষ্ট ও প্রস্তাবিত আমূল সংস্কারগুলি সম্পাদন করিতে হইলে সরকারকে অবশ্যই স্থায়ী হইতে হইবে। ঘন ঘন সরকার বদল হইলে এটা সম্ভব নয়। সরকারের এই স্থায়িত্বটা দুই পন্থায় হাসিল করা যায়। এক. বিরোধীপক্ষকে সবলে ক্ষমতার আসন হইতে দূরে রাখা। দুই. নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারদের আস্থা অর্জন করিয়া গদিতে বহাল থাকা। একদিকে সরকারের স্থায়িত্ব যেমন দরকার, অন্য দিকে জনগণের ইচ্ছানুসারে সরকার বদলও তেমনি

দরকার। এই কাজটিই শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠুভাবে ও জনগণের ইচ্ছায় হইতে পারে শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচন ছাড়া সরকার বদলের যে আরেকটি পন্থা আছে তা রক্তবিপ্লব।

আমার এ সকল কথার একটিমাত্র উদ্দেশ্য। আওয়ামী লীগ সরকার স্থায়ী হউন। সে স্থায়িত্বটা হাসিল হউক জনগণের সম্মতিক্রমে। তার মানে নির্বাচনের মাধ্যমে। কথাটা জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করিবার জন্য আরও সোজা করিয়া বলিতেছি। আওয়ামী লীগ সরকার যথাসম্ভব ভারতে কংগ্রেস পার্টির অনুসরণ করুন। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস পার্টি যেমন পঁচিশ বছর ধরিয়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, আওয়ামী লীগও স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতার আসনে তেমনি অন্ততঃ পঁচিশ বছর বহাল থাকুন। কংগ্রেস পার্টি যে নীতি ও পন্থায় অত বড় সমস্যাসংকুল বহু রঙ্গা, বিশাল দেশে একাদিক্রমে পঁচিশ বছর ধরিয়া ক্ষমতার আসন হইতে ভারতীয় নেশনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছেন, আমার সাধ বাসনা এই যে, আওয়ামী লীগও বাংলাদেশকে এবং তার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে তেমনি পরিচালিত করুন। কংগ্রেসের অবলম্বিত পথ শুধু বাঞ্ছনীয় ও শ্রেষ্ঠ পথ নয়, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় জনগণের সম্মতি লইয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার উহাই একমাত্র পথও। এই কারণেই আমার বিপ্লবী আওয়ামী লীগের বন্ধুরা মানুন, আর না মানুন, আমি বরাবর তাঁদের একটা কথাই বলিতেছি: 'আপনারা যতই বিপ্লবী হউন, মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে বেশি বিপ্লবী হইবার চেষ্টা করিবেন না।' আর সমাজবাদী আওয়ামী বন্ধুদের বলি: 'আপনারা পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর চেয়ে বেশি সমাজবাদী হইবেন না'। ওঁদের চেয়ে বেশি বিপ্লবী ও সমাজবাদী হওয়া দরকার হইবে কি না, তার বিচার করবেন নব-গঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাবিধানের ও অর্থনৈতিক সুস্থতা ও স্বনির্ভরতা আনিবার পরে। তার আগে পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রধান এবং সম্ভবতঃ একমাত্র কাজ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে নির্ভুল ও নিশ্চিত ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র নিরাপদ ও স্থায়ী হইলেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নিরাপদ ও স্থায়ী হইবে। রাষ্ট্রকে নিরাপদ করা যায় গোটা দেশবাসীর মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ব-বোধ সৃষ্টি করিয়া। দেশের সকলে এবং প্রত্যেকে মনে করিবে 'এদেশ আমার'। আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে স্থায়ী ও নিরাপদ করা যাইবে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি লইয়া।

আমি চাই, আওয়ামী লীগ ঐ কাজটিই করুন ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্বের পথে। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃত্বের পথে নয়। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব জোর করিয়া বিপ্লবের পথে গদি বহাল রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। যথাসময়ে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার কাজ সারিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র-ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তর

করিয়াছেন। সংবিধান অনুসারে এবং দরকারমত আরও ঘন ঘন নির্বাচন দিয়া জনগণের অনুমতিক্রমে ক্ষমতার আসনে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সফলও হইয়াছেন। এতে দুইটা কাজ একসঙ্গে হইয়া গিয়াছে: এক. দেশের ও রাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসী অবগত হইয়া গিয়াছে। দুই. সেই সম্যক অবগতির ভিত্তিতেই শাসক দলকে পুনরায় গদিতে বসাইয়াছে। এই দুই পথে রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশ শাসনকার্যের সাথে জনগণের অবিরাম অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র, মাস্ পার্টিসিপেশন স্থাপিত হইয়াছে। বহু ভুলভ্রান্তি ও ব্যর্থতা-অসাফল্য সত্ত্বেও যে একটা নির্বাচিত সরকার নির্বাচনের মাধ্যমেই এতদিন পঞ্চান্ন কোটি লোকের বিপুল মেজরিটির আস্থাভাজন থাকিতে পারিয়াছেন, তা শুধু এই কারণে। রাজনৈতিক নেতারা মানুষ। তাঁরা ফেরেশতা নন। ভুলভ্রান্তি তাঁদের হইবেই। দেশবাসী সেটা বুঝে। আসমান হইতে ফেরেশতা আসিয়া তাঁদের দেশের সরকার চালাইয়া যাইবেন না। তাই দেশবাসীও দোষে-গুণে মোটামুটি ভাল সরকারকেই সমর্থন করিয়া থাকে। কংগ্রেস সম্পর্কে ভারতবাসীও এই এ্যাটিচুডই অবলম্বন করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জনগণকে বিশ্বাস করেন নাই। কাজেই নির্বাচনকে তাঁরা ভয় করিতেন। 'ইসলামী বিপ্লবে'র নামে তাই তাঁরা 'ইউনিক কনস্টিটিউশনের' অজুহাতে শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব ঘটাইয়াছেন। আর নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স, নিরানব্বই ধারা, মার্শাল 'ল ইত্যাদির জোরে জনগণকেই রাষ্ট্রক্ষমতা হইতে দূরে রাখিতেন। সমস্ত বিপ্লবী সরকারের মতই তারা ব্যালটের স্থলে বুলেটের শক্তিতে গদিতে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমার ইচ্ছা, আওয়ামী লীগ ভারতের কংগ্রেসের পথে চলিয়া দীর্ঘায়ু হউক। তা করিতে কংগ্রেসের মতই একটি গণতান্ত্রিক শাসন বিধান রচনা করুক। এই সোজা কাজটি না করিয়া পাকিস্তানী নেতাদের ইসলামিক ইউনিক সংবিধান দেওয়ার মত 'সমাজবাদী ইউনিক' শাসনতন্ত্র দেওয়ার অজুহাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করিবে না। খোদা না-খাস্তা আওয়ামী লীগ যদি সে ঢালু পথ ধরে তবে মুসলিম লীগের মতই তাদেরও পতন হইবে। শুধু তাদের পার্টির নয়, তাদের অর্জিত রাষ্ট্রেরও।

অথচ আওয়ামী লীগের শত্রুরাও বলিতে পারিবেন না যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচন এড়াইতে অথবা গণ-প্রতিনিধিদের অগোচরে দেশ শাসন করিতে চায়। আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য তা নয়। অতীতে আওয়ামী লীগ 'পজিশনে'ই থাকুক আর 'অপজিশনে'ই থাকুক, সকল অবস্থায় জনগণের সাথে সাথে থাকিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াই সর্বপ্রথম আজ তাঁরা এই বদনাম অর্জন করিয়াছেন। এটা করিয়াছেন তাঁরা নিজেরা অগণতান্ত্রিক পন্থায় শাসন কার্য শুরু করিয়া। এই সরকারের আর পাঁচটা ভুলের মতই এটাও তাঁদের বোনাফাইড মিস্টেক। কিন্তু স্পষ্টতঃই এবং দৃশ্যতঃই এর পরিণাম অশুভ হইয়াছে।

দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরে এড়াইয়া, উপেক্ষা করিয়া, বাইপাস করিয়া সরকার পরিচালনা করার চেষ্টাই এই ভুল। এই ভুলের একাধিক অশুভ পরিণামের দিকে মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আজকার প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে আমাদের দেশে চার শ' উনিশ জন নির্বাচিত সদস্য আছেন। এঁদের প্রায় সকলেই সরকারী দল আওয়ামী লীগের লোক। প্রথমতঃ যে নামেই ডাকুন, এঁরা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এঁরা শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিলে বাজেট আলোচনা করিতে পারিবেন না। এটা কোনও যুক্তির কথা নয়। পঁচিশজন মন্ত্রী যা পারেন, পৌনে পাঁচ শ' মেম্বর সেটা আরও ভাল পারেন। একের চেয়ে দশের সিদ্ধান্ত বেশি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, এটাই গণতন্ত্রের মূলকথা। দ্বিতীয়তঃ এঁদের বিপুল মেজরিটি এই প্রথম আইন পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছেন। সেটা দুই বছরের আগের ঘটনা। এই দুই বছরে কয়েক ঘণ্টার জন্য একদা মিলিত হইয়াছিলেন। আর না। অথচ নর্মাল পার্লামেন্টারি জীবনে এই দুই বছরে চারটি সেশনে অন্ততঃ চার পনরং ষাট দিন হাউসে মিলিত হইতেন। এটা দরকার। নির্বাচন যেমন ভোটারদের রাজনীতির ট্রেনিং স্কুল, আইন পরিষদের সেশনও তেমনি নির্বাচিত মেম্বরদের রাজনৈতিক ট্রেনিং স্কুল। গণতন্ত্রের এই গোটা প্রসেসটাই একটা পারস্পরিক শিক্ষার পাঠশালা। নির্বাচনে যেমন প্রার্থীরা ভোটারদের শিখান, আর ভোটাররা প্রার্থীদেরকে শিখান, আইন পরিষদের সেশনেও তেমনি মেম্বর, মন্ত্রী অফিসার ও স্পীকাররা পরস্পরকে জ্ঞানদান করিয়া থাকেন। এই পন্থাতেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র একটা কনস্টিটিউয়াস প্রসেস। এই প্রসেস এমনি ব্যাপক যে, দুই বছরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ও আগের তিনমাস মুদ্দত বাদ দিলেও স্বাধীনতার এই নয় মাসই আমাদের মন্ত্রী-মেম্বরদের জ্ঞান লাভের প্রাইমারী স্কুলের কাজ সারিয়া ফেলিত। শুধু নয় মাসই বলি কেন? শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা, আঠার বছর বয়স্ক সকলের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করিয়া নির্বাচন দিতে দিতে যদি আগামী ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস আসিয়া পড়ে, তবে মন্ত্রী-মেম্বররা মোটামুটি এক বছর সময়ই পাইবেন। এই সময়ের মধ্যে পরিষদের বৈঠকের অভাবে মন্ত্রীরা জানিলেন না, মেম্বররা জানিলেন না, স্বয়ং স্পীকার জানিলেন না আইন পরিষদে তাঁহাদের কর্তব্য কি? মেম্বররা জানিলেন না কেমন করিয়া পয়েন্ট অব অর্ডার, পয়েন্ট অব ইনফরমেনশন, পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ তুলিতে হয়। মন্ত্রীদের বিভিন্ন দফতরের খবর জানিবার জন্য কেমন করিয়া প্রশ্ন, শর্ট নোটিশ প্রশ্ন, সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করিতে হয়। মন্ত্রীরা জানিলেন না, কেমন করিয়া কোন্ প্রশ্নের কি জবাব দিতে হয়। সরকারী কর্মচারীরা জানিলেন না, কেমন করিয়া ঐ সব প্রশ্নের কি জবাবদানে মন্ত্রীদের সাহায্য করিতে হয়। স্বয়ং স্পীকার জানিলেন না, কেমন করিয়া রুলিং দিতে হয়। এইসব রুলিং যে হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের জাজমেন্টের মতো বিদেশের পার্লামেন্টে নজির হিসাবে উদ্ধৃত হয়, এ খবরও কেউ জানিলেন না। স্পীকার পার্টি-নেতৃত্বে যত তলের মানুষই হউন, স্পীকার হিসাবে তিনিই যে পার্লামেন্ট হাউসের

সর্বময় কর্তা এ কথা আমাদের স্পীকারও জানিলেন না। মন্ত্রীরাও জানিলেন না, পার্লামেন্টের প্রয়োজনের সময়ের দুই-এক মিনিট পরে হাউসে হাজির হইলে স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রীকেও স্পীকারের নিকট মাফ চাহিতে হয়। মেম্বরদের উত্থাপিত প্রশ্নের কোনটা এলাউ করিবেন আর কোনটা করিবেন না, তার একক এলাকা স্পীকারের। তিনি যেসব প্রশ্ন এলাউ করেন, তার উত্তর দিতে মন্ত্রীরা বাধ্য। কোন কারণে উত্তর দিতে না পারিলে প্রকাশ্য কৈফিয়ত দিতে হয়।

শুধু শিক্ষার দিকের কথাই বলিলাম। আইন পরিষদের বৈঠক কত অপপ্রচার বন্ধ করিতে পারে, মেম্বরদিগকে বিপথে যাওয়া হইতে ফিরাইতে পারে, সে কথাও ভাবিয়া দেখুন। কানে-কানের গুজব হইতে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপা তথাকথিত খবরে মেম্বরদের এমনকি মন্ত্রীদেরও বদনাম আজকাল রাস্তাঘাটের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। আইন পরিষদ চালু থাকিলে এসবেরই আলোচনা হইত পরিষদকক্ষে, পল্টনের ময়দানে নয়। এর অভাবে একজন খারাপ মেম্বরের দোষে দশজন সাধু মেম্বরের বদনাম হইতেছে। আমাদের পরিষদ প্রায় একদলীয় হওয়া সত্ত্বেও তাতে কোনও অসুবিধা হইত না।

আরেকটা ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য করুন। পাকিস্তানী আমলেও আমরা বাঙ্গালিরা একটা সুনামের অধিকারী ছিলাম। পাকিস্তানসহ সকল বিদেশী রাষ্ট্রের অভিমত এই ছিল যে, আমরা বাঙ্গালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের চেয়ে অনেক বেশি গণতন্ত্রী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। তুলনামূলকভাবে আমাদের সে সুনাম আজ নষ্ট হইয়াছে। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অধিবেশন হইয়াছে ও হইতেছে। বিশেষত কেন্দ্রীয় পরিষদের সেশন অবিরাম চলিতেছে। মেম্বররা দিন-রাত ডিবেট করিতেছেন। সেসব ডিবেটের রিপোর্ট দৈনিক কাগজ ও রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার হইতেছে। মেম্বর-মন্ত্রী ও জনগণের রাজনৈতিক ট্রেনিং চলিতেছে। অথচ আমরা বাঙ্গালিরা মার্শাল 'ল আমলের মতই অর্ডিন্যান্সে শাসিত হইতেছি। আমাদের বাজেট, আইন-কানুন সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হইতেছে না। জনগণ জানিতে পারিতেছে না, কোন আইন কেন করা হইতেছে। আমরা অন্ধকারে গুজব ছড়াইয়া সরকারের অসুবিধাই ঘটাইতেছি।

আইন পরিষদ চালু থাকিলে সংবিধান পাইবার জন্য জনগণও অসহিষ্ণু হইত না। সরকারকেও তাড়াহুড়া করিয়া ভুল-ত্রুটিপূর্ণ সংবিধান দিবার রিস্ক নিতে হইত না। সব তর্ক মিটাইবার জন্য সংবিধানের খসড়া জনগণকে দিয়া র‍্যাটিফাই করিয়া লওয়া যাইত। বস্তুতঃ সে অবস্থায় স্বাধীনতার মাত্র আট নয় মাসের মধ্যে সংবিধান রচনা করিতে না পারিলে সেটাকে কেউ অহেতুক বিলম্ব বলিতে পারিত না।

আমার অনুরোধ নেতারা বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর,'৭২

দেশের রাষ্ট্র-নামে সরকারী চরিত্রের উল্লেখ কি আবশ্যক?

আমাদের দেশের রাষ্ট্র-নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ইংরাজিতে পিপ্‌লস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। এই নাম রাখা হইয়াছিল মুজিবনগর হইতে। মুক্তিযুদ্ধের সমস্যা-সংকুল সময়ের ত্রস্ত-ব্যস্ততার মধ্যে তাড়াহুড়া করিয়া যে সব কাজ করিতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হইয়াছিল, আমাদের রাষ্ট্র-নামটিও তার একটি। তেমন সময়ের সিদ্ধান্ত সবগুলি নির্ভুল ও দোষত্রুটিহীন হইবে, এটা আশা করা যায় না। কোনও কোনও বিষয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি হইয়া গিয়াছিল। মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর ঢাকায় সরকার স্থানান্তরিত হওয়ায় এ সব ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করার সুযোগ প্রথম আসিয়াছিল। বিশেষতঃ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর এমন কতকগুলি ভুলের সংশোধন করা হইয়াছে। তার মধ্যে সরকারকে প্রেসিডেনশিয়াল হইতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে রূপান্তর এবং জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার সংশোধন ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদের দেশের রাষ্ট্র নামও এমনি একটি ব্যাপার। শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনাকালই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। এই কারণেই আজ এই আলোচনার অবতারণা করিতেছি।

আজকার রাষ্ট্র বিজ্ঞান অনুসারে রাষ্ট্রের রূপ দুইটি: এক. রাজতন্ত্র; দুই. প্রজাতন্ত্র। ইংরাজিতে মনার্কি ও রিপাবলিক। অধিকাংশ রাষ্ট্রই আগে মনার্কি ছিল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া ওগুলিকে জনসাধারণের রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছে বলিয়া তাদের অধিকাংশের রাষ্ট্র নাম রিপাবলিক রাখা হইয়াছে। সে নাম সংবিধানে বিধিবদ্ধও করা হইয়াছে। কোনপ্রকার প্রতিবিপ্লবে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া না যায়, সেটা নিশ্চিত করিবার আশাতেই এই বিধান করা হইয়াছে। এই সাবধানতা নিতান্ত অযৌক্তিকও নয়। কারণ, কোনও দেশে প্রজাতন্ত্র কায়েম হইবার বেশ কিছু দিন বাদে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্পেনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণে দুনিয়ার ছোট-বড় অনেক রাষ্ট্রই নিজেদের সংবিধানে দেশের রাষ্ট্র নামের সাথে 'রিপাবলিক' কথাটি জুড়িয়া দিয়াছে। আবার অনেক বড় বড় রাষ্ট্র নিজেদের প্রজাতন্ত্রীরূপে পূর্ণ আস্থাবান ছিল বলিয়া সংবিধানের বড়িতে নিজেদের দেশকে রিপাবলিক বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়াছে। রাষ্ট্র-নামে রিপাবলিক বিশেষণ যোগ করা

আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুনিয়ার প্রাচীনতম দুইটি বড় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র ফ্রান্স ও আমেরিকার নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরে যে-সব দেশ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়াছিল, তাদের মধ্যে সোভিয়েট রুশ নিজের রাষ্ট্র নামে 'রিপাবলিক' বিশেষণ যোগ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার আরও অনেক রাষ্ট্রই নিজেদের রাষ্ট্র-নামে রিপাবলিক বিশেষণ যোগ করিয়াছে। সবচেয়ে বড় দুই দেশের নাম করা যায় চীন ও জার্মান। ভারতীয় উপমহাদেশ দুইভাগ হইয়া ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল ঐ সময়েই। এই দুইটির মধ্যে পাকিস্তান তার রাষ্ট্র নামেই নিজেকে রিপাবলিক বলিয়াছিল; কিন্তু ভারত প্রজাতন্ত্রী হইয়াও তার রাষ্ট্র-নামে বিশেষণ যোগ করে নাই। শুধু সংবিধানের গর্ভে নিজেকে রিপাবলিক বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিল।

এতে স্পষ্টই দেখা গেল যে, বর্তমান দুনিয়ায় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের অনেকে নিজেদের রাষ্ট্র-নামে 'রিপাবলিক' বিশেষণ যোগ করিয়াছে। আর অনেকে তা করে নাই। অনেকে না করিলেও আমরা আমাদের রাষ্ট্র-নামে 'রিপাবলিক' বিশেষণ যোগ করিতে পারি। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। বরঞ্চ এটা আমাদের রাষ্ট্র-নাম সুশ্রাব্য ও সুন্দর করিয়াছে। বাংলায় 'প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' ও ইংরাজিতে 'রিপাবলিক-অব-বাংলাদেশ' দুইটাই শ্রুতিমধুর ও সুউচ্চারিত মিঠা বুলি। কিন্তু কথা উঠিয়াছে, প্রজাতন্ত্র ও রিপাবলিকের বিশেষণ লইয়া। বলা হইতেছে আমাদের রিপাবলিক'টা শুধু 'রিপাবলিক' নয়, এটা 'পিপ্‌লস রিপাবলিক'। আমাদের প্রজাতন্ত্র 'গণপ্রজাতন্ত্র'।

রাজার উল্টা দিক যেমন প্রজা, রাজতন্ত্রের উল্টাটাই তেমনি প্রজাতন্ত্র। প্রজাসাধারণ ও জনসাধারণের পার্থক্য বোঝা যেমন কঠিন, গণ-প্রজাতন্ত্র বোঝাও তেমনি কঠিন। আমাদের বাংলাদেশ কোন দিন রাজতন্ত্রী দেশ হইবে না, বরাবর প্রজাতন্ত্রী দেশ থাকিবে, এটা অতি সহজ কথা। কিন্তু সেই প্রজাতন্ত্রটা আবার গণপ্রজাতন্ত্র হইবে কেমন করিয়া, আমাদের নেতারা আজও তা বুঝাইয়া দেন নাই। আগেই বলিয়াছি, নেতারা এ নাম রাখিয়াছিলেন মুজিবনগরে ব্যস্ততার মধ্যে। তখন বুঝাইবার সময় সুযোগও দরকার ছিল না। সম্ভবতঃ এখন সময় হইয়াছে। গণপরিষদে সংবিধান আলোচনার সময় তাঁরা নিশ্চয়ই এটা বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। সে আলোচনায় পেশ করা যুক্তিসমূহ আন্দায ও অনুমান করিয়া এ বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতেছি।

যুক্তিতে প্রবেশ করিবার আগে দেখা যাক, দুনিয়ায় এর নজির আছে কোন্ কোন্ দেশে। নিজের রাষ্ট্র নামের 'রিপাবলিক' কথার আগে শুধু 'পিপ্‌লস' শব্দ যোগ করিয়াছে সারা এশিয়াতে একমাত্র চীন। প্রজাতন্ত্রী চীনই নিজের রাষ্ট্র নাম রাখিয়াছে 'পিপ্‌লস রিপাবলিক অব চায়না'। আমি যতদূর জানি, সারা ইউরোপে আর একটি মাত্র দেশ

নিজেকে পিপ্‌ল্‌স রিপাবিলক বলিয়া থাকে। সেটা বুলগেরিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় সমাজবাদী যতগুলি রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তারা সকলেই নিজেদের দেশের রাষ্ট্র নাম রাখিয়াছে 'পিপ্‌ল্‌স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক'। এতে দেখা যায়, যতগুলি রিপাবলিক তাদের রাষ্ট্র নামে 'পিপ্‌ল্‌স' বিশেষণ যোগ করিয়াছে, তারা পিপ্‌ল্‌স কথাটার দ্বারা তাদের ডেমোক্র্যাসির গুণ বুঝাইয়াছে, রিপাবলিকের গুণ বুঝায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এশিয়ার 'পিপ্‌ল্‌স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া' (উত্তর কোরিয়া) ও পিপ্‌ল্‌স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবিলক অব ভিয়েৎনাম' (উত্তর ভিয়েৎনাম) এই দুইটির নাম করা যাইতে পারে। ইউরোপ ও আফ্রিকায়ও অমন অনেক দেশের নাম করা যাইতে পারে। তারাও নিজেদের দেশের রাষ্ট্র নাম রাখিয়াছে পিপ্‌ল্‌স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক। কিন্তু কেউই ডেমোক্র্যাটিক শব্দ বাদ দিয়া শুধু 'পিপ্‌ল্‌স রিপাবলিক' নাম রাখে নাই। এমতাবস্থায় দুনিয়ার আর কোনও দেশের নজিরে আকৃষ্ট না হইয়া আমাদের নেতারা চীনের রাষ্ট্র নামে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন কেন, তার কারণও নেতারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুকে বুঝাইয়াছেন এবং গণপরিষদের বৈঠকে দেশবাসীকেও বুঝাইবেন।

ইতিমধ্যে আমরা চলুন যুক্তিগুলির আলোচনা করি।

প্রজাতন্ত্রের গণরূপ ছাড়া আর কোনও রূপ নাই। কাজেই প্রজাতন্ত্রের 'গণ'-বিশেষণ অনাবশ্যক কথাটা প্রবন্ধের গোড়াতেই বলিয়াছি। এই দিক হইতে রাষ্ট্র নামের কোনও বিশেষ অর্থজ্ঞাপক বিশেষণ থাকা অযৌক্তিক। তবু অনেক রাষ্ট্রের নামের মধ্যে যে 'পিপ্‌ল্‌স্' শব্দটার ব্যবহার দেখা যায়, সেটা ডেমোক্র্যাটিক শব্দটার গুণবাচক, সে কথাও গোড়ায় বলিয়াছি। 'পিপ্‌ল্‌স' শব্দের এমন ব্যবহার তেমন অযৌক্তিক নয়। গণতন্ত্রের অনেক রূপ, এটা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। সেই বহুরূপের পরেও কমিউনিস্টরা 'বুর্জুয়া গণতন্ত্র' বলিয়া আরেকটা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ কথাটাও নিতান্ত উড়াইয়া দিবার মতো নয়। পুঁজিবাদী ধনী সমাজে নির্বাচনকে বাদশাহী পোলাও-কোর্মা ও কোটিপতিদের হুইস্কি-ব্র্যাণ্ডির মত যেরূপ দুর্মূল্য করা হইয়াছে, তাতে 'বড় লোকের গণতন্ত্র' ও 'গরীবের গণতন্ত্র', 'ক্লাসেস ডেমোক্র্যাসি' ও 'পিপ্‌ল্‌স ডেমোক্র্যাসি'র পার্থক্য করা খুব অসংগত হইবে না।

কিন্তু ডেমোক্র্যাসিটা সরকারের চরিত্র, রাষ্ট্রের চরিত্র নয়। অতএব রাষ্ট্র-নামে গভর্নমেন্টের রূপের ও চরিত্রের উল্লেখ থাকার কোনও প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয়। সরকার পরিবর্তনশীল। সরকারের চরিত্র ডেমোক্র্যাটিকও হইতে পারে, ডিক্টেটরশিপও হইতে পারে। আজকার ডিক্টেটরশিপ কাল গণতন্ত্রী হইতে পারে। আজ যে সরকার গণতন্ত্রী কাল তা ডিক্টেটরশিপ হইতে পারে। রূপান্তরিত সেইজন্য সংবিধানে

রাষ্ট্রের রূপ প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক এই একটি কথায় বর্ণনা করিয়া সরকারের চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিধান করা হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় যদি জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা হাসিল করিয়া কোনও নয়া রাষ্ট্র তার রাষ্ট্র-নামে গণতন্ত্রকে নিশ্চিতরূপে জন-গণতন্ত্র আখ্যায়িত করিতে চায়, তবে সেটাও দোষের হইতে পারে না। আমাদের নেতারা যদি সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-নামে 'পিপ্‌ল্‌স' কথাটি যোগ করিতে চাহিতেন, তবে তাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্র-নাম রাখিতেন 'পিপ্‌ল্‌স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' শুধু 'পিপ্‌ল্‌স রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' রাখিতেন না। অন্যকথায় রাষ্ট্র-নাম চীনকে অনুকরণ না করিয়া উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনামকেই অনুকরণ করিতেন।

আসলে কিন্তু এদের কাউকে আমরা অনুকরণ করিতে পারি না। কারণ চীনই বলুন, আর ভিয়েৎনাম-কোরিয়াই বলুন, তারাও আমাদের মতো সমাজবাদী সত্য, কিন্তু আমাদের মতো পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে তারা বিশ্বাস করে না তাদের দেশে একদলীয় শাসন চলিতেছে। শাসক দল সেখানে কনিউনিস্ট বা পিপ্‌ল্‌স পার্টি, যে নামেই কাজ করুক, অন্য কোনও পার্টির সেখানে সরকার দখলের চেষ্টা করার অধিকার নাই।

অথচ আমরা সমাজবাদী হইয়াও নিরংকুশ গণতন্ত্রী। আমরা পার্লামেন্টারি ফর্মের ক্যাবিনেট সিস্টেমের গভর্নমেন্ট চালাইতেছি। আমরা দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল চালাইতে দিতেছি। তাদেরে ইচ্ছামত সভাসমিতি করিতে ও সংবাদপত্র পরিচালন করিতে দিতেছি। নির্বাচনও আসন্ন। এই নির্বাচনে সকল দলই স্বাধীনভাবে লড়িতে পারিবে। যে দল সবচেয়ে বেশি আসন লাভ করিবে, জনগণের আস্থাভাজন দল হিসাবে তারাই গভর্নমেন্ট গঠন করিবে। এক কথায়, আমরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সকলপ্রকার আয়োজনই করিয়া ফেলিয়াছি। শুধু কাজে-কর্মে নয়, আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধানেও পরিষ্কার ভাষায় বিধান করা হইতেছে যে, বাংলাদেশ একটি পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই হিসাবে পশ্চিমা গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমাদের দেশের রাষ্ট্র-নামে ও রাষ্ট্র-চরিত্রে কোনও পার্থক্য থাকিবার কথা নয়। তবে এক জায়গায় ঐসব দেশের সরকার ও আমাদের সরকারের বিঘোষিত নীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। গণতন্ত্রের সাথে সমাজবাদও আমাদের সরকারের আদর্শ। এইদিক হইতে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের হুবহু মিল রহিয়াছে একমাত্র ভারতের সাথে। আমাদের মতই ভারতও গণতন্ত্র ও সমাজবাদে বিশ্বাসী। এইদিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র-নামেও ভারতের সাথে বাংলাদেশের মিল থাকিতে পারিত।

কিন্তু ভারত বহু 'স্টেটসের' একটি যুক্তরাষ্ট্র। একটি ফেডারেশন। কিন্তু রাষ্ট্র নামে ভারত নিজেকে 'ফেডারেশন' না বলিয়া 'ইউনিয়ন' বলিয়াছে। এ ব্যাপারে ভারতের সংবিধান রচয়িতারা অস্ট্রেলিয়া-কানাডা-সুইজারল্যাণ্ডকে অনুসরণ না করিয়া রাশিয়াকে অনুসরণ করিয়াছে। রাশিয়া তার অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকসমূহের পূর্ণ অটনমি ও সভারেন্টি মানিয়া লইয়াও নিজেকে ফেডারেশন না বলিয়া 'ইউনিয়ন' বলিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত স্টেটসমূহের কনফেডারেশনরূপে রাষ্ট্রীয় জীবন শুরু করিলেও নিজেকে রাষ্ট্র-নামে ফেডারেশন বলে নাই। 'ইউনাইটেড' কথাটার মধ্যে 'ইউনিয়নের' তাৎপর্য লুকাইয়া রাখিয়াছে।

বাংলাদেশ আমাদের এক ভাষিক এক কৃষ্টিক, এক বর্ণা, এক রংগা মানব-গোষ্ঠীর অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তা। এখানে ফেডারেশন বা ইউনিয়ন গঠনের প্রশ্ন অবান্তর। এখানকার জনগণের শতকরা পঁচানব্বই জনই মেহনতী কৃষক-শ্রমিক। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংগ্রামী জনতা। নিরংকুশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ইংরেজ আমলের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত এবং পাকিস্তানী আমলের প্রাদেশিক নির্বাচন হইতে গণপরিষদ নির্বাচন পর্যন্ত কোনও নির্বাচনেই তারা ভুল করে নাই। একাদিক্রমে পঞ্চাশ বছরের নির্বাচনের ইতিহাস বাংলাদেশের 'বর্ণ-জ্ঞানহীন অশিক্ষিত' জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞানের জাজ্বল্যমান সাক্ষী। ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহারে এরা অনেক শিক্ষাগর্বিত সুধী সমাজকেও হারাইয়া দিয়াছে। এ কাজে জনগণ কদাচ ভুল করে নাই। ভুল অথবা বিশ্বাস ভংগ করিয়াছেন এদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। অতএব সরল সহজ একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানই এদের স্বার্থ রক্ষার অব্যর্থ রক্ষাকবচ। শুধু তাতে এই নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে নির্বাচনী ওয়াদা খেলাপ করিতে অথবা সরকার গঠন ও বদলে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে না পারেন। এর নিরংকুশ বিধান থাকিলে রাষ্ট্র-নামে কোনও চমকপ্রদ বিশেষণ থাকিবার দরকার হইবে না। বস্তুতঃ গণতন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন চালাকির মওকা থাকিলে রাষ্ট্র-নামে হাজার 'পদ্মলোচন' থাকিলেও অথবা সংবিধানের অবজেকটিভ প্রিন্সিপলসে হাজার শ্রুতিমধুর কথা থাকিলেও তা জনগণের কোনও কাজে লাগিবে না।

এ অবস্থায় আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের সংবিধান রচয়িতারা যথাসম্ভব জটিলতা এড়াইয়া চলিবেন। যা অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিবেন, শুধু তাই লিপিবদ্ধ করিবেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র যদি বিশ্বাস করেন, তবে অস্পষ্ট 'পিপল্‌স ডেমোক্র্যাসির' কথা বলিবেন না। যদি সোজা সহজ প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তবে 'গণ-প্রজাতন্ত্র' বলিয়া জটিলতার দুর্বোধ্যতা বাড়াইবেন না। যদি চীনের মতো এক পার্টি শাসন কায়েম করিতে না চান, তবে চীনের অনুকরণে নিজেদের রাষ্ট্র-নাম 'পিপল্‌স রিপাবলিক' রাখিবেন না। যদি রাখেন তবে শুধু আমাদের বিদেশী বন্ধুরাই আমাদের ভুল বুঝিবেন না, আমাদের জনগণও ভুল বুঝিবেন। এটা স্পষ্টতঃই আমাদের ক্রান্তিকাল। এই সন্ধিক্ষণে অনেক বুদ্ধিমান, ঘরে-বাইরের অনেক হিতৈষী আমাদিগকে যাচিত-অযাচিত অনেক সলা-পরামর্শ দিবেন। আমাদের উচিত হইবে সবচেয়ে সহজ ও সোজা পথ বাছিয়া লওয়া। আমাদের জনগণও সোজা পথই পছন্দ করিবে। সোজা পথই কল্যাণের পথ।

২২শে সেপ্টেম্বর, '৭২

রাষ্ট্র পরিচালনায় যৌবনের অধিকার স্বীকৃতি

এটাকেই বলে বিপ্লব। হিংস্র, সশস্ত্র, জংগী বিপ্লব না। অহিংস, নিরস্ত্র, নীরব, দেওয়ানী বিপ্লব। বাংলাদেশ সরকার কলমের এক খোঁচায় এই বিপ্লব সাধন করিয়াছেন। একটি মাত্র হুকুমে বাংলাদেশের ভোটার সংখ্যা প্রায় পনর লক্ষ বাড়াইয়া দিয়াছেন। আঠার বছর বয়সের সকলকে ভোটাধিকার দিয়াছেন। আগামী নির্বাচনেই এটা ঘটিবে। আসন্ন ভোটার তালিকায় এদের নাম তুলিবার জন্য চীফ ইলেকশন কমিশনার নির্দেশ জারি করিয়াছেন।

এটা শুধু ভোটাধিকার সম্প্রসারণের মামুলি ব্যাপার নয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সরকার গঠনে যৌবন ও তারুণ্যের অধিকার স্বীকৃতির বিপ্লবী পদক্ষেপ এটা। পদক্ষেপটা করিয়াছে দুনিয়ার কনিষ্ঠতম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। একদিকে বিশ্বের প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র মার্কিন, অপর দিকে সর্বজ্যেষ্ঠ সমাজবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া যা করে নাই, দশ মাসের শিশু বাংলাদেশ তাই করিয়াছে তার জীবনের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে।

অনেকের মনে হইতে পারে আমি ভুল বলিতেছি। কারণ কিছুদিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোটের বয়স একুশ হইতে কমাইয়া আঠারো করিয়াছে। আসন্ন প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে মার্কিনবাসী আঠার বছর বয়সের তরুণরা এবারই প্রথম ভোটাধিকার ভোগ করিবে। আর সোভিয়েট রাশিয়া ভোটাধিকারের বয়স একুশ হইতে নামাইয়া আঠার করিয়াছে ষোল বছর আগে ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ সালের সংশোধিত রুশ শাসনতান্ত্রিক সংবিধানে এই ভোটাধিকার সংযোজিত হইয়াছে।

পাঠক বলিবেন, তবে আর বাংলাদেশ সরকার নতুন কি করিয়াছেন? রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে যা করিয়া ফেলিয়াছে বাংলাদেশ সরকার তারই অনুকরণ-অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। আসল ঘটনা তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়া অথবা অন্য কোন গণতান্ত্রিক বা সমাজবাদী রাষ্ট্র যা করেন নাই, বাংলাদেশ সরকার তাই করিয়া ফেলিয়াছেন। সব দেশেই ভোট দিবার ও ভোট পাইবার অধিকারের পার্থক্য করা হইয়াছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ভোট দিবার বয়স একুশ। কিন্তু নির্বাচন প্রার্থী হইবার, তার মানে, ভোট পাইবার বয়স বাঁধা আছে পঁচিশে। রাশিয়ার ভোটাধিকার প্রয়োগের বয়স কমাইয়া আঠার করিয়াছে ষোল বছর আগে। কিন্তু সুপ্রীম সোভিয়েট অর্থাৎ ন্যাশনাল পার্লামেন্টের মেম্বর হইবার সর্বনিম্ন বয়স সেখানে তেইশ বছর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটদানের বয়স কমাইয়া এবার আঠার করা হইয়াছে; কিন্তু সিনেট বা

প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচন প্রার্থী হইবার বয়স সেখানে এখনও যথাক্রমে ত্রিশ ও পঁচিশ রাখা হইয়াছে। রুশ-মার্কিন সহ দুনিয়ার সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোট দিবার ও পাইবার অধিকারের মধ্যে এই যে ব্যবধান রাখা হইয়াছে, এটা শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, জাতিসংঘের চার্টারে লিপিবদ্ধ মানবাধিকারের ফাণ্ডামেন্টালেরও বিরোধী। জাতিসংঘের চার্টার-অব-হিউম্যান রাইটসের ২১ ধারার ১ ও ৩ উপাধারায় 'এভরিওয়ান' (প্রত্যেক ব্যক্তি) কথাটা কোনও বিশেষণ দ্বারা সঙ্কুচিত করা হয় নাই। ঐ ধারাতেই 'ইউনিভার্সেল' ও 'ইকুয়াল সাফরেজ' কথা দুইটাকেও কোনও বিশেষণ দ্বারা সংকীর্ণ করা হয় নাই। স্পষ্টই বলা হইয়াছে ঐ 'এভরিওয়ানের' সমবায়ে 'ইউনিভার্সেল' ও 'ইকুয়াল' ভোটাধিকার প্রয়োগে জনগণের যে ইচ্ছা প্রকাশ পাইবে সে ইচ্ছাই হইবে সমস্ত রাষ্ট্রের ভিত্তি। অতএব, জাতিসংঘের মানবাধিকার ও ভোটাধিকারে কোনও বয়স সীমার উল্লেখ নাই।

ভোটাধিকারের বয়স-সীমা নির্ধারিত হইয়াছে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত 'এডাল্ট' (প্রাপ্ত বয়স্ক) শব্দটার ব্যাখ্যা হইতে। এমন দাঁড়াইয়াছে যে 'ইউনিভার্সেল সাফরেজ' কথাটা শেষ পর্যন্ত 'এডাল্ট সাফরেজে' রূপান্তরিত হইয়াছে। রাজনীতিতে 'এডাল্ট' শব্দটার অর্থ করা হইয়াছে আইন-আদালতের 'মেজর' বা 'সাবালেগ' শব্দের ব্যবহার অনুসারে। প্রাচীন যুগের গ্রীস-রোম ও মধ্যযুগের ইংলণ্ডের নেতৃত্বে সারা ইউরোপ; এমনকি তৎকালীন পশ্চিমা সভ্য জগতের সর্বত্র একুশ বছরকেই সাবালকত্বের নিম্নতম বয়স-সীমা ধরা হইত। ইউরোপের মতো শীতপ্রধান দেশে সত্য-সত্যই বালক-বালিকাদের কিশোরত্ব কাটিতে একুশ বছর লাগিত।

কিন্তু প্রাচ্যের ধর্মীয় অনুশাসন ও আইন-আদালত স্বভাবতঃই একুশ বছরের বয়স-সীমা মানিয়া লয় নাই। ইসলামী শরিয়ত ও হিন্দু শাস্ত্রমতে সাবালকত্ব প্রাপ্তির বয়স বরাবরই ষোল বছর ধরা হইয়াছে। ষোল বছরের হিন্দু-মুসলিম ছেলেমেয়েকে আইন ও সমাজ সাবালক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই বয়সের বালক-বালিকারা স্বেচ্ছায় ও পিতামাতা ও মুরুব্বিদের অমতে নিজেরা বিয়া-শাদি করিতে পারে। সম্পত্তির অধিকার ও দখল দাবি করিতে পারে। এই আচার, প্রথা ও বিধান ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বৃটিশ সরকারও তা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতে ইংরাজ শাসন কায়েম হইবার অব্যবহিত পরেই ১৮৭৫ সালে ইণ্ডিয়ান মেজরিটি এ্যাক্ট বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হইয়াছিল। ইংরাজদের নিজেদের আইনে একুশ বছরই সাবালকত্বের নিম্নতম বয়স থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের জন্য আঠার বছরকেই সাবালকত্বের নিম্নতম বয়স নির্ধারিত করিয়া ইণ্ডিয়ান মেজরিটি এ্যাক্ট পাস হইয়াছিল। কিন্তু শাসকজাতি ইংরেজের নিজস্ব বিধানের সাথে একটা মিল দেখাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান মেজরিটি এ্যাক্টে এমন বিধানও করা হইয়াছিল যে, কোন নাবালক জমিদারের জমিদারী

যদি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে নেওয়া হইয়া থাকে, অথবা কোন নাবালকের গার্ডিয়ান যদি আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া গিয়া থাকে, তবে তার সাবালকত্ব প্রাপ্তিটা আঠার বছরে হইবে না; ওটা একুশ বছরে হইবে। গার্ডিয়ান না থাকিলে নাবালক আঠার বছরে বুদ্ধিমান সাবালক হইয়া যায়, আর গার্ডিয়ান থাকিলে তার বুদ্ধি পাকিতে তিন বছর বেশি সময় লাগে। গার্ডিয়ানের এই 'উপকারিতা' যতই হাস্যকর হউক, পুরা একুশ বছরের ইংরাজ রাজত্বে আমাদের দেশে এই আইনই বলবৎ ছিল। তবে ইংরাজের ঐ আইনের এইটুকু উদারতা ছিল যে, হিন্দু-মুসলিম ভারতবাসীর বিয়া-শাদির ব্যাপারে ঐ 'মেজরিটি' আইন বাধ্যকর ছিল না।

বিয়া-শাদির ব্যাপারে আমরা ষোল বছরেই দায়িত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতাম বটে; কিন্তু ইংরাজ শাসকের বিচারে রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান আমাদের একুশ বছর পূর্ণ হইবার আগে উন্মেষ লাভ করিত না। ষোল বছর বয়সে আমরা ছেলের বাপ-মা হইতে পারিতাম, সংসার চালাইতে পারিতাম, হাট-বাজার করিতে পারিতাম, টাকা-পয়সার জমা-খরচ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু ঐ ভাবে পাঁচটা বছর যাপন করিয়া একুশ বছর বয়স না ধরা পর্যন্ত আমরা ভোটের দায়িত্ব বহন করিতে পারিতাম না। কারণ, রাজনীতি বা দেশ শাসন বড় কঠিন দায়িত্ব। বিদেশী শাসকদের এটাই ছিল বিচার।

এইভাবে ইউরোপ-আমেরিকার প্রভাবে দুনিয়ার সব সভ্য জাতি এই 'সত্যটা' একরূপ মানিয়াই লইয়াছে যে, মানুষ একুশ বছর বয়স প্রাপ্তির আগে রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করে না। একুশ বছর হইলে পর তাকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভোট পাইবার অর্থাৎ নির্বাচন প্রার্থী হইবার যোগ্যতা অর্জনে আরও পাঁচ হইতে দশ বছর লাগে। তাই পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়স না হইলে তাকে আইনসভার মেম্বর মন্ত্রী হইতে দেওয়া ত যায়ই না, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বরগিরি দিয়াও বিশ্বাস নাই।

দুনিয়ায় গণতন্ত্রের, মানে ভোটাভুটির রাজনীতির বয়স আজ প্রায় দুই শ' বছর। এই দুইশ' বছর ধরিয়াই একুশ বছরের কম বয়সের তরুণরা সকল প্রকার রাজনীতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, অথচ কারা এই তরুণ? দুনিয়ায় সমস্ত মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখুন। সে সব আন্দোলনের পতাকা বহন করিয়াছে কারা? চীনের ডাঃ সানইয়াৎসেন, রুশিয়ার লেনিন, মিশরের জগলুল ও তুরস্কের কামালের মুক্তি আন্দোলনই বলুন, আর আমাদের ভারতবর্ষের আলী ভাই'র খিলাফত আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা আন্দোলন, কায়েদে আজম জিন্নার পাকিস্তান আন্দোলন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি ভেলেরার আইরিশ মুক্তি আন্দোলন, ইত্যাদি যত আন্দোলনের ফলে মানবজাতির মুক্তি ধাপে ধাপে আগাইয়া গিয়াছে, এসব আন্দোলনের আহবানে নেতাদের পাশে

সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল কারা? স্কুল কলেজের ছাত্র তরুণরা ত? তারও দুই বছর আগের ইতিহাসের পাতা খুলিয়া দেখুন, মার্কিন বিপ্লবের ওয়াশিংটন জেফারসন, ফরাসী বিপ্লবের রুশো ভল্টেয়ার রবস্‌পেয়ার, ইতালি মুক্তি আন্দোলনের ম্যাষ্‌যিনি গ্যারিবলডি প্রমুখ দুনিয়া জাহানের যত মুক্তি আন্দোলনের সেনাপতিদের নাম করিবেন তাঁদের সকলের এবং প্রত্যেকের সৈন্যবাহিনীতে দেখিবেন যার তার দেশের স্কুল কলেজের ছাত্র তরুণদেরই ভিড়। আমাদের ঘরের কোণের '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা আন্দোলন, '৬৬ সালের আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলন ও সর্বশেষ '৭০ সালের নির্বাচন যুদ্ধ ও '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, এ সবের স্পিয়ারহেড ছিল আমাদের ছাত্র তরুণরাই।

অতীতে আন্দোলন যখন সফল হইয়াছে. নেতারা যখন ক্ষমতার আসনে বসিয়াছেন, তখন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক ছাত্র-তরুণদের বলিয়াছেন: 'তোমাদের কাজ শেষ। তোমরা এখন ছাত্রাবাসে ফিরিয়া যাও। পড়াশুনায় মন দাও। ছাত্রানাং অধ্যয়ং তপঃ।' বাধ্য অনুগত তরুণরা গুরু-বচন শিরোধার্য করিয়া ঘরে ফিরিয়া পড়ায় মন দিয়াছে। নেতারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করিয়াছেন। ঠিক কাজও করিয়াছেন, ভুল কাজও করিয়াছেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তরুণদের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন নাই। তরুণরা কথা বলিলে মুরুব্বীরা ধমক দিয়াছেন: 'চুপ কর। তোমরা রাজনীতির কি বুঝ?'

এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে গত দুইশ' বছর। রাষ্ট্র পরিচালনায় তরুণদের দাবীর কথা কারও মনে পড়ে নাই। একুশ বছর বয়সে মুখভরা দাড়ি-গোঁফ না হওয়া পর্যন্ত ভোটাধিকার নাই। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ চুলে পাক না ধরিলে মেম্বর-মন্ত্রী হওয়ার অধিকার নাই।

দুইশ' বছরের এই ট্র্যাডিশন ভাংগিয়াছে আজ আওয়ামী লীগ। আঠার বছর বয়স্ককে শুধু ভোট দিবার অধিকার দেয় নাই, ভোট পাইবার অধিকারও দিয়াছে। এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা। নিজের রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা যার স্বীকার করা হইল, অপরের পক্ষে সে অধিকার ও দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অস্বীকার করার মধ্যে কোনও সংগতি নাই। কাজেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব আজ বাংলাদেশের সংবিধান ভোট দিবার ও ভোট পাইবার অধিকারকে সমান এক স্তরে উন্নীত করিয়াছে। আঠার বছর বয়স্ক বাংগালি তরুণ শুধু ভোট দিতে পারিবে না, ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইয়া দেশের প্রধানমন্ত্রীও হইতে পারিবে।

এটা শুধু থিওরেটিক্যাল সত্য নয়। প্র্যাকটিক্যাল সত্যও এটা। একুশ বছর হইতে আঠারো বছরে ভোটাধিকারের সীমা নামাইয়া আমাদের সরকার বাংলাদেশের প্রায় পনর লক্ষ ছাত্র-তরুণকে রাষ্ট্র পরিচালনার নাগরিক অধিকার দিলেন। ইউনাইটেড নেশানসের পরিসংখ্যান দফতরের মধ্যে ১৯৫১ সালে দুনিয়ার লোকসংখ্যার যে হিসাব করা

হইয়াছিল, তাতে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে মানে আমাদের বাংলাদেশ অঞ্চলে ১৮-২১ বছর এজ-গ্রুপে জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন। এই আনুপাতিক হিসাবে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাসেন্দার মধ্যে ১৫ লক্ষই এই এজ-গ্রুপের। উপরোক্ত হিসাবে আরও বলা হইয়াছে যে, ঐ শতকরা ১৭র মধ্যে শতকরা ৯ জন মেয়ে আর ৮ জন ছেলে। তার মানে আমাদের এই নতুন ভোটারদের মধ্যে ৭ লক্ষ যুবক ও ৮ লক্ষ যুবতী থাকিবেন। তরুণদের সবাই প্রবীণদের চেয়ে উৎসাহী ও কর্মক্ষম। রাজনৈতিক অধিকার চেতনায়ও তারা জাগ্রত। এ অবস্থায় নির্বাচনে এঁদের ভোট পড়িবে প্রবীণদের শতকরা হারের চেয়ে অনেক বেশি। মেয়েদের বেলা এটা হইবে আরও বেশি সত্য। আমাদের পাড়াগাঁয়ের প্রাচীনা প্রবীণরা নানা কারণে ভোটাধিকারে যতটা উদাসিনতা দেখান, তরুণীরা নিশ্চয়ই তা করিবেন না। কাজেই আগামী নির্বাচনে তরুণ নতুন ভোটারদের শতকরা আশী-নব্বই জনই ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

আওয়ামী লীগ সরকার এইভাবে ভোটাধিকারের বয়স সীমা না নামাইলে এই এজ-গ্রুপের তরুণদের উপর কত বড় অবিচার হইত, এই প্রসঙ্গে সে কথাটা না তুলিয়াও পারিতেছি না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ই.পি. আর ও পুলিশ বাহিনীর লোক ছাড়া স্কুল-কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র-তরুণদের যাঁরা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁদের সংখ্যা মোটামুটি সত্তর হাজার। এই সত্তর হাজার তরুণ তরুণীর মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার ছিলেন ১৮-২১ এজ-গ্রুপের লোক। ভোটাধিকারের বয়স সীমা না কমাইলে এই পঞ্চাশ হাজার মুক্তিযোদ্ধাও স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিত। এই দিক হইতে বর্তমান সরকার ভোটাধিকারের বয়স-সীমা কমাইয়া এই এজ-গ্রুপের তরুণদের কাছে দেশবাসী একটা ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। দুইশ' বছর বয়সের প্রবীণ রাষ্ট্রেরা যা পারে নাই, দশ মাসের শিশু রাষ্ট্র বাংলাদেশ তাই করিয়াছে। তরুণ তারুণ্যের মর্যাদা না দিলে আর কে দিবে? তারুণ্যের সাথে আপোস করিয়াই রাষ্ট্র অশুভ বিপ্লব হইতে রক্ষা পায়। এ ব্যবস্থাই আজ আওয়ামী নেতৃত্ব করিয়াছেন। ভোটিং জনতার যৌবনের ঢেউ তুলিয়াছেন। গোটা ভোটিং জনতার তা ত প্রভাবিত হইবেই। বাংলাদেশের আসন্ন প্রথম নির্বাচনেই যৌবনের জয় হইবে। যৌবনের সে জয়যাত্রা আওয়ামী নেতৃত্বের গতিবেগ শক্তি যোগাইবে কি না, তা নির্ভর করিবে আওয়ামী লীগের ইতিমধ্যেকার গণতান্ত্রিক সদাচারের উপর। সাড়ে সাত কোটি বাংগালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে আওয়ামী লীগ আসন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক, সারা অন্তর দিয়া আমি সেই কামনা করিতেছি।

২৯শে সেপ্টেম্বর, '৭২

সংবিধানের বাংলা মুসাবিদায় পরিভাষার উৎপাত

গণ-পরিষদে আমাদের মুসাবিদা সংবিধান বিলের আলোচনা শুরু হইয়াছে। আমি অন্য এক প্রবন্ধে পরিষদকক্ষে এই বিলের বিস্তারিত দীর্ঘায়িত আলোচনার অনুরোধ করিয়াছি। আমার আশা, পার্টি বৈঠক ছাড়াও পরিষদ কক্ষেই তেমন আলোচনার ব্যবস্থা হইবে। সেই সুযোগে পরিষদ-কক্ষের বাহিরেও অনেকেই সে আলোচনায় শরিক হইবেন। 'ইত্তেফাকে'র পৃষ্ঠায় আমিও হইব। বিধানসমূহ সম্বন্ধে আগামী সপ্তাহে আলোচনা করিব। আজ শুধু মুসাবিদার ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিব।

কিন্তু তার আগেই মানে মুসাবিদার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করিবার আগেই, বিধান সম্পর্কে একটি কথা বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছি। ইতিমধ্যে আমি সরকারী দলকে যে আগাম প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছি এত দ্বারা আমি তা প্রত্যাহার করিতেছি। ইত্তেফাকে'র পাঠকদের মনে আছে আমি গত ১২ই আশ্বিনের ইত্তেফাকে 'রাষ্ট্র পরিচালনায় যৌবনের অধিকার স্বীকৃতি' শীর্ষক নিবন্ধে সরকারী দলের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছিলাম। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম এবং সে খবরে বিশ্বাস করার সংগত কারণও ছিল যে, সংবিধানের মুসাবিদায় আঠার বছর বয়স্কদের শুধু ভোটাধিকারই দেওয়া হয় নাই, নির্বাচন প্রার্থী হইবারও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাই ঐ প্রবন্ধে আমি আওয়ামী লীগ দলকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নিরস্ত্র বিপ্লবী দল বলিয়াছিলাম। এখন মুসাবিদার ৬৬ নং ধারা পড়িয়া জানিতে পারিলাম আমি ভুল খবর পাইয়াছিলাম। নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স সীমা পঁচিশ বছর করা হইয়াছে। এটা মামুলি প্রচলিত বিধান। বরঞ্চ সোভিয়েট ইউনিয়নের তেইশ বছরের বিধানের চেয়ে এটা পশ্চাদগামী। ফলে আমার ঐ আগাম প্রশংসাটা বেজায়গায় পড়িয়া নিরর্থক হইয়া গিয়াছে। তাই আমি এতদ্বারা সে প্রশংসা প্রত্যাহার করিতেছি। কাকেও প্রশংসা একবার করিয়া ফেলিলে তা প্রত্যাহার করা খুবই অন্যায় ও বেদনাদায়ক। তবু এটা করিতে আমি দুঃখের সহিত বাধ্য হইতেছি। তবে এটাও বলিয়া রাখিতেছি যে খসড়া সংবিধানের আলোচনাকালে ৬৬ ধারার সংশোধনে নির্বাচন প্রার্থীর বয়স কমান হইলে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে ঐ প্রশংসা আবার ফিরাইয়া দিব।

এখন মুসাবিদার ভাষার আলোচনায় আসা যাক। দাবী করা হইয়াছে। মুসাবিদাটি আগে বাংলায় করিয়া পরে তার ইংরাজি তর্জমা করা হইয়াছে, কথাটা ঠিকই হউক আর বেঠিকই হউক, বাংলা মুসাবিদার ভাষাটা মোটামুটি খুবই ভালো হইয়াছে। আগে বাংলায় মুসাবিদা করিয়া তার ইংরাজি তর্জমাই করা হইয়া থাকুক, অথবা আগে ইংরাজিতে মুসাবিদা করিয়া পরে তার বাংলা তর্জমাই করা হইয়া থাকুক, উভয় অবস্থাতেই রচয়িতারা এ প্রশংসার পাত্র। বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনার প্রয়াস একটু ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন কাজ। কারণ এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন উদ্যম। এর কোনও নজির ও মডেল দুনিয়ায় নাই। অথচ ইংরাজি ভাষায় শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা অনেক হইয়াছে। এ সবের সবগুলি অথবা যে কোনও একটি, আমাদের রচয়িতাদের জন্য সুন্দর মডেল হইতে পারিত। সম্ভবতঃ হইয়াছেও। বাংলায় মুসাবিদা রচনা করিবার দায়িত্ব যে তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছিল, তারা সকলেই সর্বজনস্বীকৃত উচ্চশ্রেণীর ভাষাবিদ। কিন্তু তারা রাজনীতিকও নন, উকিলও নন। শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় তাঁদের বিশেষজ্ঞ হইবার কথা নয়। সংবিধান রচনাটা শুধু সাহিত্য রচনার কাজ নয়। তাই শুধু ভাষাবিদ সাহিত্যিক হইলেই সংবিধান রচনার কাজ চলে না। সংবিধান এমন একটা জাতীয় দলিল যা শুধু দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক নয়, দলিল হিসাবেও এটাকে ভবিষ্যৎ আলোচনা-সমালোচনার মুখে টিকিয়া থাকিতে হয়। এর প্রত্যেকটি ধারা, ধারাসমূহের প্রত্যেকটি বাক্য এবং বাক্যসমূহের প্রত্যেকটি শব্দ ভবিষ্যৎ বিতর্ক-আলোচনার বিষয়বস্তু হইবে। সে বিতর্ক-আলোচনা শুধু রাজনীতিবিদ আইনজ্ঞ নেতারাই করিবেন না; দেশের সর্বোচ্চ আদালতও তার বিচার বিবেচনা করিবেন। এই খসড়া সংবিধানেই তার বিধান করা হইয়াছে। আমাদের সুপ্রীমকোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা ও তর্কিত বিষয়ের ফয়সালা করিয়া রায় দান করিবেন। সংবিধানের ব্যবহৃত ইংরাজি শব্দসমূহের ব্যাখ্যা লইয়া বহু বই-পুস্তক রচিত হইয়াছে। দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্ট সমূহের অসংখ্য রায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন্ শব্দ কোন্ বিষয়ের কোন্ বাক্যের কোন্ জায়গায় বসিলে তার কি অর্থ হইবে এ নিয়া 'জেনারেল ক্লযেয্ এ্যাক্ট' নামক আইনের মতো বহু আইনও রচিত হইয়াছে। কোন দেশের কোনও আদালতে কোনও শব্দ লইয়া তর্ক উঠিলে এইসব রায় নজির ও বই-পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। এতে দেশ ভেদ বা কোর্ট-ভেদ নাই। ভাল ব্যাখ্যা হইলে এক দেশের আদালত সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের আদালতের রায় ও আইনের বিধান মানিয়া লইতে দ্বিধা করে না।

বাংলা ভাষা ও শব্দের এই সুবিধা নাই। বাংলা ভাষায় সংবিধান রচয়িতাদের এই সব অসুবিধার কথা বিচার করিতে হইয়াছে। নিশ্চয়ই তারা সে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলিল মুসাবিদায় যে পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন দরকার, দুর্ভাগ্যবশতঃ রচয়িতারা ততটা করেন নাই। ইংরাজিকে বাংলা করা অথবা বাংলাকে ইংরাজি করার দরুণই এই ত্রুটি ঘটিয়াছে। তা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই ধরনের ত্রুটির পয়লা দৃষ্টান্ত 'খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনাটি' ইংরাজিতে এটাকে যথারীতি 'প্রিয়ম্বল' বলা হইয়াছে। তাতে "উই দি পিপল অব বাংলাদেশ হ্যাভিং" ইত্যাদি শুরুটা নেওয়া হইয়াছে ভারতীয় সংবিধানের প্রিয়েম্বল হইতে। এর শেষ বাক্যের "ডু হিয়ার বাই এ্যাডপট, এনাক্ট এণ্ড গিভ টু আওয়ার সেলভস্ দিস্ কনস্টিটিউশন" কথা কয়টি ভারত ও পাকিস্তান উভয় সংবিধানেই আছে। এইটুকু ছাড়া আমাদের খসড়ার প্রিয়েম্বলের মিল ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের সাথেই বেশি। ভারতের প্রিয়েম্বল মাত্র একটি প্যারা। আমাদেরটা পাকিস্তানেরটার মতো অত বেশি না হইলেও চার-চারটা প্যারা। এই ধরনের লম্বা প্রিয়েম্বল শুরু করিতে হয় 'হোয়ার এ্যাস্' (যেহেতু) দিয়া। কারণ প্রিয়েম্বল এক প্যারারই হউক, আর একাধিক প্যারারই হউক, হইতে হয় তাকে একটিমাত্র বাক্য। আমাদের প্রিয়েম্বলটা একাধিক প্যারার হওয়ায় এটা পাকিস্তানের প্রিয়েম্বলের মতো 'হোয়ার এ্যাস্' দিয়া শুরু করা দরকার ছিল; কিন্তু আমাদের রচয়িতারা বিশেষ কমপ্লেক্স বশতঃ ওটা এড়াইয়া গিয়াছেন। তাতে ইংরাজি প্রিয়ম্বলে অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু বাংলা 'প্রস্তাবনায়' হইয়াছে। প্রস্তাবনাটি চারটা স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য হইয়া গিয়াছে। ওদের পরে "এতদ্বারা ইত্যাদি" উপসংহারটি একেবারেই অর্থহীন অসংগত। এ অবস্থায় হয় গোটা প্রস্তাবনাটিই ঢালিয়া সাজাইতে হইবে, নয়ত 'এত দ্বারার' আগে 'অতএব' শব্দটি বসাইতে হইবে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলি ইংরাজি বাংলা মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, বাংলাটাই ইংরাজির তর্জমা। সে তর্জমা মোটামুটি ভালই হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও নাহক "বাংলা পরিভাষা" প্রয়োগ করিতে গিয়া পাঠ দুর্বোধ্য করিয়া ফেলা হইয়াছে। বাংলা খসড়া রচয়িতারা কতকগুলি শব্দের ব্যাপারে আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাস্তববাদীর সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁরা 'কমিটি', 'রিপোর্ট', 'স্পিকার' 'ডিপুটি স্পিকার', 'লবি' ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দেই প্রচলিত, সুপরিচিত ইংরাজি রূপ রাখিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁরা দেশবাসীর ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ পাইবার অধিকারী। খসড়া সংবিধানের পাঠে রচয়িতারা এসব শব্দ রাখা সত্ত্বেও আমাদের

প্রগতিবাদী লেখক-সাংবাদিকরা, এমনকি সরকার পরিচালিত রেডিও টেলিভিশনের সংবাদ পাঠকরা 'কমিটি', 'রিপোর্ট' ও 'স্পিকারে'র জায়গায় যথাক্রমে 'সংস্থা', 'প্রতিবেদন' ও 'অধ্যক্ষ' শব্দ চালু করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'নতুন কিছু' করিবার বাতিকে এঁরা চিনা শব্দকে অচিনা, জানাকে অজানা ও সহজকে কঠিন করিতেছেন। তাছাড়া কনফিউশান সৃষ্টিরও চূড়ান্ত করিতেছেন। এরা 'স্পিকার', 'প্রিন্সিপাল', 'চেয়ারম্যান', 'হেড অব-দি-ডিপার্টমেন্ট' ইত্যাদি সকলকেই একধারসে 'অধ্যক্ষ' বলিয়া চলিয়াছেন। 'কমিটি', 'কাউন্সিল', 'এজেন্সী', 'কর্পোরেশন', 'অথরিটি' ইত্যাদি সব কিছুকেই 'সংস্থা' বলিতেছেন। এ সবের অনেকগুলিই যে আইনের বলে গঠিত, তা এঁরা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। সংবিধানের বাংলা খসড়া রচয়িতারা এইসব অবিবেচক অতি প্রগতিবাদীদের উপেক্ষা করায় এই কারণেই আমি তাঁদের মোবারকবাদ দিতেছি।

কিন্তু কোনও কোনও শব্দের বেলা খসড়া রচয়িতারা নিজেরাই পরিভাষা বাতিকের শিকার হইয়া পড়িয়াছেন। অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র দুই-চারটির কথা বলিব। এক. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের তিনটি প্রতিষ্ঠিত রূপ: এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচার ও জুডিশিয়ারি। স্মরণাতীত কাল হইতে আমরা বাংলা ভাষায় এই তিনটি বিভাগের নাম দিয়া আসিতেছি: শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আমাদের সংবিধানের বাংলা খসড়া রচয়িতারা পরের দুইটির নাম ঠিকই রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু শাসন বিভাগের নতুন নামকরণ করিয়াছেন 'নির্বাহী বিভাগ'। সুপরিচিত সদা ব্যবহৃত 'শাসন বিভাগের' নাম বদলাইয়া এঁরা অপরিচিত দুর্বোধ্য এবং সম্ভবতঃ অশুদ্ধ 'নির্বাহী' শব্দটার আমদানি করিলেন কেন বুঝা গেল না। দুই. রচয়িতারা নাহক 'ন্যায়পীঠ' শব্দের আমদানি করিয়াছেন। 'ট্রাইবিউন্যাল', 'স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল' দুইটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'বিশেষ আদালত'। বহুকাল যাবৎ আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করিতেছি। ট্রাই বিউন্যাল' অথবা 'ট্রাইবুন্যাল' দুইটি শব্দই আমাদের জনগণের কাছে সুপরিচিত। সেজন্য 'ট্রাইবুন্যাল' শব্দটাও বাংলা শব্দরূপে চালু হইয়া গিয়াছে। 'বিশেষ আদালত' ও 'ট্রাইবুন্যাল' এই দুইটা শব্দের একটা আরেকটার প্রতিশব্দরূপে আমরা বেদেরেগ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এই দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিয়া অজানা অচিনা 'ন্যায়পীঠ' শব্দের আমদানি করা হইল কেন, তারও কারণ বুঝা গেল না। সাহিত্যে, কবিতায়, বিশেষতঃ আধুনিক কবিতায় নতুন নতুন শব্দ আমদানি দোষের নয়। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি বা কবিতা রচনা আর আইন প্রণয়ন এক কথা নয়। আইন রচনায় সরল সহজ ও একার্থবোধক শব্দ প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ আইনকে সর্বদাই সহজবোধ্য হইতে হইবে। আইনের

মর্ম ও অর্থ তর্ক ও দ্ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে থাকিবে। শাসনতান্ত্রিক সংবিধান সব আইনের শ্রেষ্ঠ আইন। শুধু সাহিত্যের পাঠকের কাছে না, জনসাধারণের কাছেও তাকে সহজবোধ্য হইতে হইবে।

'ন্যায়পীঠ' শব্দটা শুধু অপরিচিত ও আইনের ভাষা হইবার অযোগ্যই নয়। আদালতের প্রতিশব্দ হইবার কোন তাৎপর্যই তার মধ্যে নাই। 'পীঠ' মানে দেবতার অধিষ্ঠানের বেদী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'বিদ্যাপীঠ' বলা হইয়াছে যে অর্থে, বিচার প্রতিষ্ঠানকে 'বিচার-পীঠ' বা 'ন্যায়পীঠ' সে অর্থে বলা চলে না। কারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় যে অর্থে, আদালতে সে অর্থে বিচার বিতরণ করা হয় না। ট্রাইবুন্যালসহ সব আদালতেই আইন প্রয়োগ করা হয় জাস্টিস এডমিনিস্টার করা হয়। তাতে আইন শিখানও হয় না, ন্যায় বিতরণ করাও হয় না। তবুও আমাদের সংবিধানের বাংলা খসড়া-রচয়িতারা যে 'ট্রাইবুন্যালের' বাংলা করিয়াছেন 'ন্যায়পীঠ' এটা তাঁরা নিয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পরিভাষার তালিকা হইতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ১৯৫০ সালে নিয়োজিত পরিভাষা কমিটি এই ধরনের বহু সংস্কৃত শব্দ ইংরেজি শব্দের বদলে ব্যবহার করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদরা তার মধ্যে বহু বাদখাস দিয়া এই তালিকাটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই তালিকার বহু শব্দই আজো কাগজে কলমে তালিকাভুক্তই আছে। পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক কবি সাংবাদিকরা তাঁদের ইচ্ছা ও সুবিধামত ঐ সব শব্দের কোন কোনওটা নিজ নিজ রচনায় প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতেছেন। করিতে তাঁরা থাকুন। লিখিতে লিখিতে ও পড়িতে পড়িতে ঐ সব শব্দের যেটা যখন যে পরিমাণ জনপ্রিয় হইবে সেটা সেই পরিমাণ চালু হইবে। বাংলাদেশের লেখক সাহিত্যিকরাও তা করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সব অজানা অপরিচিত শব্দকে আমাদের জাতীয় দলিল শাসনতান্ত্রিক সংবিধানে প্রয়োগ করিয়া আমাদের দেশে ঐ সব শব্দ বাধ্যতামূলক জনপ্রিয় করিবার এই কঠিন দায়িত্ব কেন আমরা মাথায় লইব, তার কোনও কারণ সংবিধান রচয়িতারা দেখাইতে পারেন কি?

তিন. 'ন্যায়পীঠ' সম্বন্ধে যে কথা, 'অভিসংশন', 'অধ্যাদেশ' ইত্যাদি সম্বন্ধেও সেই কথা। এ দুইটিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষার তালিকায় আছে। পশ্চিম বাংলার যথাস্থানেও সচরাচর তাদের ব্যবহার নাই। অধ্যাদেশ শব্দটা শুধু অপরিচিত নয়, শ্রুতি-কটু ও দুরুচ্চারও বটে। শব্দটি 'অর্ডিন্যান্সের' পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইংরেজি রিকুইযিশনকে 'হুকুম দখল' ও অর্ডিন্যান্সকে 'হুকুম আইন' বলিয়া আমরা

সাহিত্যে, সংবাদপত্রে ও আইন আদালতে বহুকাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। 'অধ্যাদেশ' শব্দটা কোনও কালে ব্যবহার করি নাই। এই শব্দটা এখানে অপপ্রয়োগ এই জন্য যে, এই শব্দে আইনবোধক কোন তাৎপর্য বা ইঙ্গিত নাই অথচ অর্ডিন্যান্স অর্থ এক প্রকারের আইন। 'অধ্যাদেশ' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'কর্তার আদেশ'। বিদ্রুপাত্মক অর্থে এর ব্যবহার চলে। আইনের অর্থে নয়।

চার. খসড়া রচয়িতারা আরেকটি ভুল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এটা অবশ্য তাঁদের একার দোষ না। অনেকেই এই ভুল করিয়া থাকেন। সোশিয়ালিযমের বাংলা করিয়াছেন তাঁরা 'সমাজতন্ত্র'। শুদ্ধরূপ হইবে সমাজবাদ। ইংরাজি 'ইযম' শব্দের বাংলা 'বাদ', 'তন্ত্র' নয়। যথা ঃ 'ন্যাশনালিযম' জাতীয়তাবাদ, 'ক্যাপিটালিযম' পুঁজিবাদ, 'আইডিয়ালিযম' আদর্শবাদ, 'কমিউনিযম' সাম্যবাদ ইত্যাদি ঃ এর একটাও 'তন্ত্র' নয়। ইংরাজি 'ক্র্যাসি' শব্দের বাংলা 'তন্ত্র'। যথা ডেমোক্র্যাসি, বুরোক্র্যাসি, অটক্র্যাসি, প্লুটোক্র্যাসি যথাক্রমে গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ধনীতন্ত্র।

পাঁচ. এমনি ধরনের আরও অনেক বিভ্রান্তিকর শব্দ খসড়ায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন, 'অডিটর জেনারেলকে' মহা হিসাব নিরীক্ষক' বলা হইয়াছে। 'নিরীক্ষক' শব্দটা অচিনা ও এখানে অপপ্রয়োগ। 'একাউন্ট্যান্টকে হিসাবনবিস বা হিসাবরক্ষক ও 'অডিটরকে' হিসাব পরীক্ষক বলা বহুদিন প্রচলিত আছে। তাছাড়া নিরীক্ষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজ।

এসবের সংশোধন অবশ্যই করিতে হইবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ বিতর্কের মীমাংসায় আদালত রায় দিতে বাধ্য হইবেন; এ সংবিধান 'আনওয়ার্কেবল'।

২০শে অক্টোবর '৭২

সংবিধানে আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষিত হউক

গত শুক্রবারের প্রবন্ধে আমি সংবিধানের বাংলা মুসাবিদার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধে আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম যে ধারাসমূহ সম্বন্ধে আমি আগামী শুক্রবারে আলোচনা করিব। আমি আশা করিয়াছিলাম, সরকার-পক্ষ পরিষদ-কক্ষে আলোচনা বিস্তারিত ও দীর্ঘায়িত করিবেন। কিন্তু ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে, আমার আশা পূর্ণ না-ও হইতে পারে। সে কারণে আগামী শুক্রবার আমার আলোচনা, পোস্ট-মর্টেম ও নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে। আমার আলোচনার আলোক না পাইলেই সরকার পক্ষ ও মেম্বররা পথ দেখিবেন না, এমন বড়াই আমি করিতেছি না। শুধু নিজের সান্ত্বনার জন্যই পরিষদের আলোচনা শেষ হইবার আগেই আমার কথাগুলি বলিয়া রাখা উচিত। তাই আগামী শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আজই সংবিধানের কতিপয় ধারা সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। একটি প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভব নয়। তাই আমার বিবেচনায় যেগুলি খুবই জরুরী, শুধু সেই কথা কয়টি বলিয়া রাখিতেছি। সময় পাইলে অন্যান্য কথা পরে বলা যাইবে।

ধারাসমূহের তিনটি বিধান সম্পর্কে আমি আমার মত সংবিধানের মুসাবিদার বাহির হইবার আগেই বলিয়াছি। ওসব বিষয়ে পুনরুক্তির আর দরকার নাই। ঐ তিনটি বিষয়ের একটি আমাদের দেশের রাষ্ট্র-নাম, দ্বিতীয়টি নির্বাচন-প্রার্থীর বয়স সীমা, তৃতীয়টি শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার। আমি পৃথক তিনটি প্রবন্ধে আরয করিয়াছি, আমাদের রাষ্ট্রনামের বিশেষণরূপে 'পিপলস' শব্দ থাকার দরকার নাই, ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম থাকিবে, তাঁরা সকলেই নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন; শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলিয়া সংবিধানে উল্লেখ করিতে হইবে। এই তিনটি বিষয়ে আগে যে সব যুক্তি দিয়াছি, আমার বিবেচনায় তাই যথেষ্ট। ঐ সব যুক্তির বলেই আমি এই প্রবন্ধে ঐ সব দাবির পুনরুক্তি করিতেছি।

আর যে সব বিষয়ে আমার বিবেচনায় সংশোধন দরকার, নিম্নে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করিতেছি। প্রথমেই আরয করিব, সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ওলট-পালট করা দরকার। মানে, তৃতীয়টি- দ্বিতীয় ভাগ ও দ্বিতীয়টি তৃতীয়ভাগ হইবে এবং তদনুসারে অনুচ্ছেদগুলি রি-নাম্বারিং হইবে। যুক্তি খুব সাধারণ। 'রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি' ও 'মৌলিক অধিকার' এই দুইটি বিষয়বস্তুর মধ্যে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ সংবিধানে আগে হওয়া দরকার। বিষয়বস্তুটির নিজস্ব গুণ ছাড়াও আরেক কারণে এটির

আগে আসা দরকার। মুসাবিদা মতেই 'মৌলিক অধিকার' সমূহ আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। ফলে একটা নাগরিকদের অধিকার, অপরটা রাষ্ট্রের সদিচ্ছা। অধিকারের স্থানীয়মান 'সদিচ্ছার' আগে, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে, আশা করি এ কথা কেউ বলিবেন না।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ধারাগুলির উপর সাধারণভাবে এই মন্তব্য করা চলে যে, কথাগুলি ঘুরাইয়া-প্যাচাইয়া বলা হইয়াছে এবং অধিকারগুলির বেশির ভাগ নানাপ্রকার শর্তে কণ্টকিত করা হইয়াছে। যে সব অধিকার শর্তহীনভাবে স্বীকার করা হইয়াছে, সেগুলিও সোজাসুজি সহজ কথায় বলা হয় নাই। সোভিয়েট ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের সংবিধানে যেখানে বলা হইয়াছে; 'ফ্রিডাম্-অব-স্পীচ' 'ফ্রিডম-অব-প্রেস' ইত্যাদি 'গ্যারান্টি'ড, আমাদের মুসাবিদায় সেখানে লম্বা লম্বা বাক্য প্রয়োগ করিয়া ঘাড়ের পিছন দিয়া হাত ঘুরাইয়া কাজটি করা হইয়াছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার চার্টারে যে সব অধিকার সহজ কথায় স্বীকার করা হইয়াছে, সে সব স্বীকার করিতেও যেন আমাদের মুসাবিদাকাররা কৃপণতা করিয়াছেন। এসব ভাষিক ত্রুটি সংশোধন করিয়া নতুন মুসাবিদা করিতে হইবে, এমন কথা আমি বলিতেছি না। তবুও এসব ত্রুটির কথা বলিতেছি এই জন্য যে, স্বীকৃতির ভাষা হইতেই স্বীকারকারীর মনোভাব বুঝা যায়। ভাষা শুনিয়া মনে হয় মুসাবিদাকারীদের মতে এসব মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র নাগরিকদিগকে দান করিতেছে। অথবা সংবিধান নাগরিকদের জন্য এসব অধিকার সৃষ্টি করিতেছে। এর একটাও সত্য নয়। 'মানবাধিকার' কেউ কাউকে দানও করে না, সৃষ্টিও করে না। 'ন্যাচারেল জাস্টিসের' মতই ফাণ্ডামেন্টাল রাইটসও খোদায়ী ইনসাফ ও খোদায়ী হক। এগুলি আইনে লিপিবদ্ধ থাকিবার দরকার নাই। কারণ আইন ও সংবিধানের ধারায় লেখা না থাকিলেও এ সব খোদার দেওয়া অধিকার মানুষের আছেই। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মত এই যে, সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকার কোনও দরকার নাই। কারণ ওগুলি মানুষের ব্যার্থ রাইট। কিন্তু যদি কোনও সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকে তবে সেগুলি বিধি-নিষেধের দ্বারা ক্ষুণ্ন করা যাইবে না। মনে হয়, আমাদের সংবিধান রচয়িতারা মৌলিকাধিকার সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভুল ধারণা পোষণ করেন। তাই ও-সবের স্বীকৃতিতে এত কৃপণতা করিয়াছেন। যেন নিজের পকেটের পয়সা কাউকে দান করিতেছেন। তাই তাঁরা অতসব শর্ত জুড়িয়া দিতে পারিয়াছেন।

আসলে মানবাধিকার যাঁরা অস্বীকার করেন বা শর্তাধীনে স্বীকার করেন, তাঁরা গণতন্ত্রই অস্বীকার করেন। মৌলিক অধিকার গণতন্ত্রের রক্ষক এবং গণতন্ত্র মৌলিক অধিকারের রক্ষক। এই কথাটাই অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে জাতিসংঘের মানবাধিকার চার্টারের প্রিয়েম্বলে। তাতে বলা হইয়াছে; 'মানুষের মৌলিক অধিকারের অস্বীকৃতি ও অবমাননাই দুনিয়ার সকল বর্বরতার জন্য দায়ী। পীড়ন ও যুলুমের বিরুদ্ধে শেষ হাতিয়ার রুখে মানুষ যাহাতে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য না হয়, সেই জন্যই আইনের

শাসনের মানবাধিকার রক্ষা হওয়া দরকার। এই এক কথায় লাখ কথা বলা হইয়া গিয়াছে। যে রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি আছে, সে রাষ্ট্রে বিদ্রোহ-বিপ্লব নাই। পক্ষান্তরে, যেখানে মৌলিক অধিকার অস্বীকৃত অথবা কণ্টকিত, সেখানকার শাসকদেরও শয্যা কণ্টকাকীর্ণ। বিপ্লব-বিদ্রোহ ছাড়া সেখানকার নাগরিকদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নাই। গণতন্ত্রীরা এই কারণেই নিষ্কণ্টক মানবাধিকারের স্বীকৃতি চায়। বিপ্লবের হেতু ও সম্ভাবনা তারা চিরতরে দূর করিতে চায়। অপরদিকে, সংবিধানে মৌলিক অধিকার যত কণ্টকিত থাকে, বিপ্লবীদের তত সুবিধা হয়।

এই সাধারণ কথাটা মনে রাখিয়া আওয়ামী লীগ নেতারাই বিচার করুন, সংবিধানের মুসাবিদায় গণতন্ত্রের প্রতি, আরও সোজা কথায়, জনগণের প্রতি আস্থা দেখান হইয়াছে কি না। যে বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আওয়ামী লীগ জীবনভর সংগ্রাম করিলেন, তাঁরাই ক্ষমতায় বসিয়া 'ইন দি ইন্টারেস্ট অব দি সিকিউরিটি অব দি স্টেট, ডিসেনসি, মরালিটি ও পাবলিক অর্ডারের' দোহাই দিয়া সেই মৌলিক স্বাধীনতাকে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার বিধান রচনায় হাত দিলেন? জনমতের উপর আস্থা রাখিতে পারিলেন না? আইউব-ইয়াহিয়া প্রভৃতি স্বৈরাচারীও ত এই যুক্তিতেই 'প্রেস ও পাবলিকেশন' অর্ডিন্যান্স করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁদের সংবিধানের 'ফ্রিডাম-অব স্পিচে'র মৌলিক অধিকারটা আমাদের মুসাবিদার মতই 'সাবজেক্ট টু রিযনেবল রেস্ট্রিকশন' করা হইয়াছিল। আমাদের সংবিধান তবে তাঁদেরটার চেয়ে কোন দিকে অধিকতর গণতান্ত্রিক হইল? বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারেই আমাদের সংবিধান রচয়িতারা আইউবের অনুকরণ-অনুসরণ করেন নাই। ধর্মের ব্যাপারেও তাই করিয়াছেন। আমাদের মুসাবিদার ৪১ ধারার (১) উপধারাটি আইউবী সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ১০ ধারার হুবহু কপি। আর আমাদের ৪১ ধারায় (২) উপ-ধারাটি আইউবী সংবিধানের ১২ ধারায় (১) উপ-ধারার হুবহু নকল। প্রথমটিতে বলা হইয়াছে, সরকার প্রণীত আইন, মরালিটি ও জনশৃংখলার নিয়ন্ত্রণে আমাদের ধর্ম মানিতে, পালিতে, প্রচার করিতে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চালাইতে হইবে। দ্বিতীয়টিতে বলা হইয়াছে, কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের শিক্ষা গ্রহণে ও উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য থাকিবে না। এর সাদা অর্থ এই যে, নিজের ধর্ম হইলে তারা বাধ্য থাকিবে। এই দুইটি বিধানই আইউবী সংবিধান হইতে নেওয়া হইয়াছে। অথচ আইউবেরটা 'ইসলামী' রাষ্ট্র, আর আমাদেরটা ধর্ম-নিরপেক্ষ। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনও ধর্ম সম্পর্কে আইন করিবার অধিকার পার্লামেন্টের আছে কিনা, সংবিধান রচয়িতারা তা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

এ অবস্থায় এবং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমার সবিনয় আরজ এই যে, 'মৌলিক অধিকার' ভাগের ৩৫ ধারার (৩) উপাধারাটি সম্পূর্ণ বিলোপ করা হউক। কোনও অবস্থাতেই বিচার গোপনে হইতে পারিবে না। হওয়া সম্ভবও নয়। উকিল

নিয়োগের অধিকার থাকিলে গোপন বিচার হইতে পারে না। আর উকিল ছাড়া কোন বিচারও হইতে পারে না। দেশের স্বার্থে তেমন কোনও বিশেষ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে পার্লামেন্ট তা বিবেচনা করিবে। তারপর উক্ত ভাগের ৩৭ ও ৩৮ ধারার সভা-সমিতি করার অধিকার নিরঙ্কুশ করিতে হইবে। ৩৭ ধারার 'মিটিং' শব্দের পরে ডিমনস্ট্রেশন (বাংলায় বিক্ষোভ) কথা যোগ করিতে হইবে। ৩৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করিয়া তাকে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প-শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। এই ধারায় সরকারী সংশোধনী করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের নামের অসদ্ব্যবহারের উপর যে নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে, সংবিধানের ধারা হিসাবে এটা নিষ্প্রয়োজন। পার্লামেন্ট আইন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে। নির্বাচনী আইনে ধর্মের নাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারকে ফৌজদারি আইনে দণ্ডনীয় করিয়া এটা করা যাইবে। রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতার খাতিরে ৪১ ধারাটি সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইবে। ৩৯ ধারার (১) ধারায় চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার যে গ্যারান্টি দেওয়া হইয়াছে, তার সঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটি যোগ করিলেই চলিবে। ৩৯ ধারার (২) উপধারায় বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর যে শর্ত আরোপ করা হইয়াছে, তা সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইবে। এইরূপ সংশোধন করিলেই আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মৌলিক অধিকার মোটামুটি ত্রুটিমুক্ত হইয়া যাইবে।

তারপর আসা যাক চতুর্থ ভাগে। এই ভাগের বাংলায় শিরোনামা 'নির্বাহী বিভাগের' স্থলে 'শাসন বিভাগ' রাখিবার সুপারিশ আগেই করিয়াছি। এরপর থাকিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতির কথা। আমার বিবেচনায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য একটি ক্ষুদ্র আকারের নির্বাচকমণ্ডলী (ইলেকটরাল কলেজ) হওয়া দরকার। 'ইত্তেফাকে'র ২রা কার্তিকের সম্পাদকীয়তে পার্লামেন্টের মেম্বরদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে আপত্তি করা হইয়াছে, আমি তা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। পার্লামেন্টের মেম্বররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিলে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রীর মতো তিনিও মেজরিটি পার্টির অর্থাৎ রুলিং পার্টির লোক হইবেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে গোটা জাতির দলমত-শ্রেণী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক মতের তিনি প্রতিভূ ও রক্ষক বিবেচিত হইবেন না। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে ইংলণ্ডের রাজার মতো রাজনীতির উর্ধ্বে ও মেজরিটি পার্টির প্রভাবমুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁকে সকল দলের মাঝে পজিশন ও অপজিশন উভয়ের আস্থাভাজন হইতে হইবে। ভারতে এ বিষয়ে যে বিধান করা হইয়াছে, আমাদের সে সুবিধা নাই। আমাদের কোন প্রদেশও নাই, তার আইন পরিষদও নাই। কাজেই আমাদিগকে পার্লামেন্টের ভিতর-বাহির লইয়া একটি ইলেকটরাল কলেজের ফন্দি আবিষ্কার করিতে হইবে। এই ইলেকটরাল কলেজ গঠনের অনেক উপায় আছে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ তা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় দেশের সকল জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল

কর্পোরেশন গঠিত হইলে তার মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও অল্ডারমেনগণ, হাইকোর্ট বার ও জিলা বারসমূহের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারিগণ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক সমিতি, মাধ্যমিক ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সমিতিসমূহের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারী, শিল্প-বাণিজ্য চেম্বারের প্রেসিডেন্ট- সেক্রেটারীগণকে লইয়া একটি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকটরাল কলেজ গঠিত হইলে খুব ভাল হয়। এঁদের সকলকে লইয়া মোট ভোটার সংখ্যা তিন শ'র বেশি হইবে না। পার্লামেন্টের মেম্বর থাকিবেন তিন শ' পনর অথবা বিশ। একুনে ছয় সাত শ' ভোটারের নির্বাচকমণ্ডলী একদিকে আদর্শ আইনেরও হইবে। অন্যদিকে গোটা দেশের সকল মতের লোকের প্রতিনিধিত্বমূলকও হইবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনও দলীয় নমিনেশন বা পার্টি হুইপ থাকিতে পারিবে না। পার্লামেন্টের মেম্বররাও যাঁর তাঁর এলাকার জিলা বা মহকুমার নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট দিবেন। প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থীরাও কোন ক্যানভাস করিবেন না। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীরা কিংবা লীডার অব দি অপজিশনও কোনপ্রকার ক্যানভাস করিবেন না। ৪৮ ধারায় 'সংসদ-সদস্যগণের' স্থলে একটি 'ইলেকটরাল কলেজ' বসাইতে হইবে এবং দ্বিতীয় তফসিলে উপরে বর্ণিত নির্বাচন-বিধি লিখিতে হইবে।

'প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা' পরিচ্ছেদে ইংরাজি 'ফ্রম টাইম টু টাইমের' বাংলা 'সময়ে সময়ে' ঠিক হয় নাই। তার বদলে 'যখন যেরূপ' বসাইয়া বাক্যটি পুনর্নির্মাণ করিতে হইবে। ৫৭ ধারায় (২) উপধারায় 'কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ইত্যাদি' বাদ দিতে হইবে। তার বদলে "অপজিশন লীডার অথবা তাঁর সুপারিশে অপরকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাইবেন" বসাইতে হইবে। পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুন নির্বাচনের সুপারিশ করিবার অধিকার নিশ্চয়ই থাকিবে একমাত্র প্রধানমন্ত্রিরই, কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের আস্থা হারাইয়াছেন, পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ দিবার তাঁর কোনও অধিকার থাকিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে, পার্লামেন্টেরই প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্ট নয়। একাধিক কারণে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের আস্থা হারাইতে পারেন। তার মধ্যে একটা এও হইতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের পার্টিরই আস্থা হারাইয়াছেন। মেজরিটি পার্টির নিজেদের নেতা, মানে প্রধানমন্ত্রী বদলাইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আলোচ্য বিধানে মেজরিটি পার্টির এই গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হইয়াছে। পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিবার হুমকি দিয়া যে কোনও অজনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নিজের গদি ঠিক রাখিতে পারিবেন। আর প্রধানমন্ত্রীর পার্টিই যদি পার্লামেন্টের আস্থা হারায় তার মানে মাইনরিটি হইয়া যায়, তবে ত তিনি প্রধানমন্ত্রীই থাকিতে পারেন না। মাইনরিটি পার্টির সুপারিশে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিলে অলটারনেটিভ পার্লামেন্ট গঠনের সম্ভাবনা দূর হইবে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র অসম্ভব হইবে।

পঞ্চম ভাগের শিরোনাম 'আইনসভার' বদলে আইন বিভাগ হইবে; এ কথার সমর্থনে যুক্তি আমি আগের প্রবন্ধেই দিয়াছি। এই ভাগে ৬৬ ধারার (১) উপ-ধারায়

'বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে' কথা কয়টির স্থলে 'তাঁহার নাম ভোটার তালিকায় থাকিলে' কথা কয়টি বসাইতে হইবে। ভোটার মাত্রেরই ভোট চাহিবার মানে নির্বাচন-প্রার্থী হইবার অধিকার থাকিবে। এ অধিকার অলঙ্ঘনীয়। এর যুক্তি আমি আলাদা প্রবন্ধে দিয়াছি। এই ভাগের ৭০ ধারার বিধানটি অবৈধ, অগণতান্ত্রিক ও বিপজ্জনক। এতে দল বহিষ্কৃত সদস্যের মেম্বরগিরি ও খতম হওয়ার বিধি করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা নির্বাচনের পরে মেম্বরদের দল ত্যাগের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যটি ভাল কিন্তু পন্থাটি খারাপ। এই ধারার বিরুদ্ধে মুসাবিদা কমিটির কয়েকজন মেম্বর মতানৈক্য নোট দিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে জনাব আবদুল মুনতাকিম চৌধুরীর নোটটি খুবই যুক্তিপূর্ণ ও মূল্যবান। আমি তাঁর সাথে একমত। সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়াও পার্লামেন্ট যে এ বিষয়ে আইন করিতে পারেন, এ বিষয়েও আমি তার মত সমর্থন করি। আলোচ্য ধারার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, ভোটারদের অধিকার ও ক্ষমতা অন্য কেউই প্রয়োগ করিতে পারেন না। 'ক্রসিং দি ফ্লোর' বা দল ত্যাগ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বিকাশের খুব বড় প্রতিবন্ধক। এটা রোধের জন্য আইন হওয়া দরকার। সংবিধানের বাইরেও পার্লামেন্ট তেমন আইন করিতে পারে। সংবিধানের ভিতরে বা বাইরে যেখানেই বিধান করা হউক, মেম্বরগিরিটা বাতিল করাইতে হইবে ভোটারদের দিয়াই। মনোনয়নদাতা দল আসলে সুপারিশকারী মাত্র। তাঁদের সুপারিশেই মেম্বর ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এটা মানিয়া লইলেও তাঁরা ভোটারদের নির্বাচন বাতিল করিতে পারেন না। কারও সুপারিশে কেউ চাকুরী পাইলেও চাকুরীয়াকে বরখাস্ত করিবার মালিক চাকুরীদাতাই, সুপারিশকারী নন। এটা আইন ও ন্যায়ের দিক। রাজনীতিক পরিণামের দিক হইতে এই ব্যবস্থা একাধিক কারণে বিপজ্জনক।

আওয়ামী-নেতৃত্ব কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। সাধারণ অবস্থায় অমন কোনও মেম্বরকে দল হইতে বহিষ্কার করিয়া তাঁকে প্রকাশ্যভাবে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেই অনেক ক্ষেত্রে কাজ হইয়া যাইবে। যাঁরা দিবেন না, তাদের সম্বন্ধে নির্বাচকমণ্ডলীর অনাস্থা বা 'রিকলের' বিধান করিলেই চলিবে।

বিচার বিভাগীয় বিধানের মধ্যে স্বতন্ত্র হাইকোর্ট না রাখার ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটি। একই সুপ্রীম কোর্টের এলাকাধীন ও শাসনাধীন হাইকোর্ট বিভাগ নামে একটি বিভাগের বিধান করিয়া হাইকোর্টের মর্যাদা, এলাকা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে। এই বিধানের বদলে যদি চারটি বিভাগে চারটি হাইকোর্ট স্থাপিত হয়, ঐ সব হাইকোর্ট যদি ঐ বিভাগের জজকোর্ট গুলির আপিল-আদালত হয় এবং সুপ্রীম কোর্ট যদি সব হাইকোর্টের আপিল-আদালত এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা আদালত হয়, তবে বিচারের স্বাধীনতা পক্ষগণের সুবিধা, মামলা নিষ্পত্তিতে অযথা বিলম্ব না হওয়া ইত্যাদি সকল ব্যাপারে দেশবাসীর উপকার হইবে। সংবিধান রচয়িতারা কথাটা ভাবিয়া দেখুন।

১০২ ধারায় সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের রীট এলাকা সুস্পষ্ট ও নিরংকুশ করা হয় নাই। রীট এলাকার হ্যাবিয়াস কর্পাস, ম্যানডেমাস, প্রহিবিশন, সার্টিওয়ারি ও কোওওয়ারেন্টোর বিধিগুলি সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত শব্দগুলি বিশেষ অর্থজ্ঞাপক। এগুলির অনুবাদ ইংরাজি বা অন্য কোনও ভাষায় হয় নাই। যুক্তি-যুক্ত কারণেই হয় নাই। বাংলা মুসাবিদায় বিধিগুলির ভাবার্থ প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে। ইংরাজি মুসাবিদায় ভাব প্রকাশ পাইলেও ঐ সুপ্রচলিত টার্মগুলি ব্যবহার করা হয় নাই কেন, বুঝা গেল না।

সবচেয়ে গোলমাল বাধাইয়াছে ১০২ ধারার (৩) উপধারায়। এই উপধারায় 'এই সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদের (২ দফার' উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি অনেক খোঁজ-তালাশ করিয়াও ৪২ অনুচ্ছেদের (ধারার) কোনও (২) দফা বা উপধারা পাইলাম না। ৪২ অনুচ্ছেদে কোনও উপধারা মোটেই নাই। এটা নিশ্চয়ই ছাপার ভুল।

১৫৩ ধারায় 'সংবিধান প্রবর্তনের' কোনও নির্দিষ্ট তারিখ না থাকায় ১৫০ ধারার অধীনে প্রণীত চতুর্থ তফসিলের 'ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী' বিপজ্জনকরূপে অর্থহীন ও অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কিভাবে কখন সংবিধান প্রবর্তিত হইবে, কোথাও তার উল্লেখ নাই। কাজেই সংবিধান প্রবর্তনের পরে পরেই গণ-পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে এবং তারপর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইবে, এসব কথাই অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ যদি ১৫৩ ধারায় বিধান থাকিত যে, 'যেদিন প্রেসিডেন্ট গণপরিষদে গৃহীত সংবিধান বিলে অনুমোদনের দস্তখত দিবেন, সেইদিনই এই সংবিধান প্রবর্তন হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে' তবে চতুর্থ তফসিলের সব বিধানই অর্থপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট হইয়া যাইত। বর্তমান সরকার ও আওয়ামী লীগ-নেতৃত্ব নির্বাচন দিতে ঢিলামিছি করিবেন, এমন সন্দেহ ও অভিযোগ কেউ করিবেন না। কিন্তু কখন কি হয়, কওয়া যায় না।

সংবিধানটি ত্রুটিমুক্ত ও জনগণের গ্রহণযোগ্য হউক, আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য ও সুনাম রক্ষিত হউক, আমাদের বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্থায়ী হউক, এই আন্তরিক ইচ্ছা লইয়াই উপরের সংশোধনগুলির সুপারিশ করিলাম।

২২শে অক্টোবর, '৭২

সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবন-দর্শন গণতন্ত্রীর পথের দিশারী

আজ জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নবম মৃত্যুবার্ষিকী। স্বাধীন বাংলাদেশে আজই প্রথম আমরা এই মহান নেতার স্মৃতিবার্ষিকী পালন করিতেছি। এ সম্বন্ধে লিখিতে শুরু করিয়াই যে কথাটা আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়িতেছে তা এই- 'ইত্তেফাক' এই নেতার মৃত্যু উপলক্ষে প্রথম যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাতে 'আমরা যে মহান নেতা হারাইলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম; "শহীদ সাহেবের রাজনীতিক জীবন শুরু হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে। তাঁর রাজনীতিও রহিয়াছে মোটামুটি ঐ একই খাতে। জীবনে যাদের মধ্যে এত মিল ছিল, জাতির জন্য তাদের জীবনের তাৎপর্য বা 'মর‍্যালও' একই রকম হওয়ার কথা। দেশবন্ধু হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ফরমুলা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ভারতীয় কংগ্রেস মানে নাই বলিয়াই ভারত ভাগ হইয়াছে। শহীদ সাহেবের পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্য ফরমুলা সার্বিক প্যারিটি পাকিস্তানের নেতারা মানেন নাই বলিয়া পাকিস্তানও ভাগ হইতে পারে, এটাই আমার আশঙ্কা।"

আট বছর পার হইবার আগেই আমার সে আশঙ্কা সত্য হইয়াছে। পাকিস্তানের ও ঐক্য ভাঙ্গাটা আশঙ্কাই বটে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়াটা আশঙ্কার ব্যাপার নয়, আশার ব্যাপার। দুনিয়ায় এমন অনেক বিষয়েই আশঙ্কার মধ্যে আশা, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লুকাইয়া থাকে। জীবনের সবচেয়ে বড় আশা যে বেহেশতে যাইবার বাসনা তাও লুকাইয়া থাকে মৃত্যুর আশঙ্কার মধ্যেই।

কাজেই শহীদ সাহেবের উপদেশ না মানায় পাকিস্তানের লোকসান হইয়াছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশের লাভ হইয়াছে। এই দেখিয়া কেউ যদি মনে করিয়া বসেন, অন্যান্য ব্যাপারেও সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের উপদেশ অমান্য করিলে লাভ হইতে পারে তবে সেটা ভুল হইবে। তবু আজকালের তরুণেরা সবাই সেটাকে ভুল স্বীকার করিবেন, এটা আমি আশা করি না। পাকিস্তান আন্দোলনকে 'একটা পশ্চাদমুখী রাজনৈতিক আন্দোলন' আখ্যা দিয়া তা সমর্থনের অপরাধে বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের নিন্দা করিবার যোগ্য 'অগ্রমুখী' বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শহীদ সাহেবের আজকের স্মৃতি দিবসে এঁদের কেউ যদি তাঁর তারিফ করিয়াও ফেলেন, তবে সেটা করিবেন তাঁরা শহীদ সাহেবকে 'বুদ্ধিজীবী' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না বলিয়াই। একটা জাতির পঞ্চাশ বছরের মরা-বাঁচার আন্দোলনকে 'পশ্চাদমুখী আন্দোলন' আখ্যা দিয়া তার গোটা নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনীকে কণ্ডেম করিবার মতো স্পষ্টবাদী তরুণ বুদ্ধিজীবীর জন্ম যে কোনও জাতির গর্বের বিষয়। তথাপি এখন তরুণ বুদ্ধিজীবীর কাছে শহীদ সাহেবের রাজনীতিক জীবন-দর্শন ও নীতিমালা কোনও মর্যাদা পাইবে, এটা

আশা করিয়া আমি শহীদ সাহেবের জীবনী আলোচনা করিতেছি না। শহীদ সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা, এই হিসাবেই তাঁর যুগোত্তীর্ণ গুণাবলী ছিল এবং তা আজও আমাদের পালনীয়, এটা যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছেই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী স্মৃতি-দিবস উদযাপনের অর্থ আছে। আমার আরজও তাঁদের খেদমতেই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের সাথে সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের সাদৃশ্যের কথাই বলিতেছিলাম। সে কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাক।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সোহ্‌রাওয়ার্দী উভয়েই নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন, উভয়েই জনগণের সার্বভৌমত্বে আস্থাবান ছিলেন এবং উভয়েই জনগণের অধিকার আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া উভয়ের যে গুণটি, উভয়ের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তা এই যে উভয়ের রাজনীতিতেই ন্যায়নীতি, ধর্মীয় মনোভাব, ঈমানদারি, এথিকস ও মর‍্যালিটি মিশ্রিত ছিল। তাঁরা ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করিতেন না, ওটাকে তাঁরা অসদাচরণ বলিতেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শহীদ সাহেব ঢাকায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন: "আমি এমন রাজনীতিতে বিশ্বাসী যাতে ষড়যন্ত্রের স্থান নাই। জীবনে কোনও দিন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করি নাই। ভবিষ্যতেও করিব না। আমি এমন রাজনীতি করিতে চাই যাতে আমার মৃত্যুর পর দেশবাসী বলিতে পারিবে, সোহ্‌রাওয়ার্দী এমন একজন লোক ছিলেন যিনি বিনা ষড়যন্ত্রে ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন। বিনা ষড়যন্ত্রেই জনগণের খেদমত করিয়াছিলেন।"

তাঁর কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র করেন নাই। এ বিষয়ে তিনি এমন শিশুর মতো সরল ছিলেন যে, কেউ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এ কথা বলিলে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেন: 'আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করি নাই। তিনি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে যাইবেন কেন?' আমার ব্যক্তিগত জ্ঞাত মতেই এমন ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে।

ভাল মানুষের বরাতে যা ঘটে, সোহ্‌রাওয়ার্দীর বরাতে তাই ঘটিয়াছিল। তিনি কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন নাই বটে, কিন্তু জাতষড়যন্ত্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে দ্বিধা করেন নাই। বস্তুতঃ অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকিয়াও যে বিভক্ত পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন নাই অথবা মেজরিটি মেম্বর পক্ষে থাকা সত্ত্বেও যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব রাখিতে পারেন নাই, তা ছিল এমন ষড়যন্ত্রেরই ফল। তাঁর সমর্থকদের কেউ কেউ তাঁকে এ ষড়যন্ত্রের আভাস-ইঙ্গিত দিলে তিনি হাসিয়া এবং পরে ধমক দিয়া উড়াইয়া দিতেন। পূর্ব বাংলার মন্ত্রিত্বের বেলা দিল্লী হইতে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতেছে, একথা তিনি কানেই তুলিতেন না। তিনি বলিতেন এর কোনও 'কারণ' নাই। 'কারণ' ছাড়া কেউ কিছু করিতে পারেন, এটা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বিনা 'কারণে'ও যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে পারেন, তাঁকে পরাজিত করাও যে একটি 'কারণ'

হইতে পারে, পরে অভিজ্ঞতার দ্বারা তাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। তবু তিনি সাবধান হন নাই। প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রকে তিনি 'এক্সেপশন' বলিতেন। এই এক্সেপশনের দ্বারা তিনি এতবার একই ধরনের ঠকিয়াছিলেন যে, আমি উত্যক্ত হইয়া একদিন তাঁকে বলিয়াছিলাম: 'খোদার হাজার শোকর, আপনার বিবি নাই।' বিস্ময়ে কপালে চোখ তুলিয়া তিনি বলিলেন: 'তার মানে কি?' আমি হাসিয়া বলিলাম: 'যদি থাকিতেন তবে তাঁর অনেকবার তালাক হইয়া যাইত। হাদিস শরীফে আছে একই ধরনের কোনও মুসলমান তিনবার ঠকিলে তাঁর বিবি তালাক হইয়া যায়।' হাদিসটি সহি কি যইফ, সে কথা অবশ্য বলিতে পারিলাম না। তবে ওতে যে প্রচুর অম্লরস ও মূল্যবান উপদেশ রহিয়াছে, সে বিষয়ে উভয়ে একমত হইলাম। শহীদ সাহেব প্রথমে ছাত-ফাটা উচ্চ হাসি হাসিলেন। পরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন: 'জীবনে শুধু জিতিলেই চলে না, হারিতেও হয়। জান, মহত্ত্বের জিতের চেয়ে হারই বেশি। তবে সব হারই হার নয়, আর সব জিতই জিত নয়।'

কথাটা শুনিতে ছোট হইলেও আসলে কিন্তু খুব বড়। ওটাই ছিল শহীদ সাহেবের জীবন দর্শনের ইঙ্গিত। তিনি তাঁর সবগুলি হারকে হার মনে করিতেন না। হার-জিতটা আসলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনের অবস্থামাত্র। যাঁরা সত্যকে বাঁচাইবার, মানে জিতাইবার জন্য নিজেরা হারিয়া যান তাঁরাই কেবল নিজের পরাজয় সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রতিযোগিতা যখন আর সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব থাকে না, প্রতিযোগির অসত্য পন্থাকে হারাইবার জন্য যখন বৃহত্তর অসত্যের আশ্রয় নেওয়া আবশ্যক হয়, তখনই সাধু ব্যক্তির সাধুতার পরীক্ষা শুরু হয়। নিজে হারিয়া গেলেন, তবু অসত্যপন্থা অবলম্বন করিলেন না, এটাই তাঁর তৃপ্তি, এটাই তাঁর সান্ত্বনা। এঁরা নিজের জয়-পরাজয় দিয়া হার-জিতের বিচার করেন না; সত্যের জয়-পরাজয় দিয়াই নিজের হার-জিতের বিচার করেন।

এই জীবন দর্শনকে যাঁরা রাজনীতিতে পরখ করিতে চান। তাঁরা স্টেটসম্যান। স্টেটসম্যান ও পলিটিসিয়ানের পার্থক্য এইখানে। মহাত্মা গান্ধীর মতো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও রাজনীতিতে ন্যায় নীতি প্রয়োগ করিতেন। এই নীতিবোধ হইতেই উভয় নেতার রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের জন্ম হইয়াছিল। তাও ছিল একই প্রকারের।

মুসলিম-ভারতকে সাধারণভাবে এবং মুসলিম-বাংলাকে বিশেভাবে কংগ্রেসী রাজনীতিতে জড়াইয়াছিলেন প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিজে। মুসলমানরা জনতা হিসাবে প্রথমে যোগ দেয় খিলাফত আন্দোলনে। খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মুসলিম উদ্দীপনা কমিয়া আসিতে থাকে, তখন প্রথমতঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাবেই মুসলমানরা 'স্বরাজ আন্দোলনে' যোগদান করে। এ কাজে

দেশবন্ধুকে সাহায্য করেন নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ ও মওলানা আজাদ। আর বাংলায় এ কাজ করেন মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিতেন, ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দরকার আছে ঠিকই কিন্তু মুসলিম-ভারতের কাছে সাধারণভাবে এবং মুসলিম-বাংলার কাছে বিশেষভাবে তাঁর নিজের একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব রহিয়াছে। তাই তিনি অন্যান্য কংগ্রেস নেতার মতো শুধু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথাই বলেন নাই, সে ঐক্যের ভিত্তিরূপে মুসলমানদের অধিকার সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা করিতেও চাহিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি নিজ দায়িত্বে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সনদরূপে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লিপিবদ্ধ করিয়া 'বেঙ্গল-প্যাক্ট' রচনা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকে দিয়া তা অনুমোদন করিয়াছিলেন। অনুরূপ একটা 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল প্যাক্ট' গ্রহণ করিবার জন্য তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসকে প্রাণস্পর্শী ভাষায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এটা করিতে গিয়া দেশবন্ধু নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অপ্রীতি অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত নিজের মিশনের ব্যর্থতায় চরম নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি তাঁর 'মৃত্যুহীন প্রাণ' দান করেন। পরিণামে ভারত ভাগ হয়।

শহীদ সাহেবের বেলায়ও প্রায় এমনি ঘটিয়াছিল। বাংলাকে তিনি ভালবাসিতেন। এই বাংলা-প্রেম শহীদ সাহেব সম্ভবতঃ পাইয়াছিলেন দেশবন্ধুর কাছে। দেশবন্ধু তাঁর বহু বক্তৃতায় 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে' 'ধার করা ন্যাশনালিজম' বলিয়াছেন এবং 'বাংলার আত্মা', 'বাংলার বৈশিষ্ট্য', 'বাংলার ভূগোল' ও 'বাংলার ইতিহাস'কে তিনি শাশ্বত', 'চিরন্তন' ও 'ম্যাজিস্টিস' বলিয়াছেন। শহীদ সাহেবও তেমনি মুসলিম লীগের নেতা ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইয়াও বলিয়াছেন: 'আমি চিরদিন বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবেই কল্পনা করিয়াছি, ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গ হিসেবে কখনও ভাবি নাই।' তাঁর পরিকল্পিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্টের' মতই নিখিল ভারতীয় নেতৃত্বের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। দেশবন্ধুর মতই শহীদ সাহেবও নিখিল ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়েন।

তারপর সারা পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইয়াও তিনি তাঁর বাংলার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি তাঁর বিবৃতি-বক্তৃতায় এই বিভক্ত বাংলাকে বরাবর 'বেঙ্গল' বলিতেন। 'ইস্ট বেঙ্গল' বা 'ইস্ট পাকিস্তান' খুব কমই বলিতেন। তাঁর এই 'বেঙ্গলের' প্রতি তাঁর সাধারণ কর্তব্য ছাড়াও যে একটা বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব আছে, এ কথা তিনি কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। সে বিশেষ দায়িত্বটা ঘটিয়াছিল এইভাবে: লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই কোণে দুইটি মুসলিম মেজরিটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবার কথা ছিল। ছয় বছর

ধরিয়া এই দুই রাষ্ট্রের নকশাই মুসলিম-বাংলাসহ সারা ভারতের মুসলমানদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছিল। এই নকশার ভিত্তিতেই ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল। বাংলার মুসলিম ভোটাররা এই নকশার ভিত্তিতেই শতকরা নিরানব্বইটি ভোট দিয়াছিলেন। নির্বাচনের পরে দিল্লীতে নব-নির্বাচিত মুসলিম লেজিসলেটারদের এক কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনে সারা ভারতের মুসলিম মেজরিটি এরিয়াকে 'পাকিস্তান জোন' বলা হয় এবং এই জোনের জন্য একটি স্বতন্ত্র গণ-পরিষদের দাবী করা হয়। পরবর্তীকালে বলা হয় যে, এই দিল্লী প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের দুই রাষ্ট্রকে 'এক পাকিস্তান' করার জন্য শহীদ সাহেবকেই দোষী করা হয়। যদিও দিল্লী প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের কথা বলা হয় নাই, একটি মাত্র গণ-পরিষদের কথাই বলা হইয়াছিল, তথাপি পরবর্তীকালে দুই 'পাকিস্তানের' বদলে 'এক পাকিস্তানই' প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমাঞ্চলের করাচীতে। স্পষ্টতঃই এ ব্যবস্থা পূর্বাঞ্চলের স্বার্থবিরোধী। এর জন্য শহীদ সাহেবই দায়ী, শহীদ সাহেব নিজেও তা অনুভব করিতেন। কাজেই বাংলার এই অসুবিধা দূর করার ব্যক্তিগত দায়িত্ব শহীদ সাহেবের উপর বিশেষভাবে বর্তাইয়াছে, এটা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। পরবর্তী সারা জীবন তিনি এই চেষ্টাই করিয়াছেন। দুই অঞ্চলের মধ্যে সার্বিক প্যারিটি ও তিন বিষয়ের একটি ফেডারেশনের ভিত্তিতে দুই অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়াই ইহার একমাত্র প্রতিকার বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখিবার ইহাই একমাত্র পন্থা, একথা পশ্চিমা নেতাদের বুঝাইবার তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। পশ্চিমা নেতারা তাঁর উপদেশ না মানিয়া 'স্ট্রং সেন্টারের' জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং জনমত ও গণতন্ত্র দাবাইবার মতলবে তাঁরা মিলিটারী শাসন চালাইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছেন দেখিয়া শহীদ সাহেব দেশবন্ধুর মতই ভগ্ন হৃদয়ে অকালে বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন। পাকিস্তান দুই টুকরা হইয়া যায়।

আজ তাঁর পুণ্য স্মৃতিদিবসে সকলে চলুন আমরা শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক জীবন-দর্শনের মূল কথাটি স্মরণ করি। দেশ শাসনের জনগণের মতই শেষ কথা, এটাই ছিল শহীদ সাহেবের রাজনীতির মূল কথা। এটা সবাইকে মানিয়া চলিতে হইবে। আর কোন পথ নাই।

অক্টোবর, '৭২

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থিক পুনর্নির্মাণ

সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সব দেশের জন্য আর্থিক পুনর্গঠনটা কঠিন কাজ। যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা হাসিল করিয়া সেটা আরও কঠিন। যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াও বাংলাদেশ কি ভাবে দীর্ঘদিন শোষিত হইয়াছে, তার অর্থনীতিকে কিরূপে ইচ্ছামতভাবে ক্ষয়িষ্ণু করা হইয়াছে, দেশবাসীর তা জানা আছে। পুনরুক্তি শুধু অনাবশ্যক নয়, শ্রোতার জন্য বিরক্তিকরও বটে। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পরে অতীতের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য হায়-আফসোসে সময় নষ্ট না করিয়া দেশ পুনর্গঠনে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ মনোযোগ হইতে হইবে সামগ্রিক ও সর্বাত্মক। এ দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়। এমনকি যারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছেন শুধু তাঁদেরও নয়। সমগ্র দেশবাসীর। বস্তুতঃ সমগ্র দেশবাসী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনও–না–কোনো প্রকারে অংশগ্রহণ করিয়াছে। আমি ইতিপূর্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, আমাদের স্বাধীনতা–যুদ্ধটা ছিল সত্যিকারের জনযুদ্ধ। জনতার সামগ্রিকতায় শেষপর্যন্ত কোনও দলমতের পার্থক্য ছিল না। যাঁরা গোড়ায় পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন, সেই কারণে তাঁরা প্রথমদিকে আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা ঘোষণা পছন্দ করেন নাই, তারাও পাক-বাহিনীর বর্বরতায় শেষপর্যন্ত স্বাধীনতার সমর্থক ও স্বাধীনতার সংগ্রামে শরিক হইয়াছিলেন। এভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা জনযুদ্ধের ফল। এই কারণেই বাংলাদেশের আর্থিক পুনর্গঠনের দায়িত্বও সমগ্র দেশবাসীর। দেশবাসী অর্থে আমি জনসাধারণ বুঝাইতেছি না। দরিদ্র জনসাধারণ, কৃষক-শ্রমিক, তাদের দায়িত্ব সাধ্যাতীতরূপে পালন করিতেছে। দেশের আর্থিক দূরবস্থার প্রায় সবটুকু ধকল সকলের আগে পড়ে দারিদ্র জনসাধারণের উপর। কাজেই সমগ্র দেশবাসী অর্থে আমি এখানে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ছাত্র, তরুণ সবাইকে বুঝাইতেছি। এরাই সমাজের সচেতন অংশ। এদের যিনি যেখানে আছেন সেখান হইতেই কাজে ও চিন্তায়, হাতে ও মুখে দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করিবেন। শিক্ষিত নাগরিকের দায়িত্ব যেমন কঠিন, তেমনি পবিত্র। তাঁদের মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু মুখে সমর্থন করা সহযোগিতা নয়। তারিফ করা, তোষামোদ করা ও প্রতি কাজে বাহ্-বাহ্ দেওয়াও সরকারের সহেযোগিতা করা নয়। বরঞ্চ সরকারকে বিপদগামী করা। নিজের বিবেক-বুদ্ধিমতে সরকারকে উপদেশ দেওয়া শুধু মুখের সদুপদেশ নয়, কর্ম-পন্থার সুপারিশ করা, সরকার ভুল করিলে তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা, সংশোধনের উপায় নির্দেশ করা ইত্যাদিই দেশ ও সরকারের প্রতি শিক্ষিত সমাজের নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব।

পক্ষান্তরে, সরকারেরও মনে রাখিতে হইবে যে, তোষামুদী মাত্রেই সরকারের বন্ধু নয়। আর সমালোচক মাত্রেই সরকারের শত্রু নয়। বরঞ্চ সমালোচকদের চেয়ে চাটুকারদের মধ্যে সরকারে দুশমনের সংখ্যা বেশি। সরকারের সমর্থক ও হিতৈষীদের সকলে চাটুকার নন। চাটুকারি করিবার সময় ও সুযোগই তাদের নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রী-মেম্বর, সচিব-নেতাদের সাথে তাঁদের দেখাই হয় না। সে সুযোগ-সুবিধাই তাঁদের নাই। সে সুযোগ-সুবিধা যাঁরা করিয়া লন, তাঁরা স্বভাবতঃই দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থের জন্যই তার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিজের স্বার্থ হাসিলে চাটুকারিই সবচেয়ে ধারাল অস্ত্র ও ফলপ্রসু দাওয়াই। বলিলাম এই জন্য যে, মন্ত্রী সচিবদের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। এমনিতেই মানুষ সাধারণত চাটুকারির শিকার না হইয়া পারে না। তার উপর ইদানীং চাটু-শিল্পে, চারু-শিল্পে উন্নত হইয়াছে। দেশের আর্থিক পুনর্নির্মাণে শাসক ও শোষিত সম্প্রদায়ের সহযোগিতা নিশ্চিত করিতে হইলে আগে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। সদুপদেশ দিবার ও নিবার মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। অপ্রিয় কথা বলিবার সাহস ও শুনিবার উদারতা সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্জন করিতে হইবে।

ইতিপূর্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশের পুনর্গঠন কাজে আমাদিগকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক পুনর্নির্মাণকে মডেলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তার কারণস্বরূপ বলিয়াছিলাম, প্রথমতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাথমিক স্তরের সাথে আমাদের বর্তমান স্তরের অনেক মিল আছে; দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েট ইউনিয়নই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে বিস্ময়কর অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এটা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল, আমাদের দেশে কি করিয়া তা করা যায়, আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থা, পরিবেশ ও আবহাওয়ার বিচারে কি কি পরিবর্তন পরিবর্ধন করিতে হইবে, আমাদের অর্থ বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে এবং সরকারের অর্থ উপদেষ্টারা বিশেষভাবে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁরা সরকারকে তেমন উপদেশ ও পরমর্শ দিতেছেন। শুধু সে সব কথা বলিবার জন্য আমি আজকার আলোচনার অবতারণা করি নাই। আজকার আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নে ঐ সময়ে তথাকার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে আলোচনা, বিতর্ক ও প্রতিযোগিতার মনোভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, সেদিকে আমাদের সরকার ও অর্থ-বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তৎকালে এটা জানা না গেলেও আজ একথা সকলের জানা হইয়া গিয়াছে যে, ঈঙ্গ–মার্কিন অর্থ-বিজ্ঞানীদের উপেক্ষা-ঔদাসীন্য-অবজ্ঞার আড়ালে রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশ দশকের গোড়া হইতেই তুমুল বিতণ্ডা-বিতর্ক শুরু হইয়াছিল এবং সেটা লেলিনের উৎসাহে তাঁর আমল হইতেই শুরু হইয়াছিল। স্ট্যালিনের আমলেও পাঁচ বছর ধরিয়া সে বিতর্ক চলিয়াছিল। আমাদের দেশের মতই সোভিয়েট ইউনিয়নেও তখন বামপন্থী, মধ্যপন্থী ও ডানপন্থী তিন শ্রেণীর লোকই ছিলেন। অর্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যেও তাই ছিল। "কৃষি সম্পদকে 'পাম্প করিয়া' শিল্প ক্ষেত্রে লইয়া আসা এখনি উচিত কি না", প্রধানতঃ এটাই ছিল বিতর্কের বিষয়। বুখারিন, শানিন, বদখরভ, গ্রোমান প্রমুখ তৎকালীন রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীরা সকলে এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। প্রবন্ধ ও বই-পুস্তক লিখিয়াছেন। স্ট্যালিনের আমলে

স্ট্যালিন নিজের মধ্যপন্থার সমর্থন করিয়াছেন। একদিকে শানিন ও বুখারিন প্রমুখ দক্ষিণপন্থী, অপরদিকে প্রোব্রাযেনস্কি ও লিচো সেনকো বামপন্থী হিসাবে এই বিতর্কে যে সব নতুন নতুন কথা বলিয়াছেন, পরবর্তীকালে বৃটিশ ও মার্কিন অর্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে সব কথা বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল।

ঐ সময়কার রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীদের ঐ বিতর্কে কোন এক পক্ষের সমর্থন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এমন কি, ঐ বিতর্কের ফলাফলের গুরুত্ব প্রমাণ করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কারণ সে গুরুত্ব আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীদের ঐ বিতর্কের ফল সে পরিকল্পিত অর্থনীতি তা আজ দুনিয়ার সর্বত্র স্বীকৃত। সমাজবাদী-পুঁজিবাদী নির্বিশেষে সব রাষ্ট্রই আজ আর্থিক পরিকল্পনার নীতি মানিয়া লইয়াছে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীরাও তাঁদের গত যুগের রিজিভ ডগম্যাটিজম পরিত্যাগ করিয়া স্বীকার করিতেছেন যে, 'লগ্নির মুনাফা'টা সমাজবাদী অর্থনীতির বিরোধী নয়, অতএব, বিশ দশকের রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীদের ঐ বিতর্কের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অন্যত্র নিহিত। সে গুরুত্ব এই যে, কোনও নয়া রাষ্ট্রের অর্থনীতিক জীবনকে সম্পূর্ণ নতুনরূপে রূপায়িত করিতে হইলে শুধু সরকারের চেষ্টায় তা হয় না। দেশের অর্থ-বিজ্ঞানীদের সামগ্রিকভাবে সরকারের চিন্তা ও কর্মে শরিক হইতে হয়। আমার অভিযোগ এই যে, আমাদের দেশের অর্থ-বিজ্ঞানীরা সমবেতভাবে এ কাজ করিতেছেন না। অথবা সরকারই অর্থ-বিজ্ঞানীদের এ কাজে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেছেন না। অথচ এটা খুবই দরকার।

সে দরকারের আকৃতি-প্রকৃতি অবশ্যই ভিন্ন ধরনের হইবে। রুম অর্থ-বিজ্ঞানীদের আমলে বিশ দশকে যে সমস্যা ছিল, আজ সত্তুরের দশকে আমাদের অর্থ-বিজ্ঞানীদের সামনে ঠিক সে সমস্যা নাই। রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীদের সামনে কোন মডেল বা নজির ছিল না। তাঁরা শুধু জানিতেন সনাতন পূঁজিবাদী লগ্নিতে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাঁদের নতুন পথ বাহির করিতে হইবে। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা বিতর্ক-বিতণ্ডা চালাইয়াছিলেন। অবশেষে পথ পাইয়াছিলেন। পুঁজিবাদ হইতে সমাজবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণ শুধু কথার কথা ছিল না। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা একটা অভূতপূর্ব কঠিন সমস্যা ছিল। সে সমস্যার সমাধান তাঁরা করিয়াছিলেন পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করিয়া। ফলে আমাদের জন্য এ কাজটা তেমন কঠিন নয়। কলামবাসের জন্য মার্কিন মুল্লুকে যওয়া যেমন কঠিন ছিল, আমাদের জন্য তেমন কঠিন নয়। রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীদের জন্য সেটা ছিল গবেষণার বস্তু। আমাদের অর্থ-বিজ্ঞানীদের জন্য সেটা মাত্র প্রয়োগের বস্তু। প্ল্যান্ড ইকনমির পথেই আমাদের অর্থনীতিকে কৃষি-ভিত্তিক হইতে শিল্পভিত্তিতে নিতে হইবে, এ কথা ঠিক। কিন্তু এই প্ল্যানিংটাও হইতে হইবে বাস্তব-ভিত্তিক। মূলনীতি এক হইলেও প্রয়োগবিধি হইবে ভিন্ন। বিষয়টা দেখিতে যত সোজা, আসলে তত সোজা নয়। সোজা নয় বলিয়া বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা আজও এটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁরা একটা পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা করিয়াও অবশেষে সেটা ভাঙ্গিয়া একসালা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভালই করিয়াছিলেন। না করিলে ভুল হইত। সে

ভুলের খেসারত হইত খুবই মোটা। এখন ভাবিয়া-চিন্তিয়াই কাজ করিতে হইবে। আমাদের বিশেষ সমস্যা কি, তা ভালরূপে বুঝিতে হইবে। কৃষি-অর্থনীতি হইতে শিল্প-অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে যে সব সাধারণ বিঘ্ন আছে, সেগুলির সমাধানেরও নজির আছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ পরিবেশ ও আবহাওয়ার ফলে যে সব বিশেষ সমস্যা, তার সমাধান আমাদেরই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এ কাজেই আমাদের দেশের অর্থ-বিজ্ঞানীদের সকল বিষয় 'মাথা একত্রিত' করিতে হইবে। এখানেই রুশ অর্থ-বিজ্ঞানীদের বিশ দশকের কর্তব্যের সাথে আমাদের অর্থ-বিজ্ঞানীদের কর্তব্যের মিল আছে। আমাদের এই সব বিশেষ সমস্যা কি এবং তাহাদের সমাধান কি, তার বিচার বিবেচনা ও সমাধান করিবেন আমাদের অর্থ-বিজ্ঞানীরাই। সরকার নিশ্চয়ই তাঁদের সহায়তা ও সহযোগিতা লাভের ও গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। এ বিষয়ে দলীয় মনোভাব বা ব্যক্তিগত ঈর্ষা-জিগীষা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে যেন না পারে, সেদিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।

আমাদের সমস্যা উপলব্ধি ও সমাধান বাহির করার দায়িত্ব অর্থ-বিজ্ঞানীদের উপর ছাড়িয়া দিয়া উম্মি মানুষ হিসাবে আমি এখানে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখিতেছি। কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার বেলা ত নিশ্চয়ই, সাধারণ শিল্পোন্নয়নের বেলাও অর্থবিজ্ঞানীরা প্রায়ই পুঁজির অভাবের কথা বলিয়া থাকেন। পাকিস্তানী আমলে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত অনগ্রসরতার কারণ ছিল আমাদের তথাকথিত পুঁজি গঠনের অভাব। আমরা খাদ্য ঘাটতির দেশ। পাটে যা উৎপাদন করি, সবই খরচ হইয়া যায় বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানিতে। ফলে কোনও সঞ্চয় আমাদের হয় না। সঞ্চয় না হইলে পুঁজি গঠন হইবে কোথা হইতে? কথাটা এতই সুস্পষ্টভাবে যুক্তিসঙ্গত যে বহুদিন আমরা এর প্রতিবাদ করিতে পারি নাই। অবশেষে আমাদের অর্থ-বিজ্ঞানীদের দুই-একজন কথাটার প্রতিবাদ করেন। বেশ কিছুকাল আগে এই 'ইত্তেফাকের' পৃষ্ঠাতেই 'শিল্পোন্নয়নে পুঁজির ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞানীদের অভিমত উদ্বৃত্ত করিয়া আমি দেখাইয়াছিলাম যে, আমাদের শিল্পোন্নয়নে পুঁজির অভাবের যুক্তিটা নিতান্তই অসার। শিল্প স্থাপনে পুঁজির ভূমিকা অতিশয় নগণ্য। এ কথা আগেও সত্য ছিল। আজও সত্য আছে।

কিন্তু আরেক দিক হইতে আমাদের শিল্পোন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দেখান যাইতে পারে। আমাদের জন-বলের বেশির ভাগ নিয়োজিত রহিয়াছে কৃষি উৎপাদনে, তার মানে খাদ্য উৎপাদনে। এতে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজন-মাফিক শ্রমিক সরবারাহ খুবই কঠিন। কৃষি-কাজে নিয়োজিত জন-বলকে শিল্পে নিয়োগ করিতে গেলে একদিকে খাদ্য উৎপাদন কমিয়া যাইবে, অপরদিকে শিল্প এলাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্য-সরবরাহ সম্ভব হইবে না। পুরাতন পদ্ধতির কৃষি-কার্যের স্থলে যান্ত্রিক কৃষি প্রচলনের আগে আমরা কিছুতেই কৃষি ক্ষেত্র হইতে শিল্প ক্ষেত্রে জনবল স্থানান্তরিত করিতে পারি না। তার মানে কৃষি উন্নয়নের আগে শিল্পোন্নয়নে হাত দিতে পারি না; আবার শিল্পন্নোয়নের আগে কৃষি উন্নয়নেও হাত দিতে পারি না। সেই ভিশাম সার্কেল, আন্ধা চক্কর। এটা না হইলে ওটা পারি না; খানা না কমাইলে সঞ্চয় হয় না। সঞ্চয় না হইলে উৎপাদন বাড়ে না। উৎপাদন

না বাড়িলে খাইতে পারি না। গরীবের বউ-এর খাট শাড়ী আর কি? বুক ঢাকিতে গেলে পিঠ উদাম, পিঠ ঢাকিলে বুক উদাম।

কিন্তু এটা সনাতন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক যুক্তি। সমাজবাদী অর্থ-বিজ্ঞানীরা এর সমাধান বাহির করিয়াছেন। তাঁরা আবিষ্কার করিয়াছেন, শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি পুঁজি নয়, তার আসল ভিত্তি সংগঠন। তার মানে আর্থিক সংগঠন। পরিকল্পিত অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী যার-যা খুশি অর্থনীতির তুলনা করিলেই এই 'আর্থিক সংগঠন' কথাটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এটা অর্থ-বিজ্ঞানীদের কাজ। আশা করি, তারা সরকারকে এবং গোটা দেশবাসীকে এটা বুঝাইয়া দিবেন।

একবার এটা বুঝিতে পারিলে একথাও সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, সঞ্চিত সোনা নয়, জন-বলই দেশের সম্পদ। যে দেশের যত জনবল আছে, সে দেশের তত পুঁজি আছে। জনগণ মানেই শ্রম, শ্রম মানেই পুঁজি। জনবল খোদার ফজলে আমাদের প্রচুর। অফুরন্ত বলাও চলে। অনিয়োজিত এই জনবল আমাদের বোঝা। বিরাট সমস্যা। কিন্তু নিয়োজিত জন-বল আমাদের সম্পদ। আমাদের পুঁজি। কৃষি-শ্রমের দিক হইতে কাহিল। এদের শিল্পে স্থানান্তরিত করিলে কৃষি-শ্রমে ঘাটতি হইবে না। ফলে আমার বেলা পুঁজির অভাবের প্রশ্ন নয়। পুঁজি নিয়োগের প্রশ্ন। রুশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ইত্যাদি পূর্ব-ইউরোপীয় দেশেও আমাদের দেশের মতই অনিয়োজিত জন-সম্পদ বেকার পড়িয়াছিল। সমাজবাদী অর্থ-বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম এই জনবলকে পুঁজিরূপে নিয়োগ করিবার পরামর্শ যাঁর তাঁর দেশের সরকারকে দিয়াছিলেন। তারা অর্থ-বিজ্ঞানীদের সে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব-ইউরোপের সবগুলি দেশেই যে রাতারাতি সমাজবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তার গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে এইখানে।

আমাদের দেশের আর্থিক পুনর্নির্মাণের গুঢ় রহস্যও নিহিত রহিয়াছে আমাদের বিরল জনবলে। তাদের পুঁজিরূপে বিনিয়োগের মধ্যে। রুশ সমাজবাদী অর্থ-বিজ্ঞানীদের পথ ধরিয়াই আমাদের অর্থ-বিজ্ঞানীরা এটা করিতে পারেন। পুঁজিবাদী সনাতন অর্থ-বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন জন-বল নিয়োগ করিতে হইলে আগে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার। সমাজবাদী অর্থ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন, এটা ভ্রান্ত ধারণা। পুঁজিবাদী অর্থ-বিজ্ঞানীদের এমন অনেক ধারণাই সমাজবাদী অর্থ-বিজ্ঞানীরা মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন, এভাবে তাঁরা শিল্পায়নে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক সমস্যাও তারা এইভাবেই মিটাইয়াছেন। সাঁতার শিখিতে আগে পানিতে নামিতে হয়। সেইরূপ শিল্পই শিল্পের দক্ষ শ্রমিক তৈয়ার করে।

আমাদের অর্থ-বিজ্ঞানীরাও এই পথে চলুন।

৩রা নভেম্বর-১৯৭২

শিমলা-চুক্তির বাস্তবায়ন ও উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি

শিমলা চুক্তি আজ সাফল্যের পথে। গোটা উপমহাদেশের জন্যই এটা সুসংবাদ। শিমলা-চুক্তির গাড়ির চাকা খাদে পড়িয়াছিল। যে-সে খাদ নয়। কাশ্মীরের পাহাড়িয়া খাদ। পাক্কা চার চারটা মাস চুক্তির গাড়িটি এই খাদে পড়িয়াছিল। এক এক দিন মনে হইয়াছে, খাদ হইতে চাকা বুঝি আর উঠিল না। শিমলা-চুক্তি বুঝি ব্যর্থ হইল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীসহ দেশী-বিদেশী অনেক নেতাই নৈরাশ্য প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। সকলের এমন নৈরাশ্যের ঘন কুয়াশা ভেদ করিয়া আশার সুরুজ উঠিয়াছে। গভীর খাদ হইতে শিমলা-চুক্তির চাকা উদ্ধার পাইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের 'নিয়ন্ত্রণ-রেখা' সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্তান সরকার একমত হইয়াছেন। 'নিয়ন্ত্রণ-রেখা'র ম্যাপে উভয়পক্ষ সই করিয়াছেন। সৈন্যাপসারণের কাজ শুরু হইয়াছে। অনুমান করা হইতেছে দশ-পনর দিনের মধ্যেই সৈন্য সরানোর কাজ শেষ হইয়া যাইবে। এই সংবাদে শান্তিকামী বিশ্ববাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। আমরাও ফেলিয়াছি। কারণ, শিমলা-চুক্তির সাফল্যে আমাদের স্বার্থও জড়িত। শিমলা-চুক্তির ব্যর্থতায় আমাদেরও ক্ষতি। শিমলা-চুক্তি সফল হইলে তাতে আমাদেরও লাভ হইবে। শিমলা-চুক্তি দেখায় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হইলেও, সে চুক্তির মধ্যে বাংলাদেশের নাম-নিশানা না থাকিলেও, ঐ চুক্তিটা আসলে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। চুক্তির উদ্দেশ্য এই উপমহাদেশের শান্তি। বাংলাদেশও উপ-মহাদেশেরই অংশ।

শুধু অমন পরোক্ষভাবে নয়, বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবেই শিমলা-চুক্তির সহিত জড়িত। চুক্তির ছয় নম্বর দফায় বলা হইয়াছে যে, সৈন্য অপসারণ শেষ হইবার পর উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা যুদ্ধবন্দী ও অসামরিক আটক ব্যক্তিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নসহ স্থায়ী শান্তি স্থাপন ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করিবেন এবং কাশ্মীর সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। 'যুদ্ধ-বন্দী ও অসামরিক আটক ব্যক্তিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আলোচনার' মধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা ও উপস্থিতি অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। যুদ্ধবন্দী দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর যুদ্ধবন্দী পশ্চিমের। ভারত ও পাকিস্তান সীমানায় যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানকার বন্দীরাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরেক শ্রেণীর যুদ্ধবন্দী পুবের। বাংলাদেশের যুদ্ধে যেসব পাক সৈন্য বন্দী হইয়াছিল অথবা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, এরাই এই শ্রেণীভুক্ত। পশ্চিমের যুদ্ধবন্দীদের প্রায় সবাই এতদিনে ছাড়া পাইয়া যার-যার দেশে ফিরিয়া

গিয়াছে। যে অল্পসংখ্যক সৈন্য আজও বন্দী আছে, তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কোনও সমস্যা নয়। আসল সমস্যা পূবের যুদ্ধবন্দীদেরে লইয়া। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সব ব্যাপার মিটিয়া গেলেও এই বন্দীরা মুক্তি পাইতে পারে না। এদের মুক্তির জন্য বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি পাইতে হইবে। কারণ, এই ফ্রন্টের পাক সৈন্যরা ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত কমাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ভারত সরকারের একার মতে এই যুদ্ধবন্দীরা খালাস পাইতে পারে না। তাছাড়া এই বন্দীদের কেউ কেউ যুদ্ধাপরাধী। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার দায়ে এইসব যুদ্ধবন্দীর বিচার করিবেন। সে কথা ভারত সরকারকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে ভারত সরকারও পাকিস্তান সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি ছাড়া পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়া যাইবে না। সে উদ্দেশ্যে পাক সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের সাথেই আলোচনা করিতে হইবে।

সুতরাং স্পষ্টতঃই বাংলাদেশের সাথে আলাপ-আলোচনা না করিয়া পাকিস্তান তার যুদ্ধবন্দীদেরে ফেরত পাইতে পারে না।

যুদ্ধবন্দীদের সম্বন্ধে যে কথা, অসামরিক আটক ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও সেই কথা। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সব অসামরিক আটক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদেরও প্রায় সবাই এওয়াজ বদলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু কয়েক লক্ষ বাঙ্গালি পাকিস্তানে আটক পড়িয়া আছেন। এদের মধ্যে কিছু লোক সামরিক ও অসামরিক সরকারী চাকুরিয়া; কিছু লোক বেসরকারী চাকুরিয়া। আর অধিকাংশই জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবসায়াদিতে লিপ্ত ছিলেন। এঁদের কাউকে আটক করিবার বা যুদ্ধবন্দীদের সাথে এওয়াজ বদল করিবার ধারণা করাও ন্যায়নীতি ও কূটনীতির বিরোধী। এঁদের অনেকের প্রতি পাকিস্তান সরকার যে দুবর্ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে, কোন সভ্য দেশের পক্ষেই সেটা সম্ভব হইত না। তবু তাঁদের বিষয় লইয়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা-আন্দোলন করিবার কোন সুবিধা আমাদের ছিল না। জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্লির সর্বশেষ প্রস্তাবে সে সুযোগ ও অধিকার আমাদের হইয়াছে। এই আটক বাঙ্গালিদের মুক্তির জন্য আমাদের সরকারকে যেমন পাকিস্তান সরকারের সাথে কথা বলিতে হইবে, পাকিস্তান সরকারকেও তেমনি আমাদের সরকারের সাথে কথা বলিতে হইবে। এইভাবে যুদ্ধবন্দী মুক্তির প্রশ্নের মতই আটক বাঙ্গালিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটাও শিমলা-চুক্তির ছয় নম্বর দফার বিষয়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক হইতেও শিমলা-চুক্তি কার্যতঃ ও পরিণামে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

শিমলা-চুক্তি একটি ঐতিহাসিক দলিল। শুধু বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও। শুধু পাক-ভারত শান্তি ও মৈত্রীর জন্য নয়, গোটা উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি ও ফলপ্রসূ মৈত্রীর জন্যও। এই চুক্তির মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় অশান্ত রাজনীতির সুন্দর পরিসমাপ্তি আছে। এতে ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের রূপায়ণ

আছে, ১৯৪৭ সালের বাঁটোয়ারার অন্তর্নিহিত স্পিরিট-অব-পার্টিশন আছে। পাকিস্তানের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের জীবনে লাহোর প্রস্তাবের যে মর্ম পাকিস্তানের শাসকরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সেই মর্ম রূপায়ণের সুস্পষ্ট নির্দেশ শিমলা-চুক্তিতে আছে। লাহোর প্রস্তাব অসাধারণ মনীষা ও দূরদর্শী বাস্তববাদী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার একটি অমূল্য অবদান। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি ঐতিহ্যবান, গরীয়ান মহান জাতির সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে তিনটি গণতান্ত্রিক সেকিউলার নেশন গড়িবার এটি একটি নির্ভুল প্ল্যান। ভারতের হিন্দু নেতৃত্ব এই হিসাবেই এই প্ল্যান মানিয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু ভুল করিলেন মুসলিম নেতৃত্ব। ভৌগোলিক ব্যবধানের দুইটি দেশকে ধর্মের নামে এক রাষ্ট্র করিতে চাহিলেন তাঁরা। পরিণাম ভয়াবহ হইল। মুসলমানের হাতে নিহত ত্রিশ লাখ মুসলমানের লহুর দরিয়া পার হইয়া সে ভুলের কাফ্‌ফারা দিতে হইল। মুরুব্বীদের হাতে রচিত লাহোর প্রস্তাবের মর্যাদা রক্ষিত হইল অভাবনীয় হৃদয়বিদারক শাস্তির মধ্য দিয়া। ১৯৪৭ সালে শিমলাতে যে ভুল করা হইয়াছিল, ১৯৭২ সালে সেই শিমলাতেই সে ভুলের সংশোধন হইল। শিমলা-চুক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য এইখানে।

শিমলা-চুক্তি স্বাক্ষর করিবার সময় জনাব ভুট্টো নিশ্চয়ই এটা বুঝিয়াছিলেন। অতীতে তিনি ন্যায়নৈতিক ও রাজনৈতিক গোনাহ্ যতই করিয়া থাকুন না কেন, শিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে তার অনেক গোনাহ্ মাফ হইয়া গিয়াছে। কারণ এটা স্বাক্ষর করিতেও মনের দিক দিয়া তাঁকে অনেক দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। এক নম্বরের দুশমন ভারতকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'হাজার বছরের লড়াই'র বদলে চিরস্থায়ী শান্তির কথা বলিতে হইয়াছে। জনাব ভুট্টোর এই পরিবর্তন খাঁটি মত পরিবর্তন নয়, এসব ভাল ভাল কথা সবই তাঁর ভণ্ডামি মাত্র, তা বলিতেছি না। তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশও করিতেছি না। ঘটনার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাদের মত বদলায়। ভাল মানুষ খারাপ হয়। খারাপ মানুষ ভাল হয়। ভুট্টো সাহেবের মনের ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এটা আমরা ধরিয়া লইতেছি। মনের ও মতের এই পরিবর্তনের ফলেই শিমলা-চুক্তির মত একটা দূরদর্শী কল্যাণমুখী দলিলে দস্তখত দিতে পারিয়াছেন, এটাও আমরা বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু শিমলা-চুক্তি কার্যকর করিতে তিনি এত বিলম্ব ঘটাইতেছেন কেন? প্রথমতঃ শিমলা বৈঠক বসাইতেই তিনি এক মাস দেরি করিয়াছিলেন। যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তারিখ দিয়াছিলেন ২৮শে মে, সেখানে জনাব ভুট্টো আসিলেন ২৯শে জুন। শিমলা বৈঠকে বসিবার আগে তিনি বহু বন্ধুরাষ্ট্রে সফর করিতে গেলেন। ফলে, যে শিমলা চুক্তি সই হইতে পারিত ৩০শে মে বা ১লা জুন তারিখে, তাই হইল ৪ঠা জুলাই। চুক্তির ৩নং শর্তের ৩নং উপশর্তে লেখা আছে, এক মাসের মধ্যে উভয় পক্ষের দখলিত ভূমি হইতে সৈন্য প্রত্যাহার শেষ করিতে হইবে। পাকিস্তানের পাঁচ হাজার ছয় শ' ঊনিশ বর্গমাইল জমি ভারতের দখলে রহিয়াছে। এইসব অঞ্চলের প্রায়

দশ লক্ষ বাসিন্দা নিজ নিজ জমি-বাড়ি ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের আরও ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। তাতে পাকিস্তানে শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে এইসব শরণার্থীকে পাকিস্তান সরকারের পালন করিতে হইতেছে, অপরদিকে এইসব শরণার্থীর পরিত্যক্ত আবাদী জমি পতিত পড়িয়া রহিয়াছে। তাতে পাকিস্তানে ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য কম উৎপাদন হইতেছে। এর তুলনায় ভারতের মাত্র একশ' একুশ বর্গমাইল জমি পাকিস্তানের দখলে রহিয়াছে। তার ফলে ভারতের কোনও উল্লেখযোগ্য সমস্যাই সৃষ্টি হয় নাই। পাকিস্তানের নব্বই হাজারের বেশি সৈন্য ভারতের হাতে বন্দী আছে। সে তুলনায় পাকিস্তানের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী রহিয়াছে মাত্র ছয়'শ ছাপ্পান্ন জন। এ অবস্থায় শিমলা-চুক্তি যত তাড়াতাড়ি কার্যকর হয়, ভারতের চেয়ে পাকিস্তানেরই তত বেশি লাভ। অথচ ৪ঠা জুলাই স্বাক্ষরিত চুক্তি এক মাসের মধ্যে কার্যকর হওয়ার বদলে পাঁচ মাস ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। এর জন্য দায়ী একমাত্র পাকিস্তান। চুক্তি কার্যকর করিবার প্রথম পদক্ষেপ ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ-রেখা ঠিক করা। চার মাস ধাক্কাধাক্কি করিয়া মাত্র সেদিন গত সোমবার এই নিয়ন্ত্রণ-রেখা ঠিক হইয়াছে। এর জন্য যে পাকিস্তানই দায়ী, তার প্রমাণ এই যে, ঠাকু চক নামক একটি জায়গাকে নিয়ন্ত্রণ-রেখার অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবি করিয়াছিল পাকিস্তান। ভারত এতে আপত্তি করিয়াছিল। চার মাসের ঠেলাঠেলির পর পাকিস্তান ঠাকু চকের দাবি ত্যাগ করিয়াছে। অমনি নিয়ন্ত্রণ-রেখা চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সৈন্য অপসারণ শেষ হইয়া যাইবে।

এতে কি পাকিস্তানের হারিয়া গেল? ভারত কি জিতিয়া গেল? না, এতে পাকিস্তানও হারে নাই, ভারতও জিতে নাই। আসলে শান্তির জয় হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যেসব বিরোধ আপোষে মিটান হয়, সবগুলিতেই এমনি ঘটিয়া থাকে। দৃশ্যতঃ এক পক্ষের জয় আর অপর পক্ষের পরাজয় হয় বটে, আসলে কিন্তু শান্তিরই জয় হয়। তার ফলে জয় হয় উভয় পক্ষেরই। শান্তির জয় মানেই উভয় পক্ষের জয়। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে বিষয়াদি লইয়া ঝগড়া-ফসাদ, মারামারি-খুনাখুনি ও মামলা মোকদ্দমা করিয়া দেখিয়াছি পরিণামে লোকসান হয় দুই পক্ষেরই। অথচ গোড়াতে এ-পক্ষ দুই হাত জমি বা ও-পক্ষ কোনও স্বার্থত্যাগ করিয়া আপোষ করিয়া ফেলিলে ঐসব খুনাখুনি মামলা-মোকদ্দমা তদ্দরুণ অর্থব্যয় কিছুরই দরকার হইত না। সকল মানুষের ও সকল রাষ্ট্রের জন্যই এটা সত্য। ভারত পাকিস্তানের জন্যও এটাই সত্য। পাকিস্তানের হার যা হইবার ১৯৭১ সালেই তা হইয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া হারিতে হইবে না। ভারত পশ্চিম ফ্রন্টে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া আরও বেশি জিতিয়া গিয়াছে। বুদ্ধিমানেরা শুভবুদ্ধির জোরে এমনি করিয়াই সব ব্যাপারে জিতিয়া থাকে। পক্ষান্তরে অদূরদর্শীরা জিতিয়াও হারিয়া যায়। ব্যক্তি যেমন মামলায় জিতিয়াও আসলে হারিয়া যায়, জাতিও তেমনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও পরিণামে হারিয়া যায়।

পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের জীবনে তাই ঘটিয়াছে। জিতিয়া হারিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বাঁটোয়ারা হইতে শুরু করিয়া দুই-দুইটা যুদ্ধে আমরা জিতিয়াছি, আর তারা হারিয়াছে। টেবিলে বসিয়া আপোসে ভারত বাঁটোয়ারা হইল; স্পিরিট-অব-পার্টিশন ভুলিয়া আমরা কিন্তু বগল বাজাইলাম: "আমরা জিতিয়াছি, হিন্দুদের হার হইয়াছে। আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান' করিয়াছি।" তারপর কাশ্মীর, রান-অব-কচ্ছ ও লাহোর ফ্রন্টের সব যুদ্ধে আমরা 'জিতিয়াছি'। 'ভিক্টরি ডে'ও উদ্‌যাপন করিয়াছি। এমনকি তাসখন্দেও আমরাই জিতিয়াছি। এসবগুলিতেই হিন্দুরা ও ভারত হারিয়াছে। কিন্তু পরিণামে কি দেখা গেল? দেখা গেল এই যে, গত চব্বিশ বছরের সব জিতেই আমাদের হার হইয়া গিয়াছে। ভারত ও হিন্দুদের সব হারাই জিত হইয়া গিয়াছে। তার সর্বশেষ প্রমাণ ১৯৭১ সালের যুদ্ধ। এতে পাকিস্তানের সম্পূর্ণ পরাজয় ও ভারতের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে। তবু মনে হইতেছে, পাকিস্তানের এই পরাজয় শেষ পরাজয় নয়, সামনে আরও আছে আর ভারতের এই জয়ই শেষ জয় নয়, সামনে আরও আছে। কারণ, পাকিস্তান তার পরাজয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে না, আর ভারত তার জয়ের অসৎ সুযোগ গ্রহণ করে না। গতবারের যুদ্ধ জয়েরও অসৎ সুযোগ ভারত নেয় নাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানিয়া লইয়াছে। পাকিস্তানের সাথে শিমলা-চুক্তি করিয়াছে। সৈন্য প্রত্যাহার ও দখলিত ভূমি ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইসরাইলের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া দখলিত আরব ভূমিতে চাপিয়া বসিয়া আছে। জাতিসংঘের অত-অত প্রস্তাবও কানে তুলিতেছে না। আর অত বড় বৃহৎ রাষ্ট ভারত পাকিস্তানের আগ্রাসনী যুদ্ধে পাকিস্তানের বিশাল ভূমিখণ্ড দখল করিয়াও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের আগেই একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়াছে এবং দখলিত ভূমি হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাব দিয়াছে। জয়ের এমন সদ্ব্যবহার করিতে জানে যারা, বরাবর জয়লাভ করে তারাই।

পাকিস্তানের শাসকরা এটা বুঝেন নাই বলিয়াই তাদের এত যিল্লতি, তাদের দেশের এত দুর্দশা। পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে জনাব ভুট্টোই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যা ও তার সমাধান উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনিই শিমলা-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পশ্চিমা নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বলিয়াছেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থ পাকিস্তান ভাঙ্গা নয়, লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক 'পাকিস্তানে'র প্রতিষ্ঠামাত্র।" তথাপি তিনি নানা অজুহাতে বাংলাদেশকে মান্যতা দিতে বিলম্ব করিতেছেন। কৈফিয়তস্বরূপ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের নেতারা আমার ব্যথা বুঝিতেছেন না। আমি যে প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যে কাজ করিতেছি, ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবশ্যকতা পাকিস্তানীদের বুঝান যে, কত কঠিন কাজ দূরে বসিয়া ভারতের ও বাংলাদেশের নেতারা তা বুঝিতে পারিতেছেন না।"

ভুট্টো সাহেবের প্রতি সহানুভূতির অভাব আমাদের অন্তরে নিশ্চয়ই নাই। আমরা তাঁর অসুবিধাও বুঝিতেছি। লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডির কলেজের ছাত্ররা যে বাংলাদেশ স্বীকৃতি-বিরোধী আন্দোলন করিতেছে, তারও বিবরণ আমরা খবরের কাগজে পড়িতেছি। কিন্তু ওসবের প্রতিকার বাংলাদেশ ও ভারতের নেতাদের হাতে নাই। গোটা পাকিস্তানের,

বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের ছাত্র-তরুণদের মধ্যে ঐ মনোভাব সৃষ্টির জন্য ভারত ও বাংলাদেশের নেতারা দায়ী নন। পশ্চিমা নেতারাই সে মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ভুট্টো সাহেব ঐ মনোভাব সৃষ্টিকারীদের প্রথম কাতারের নেতা। ভারতের বিরুদ্ধে 'হাজার বছরের যুদ্ধ' করিবার এবং সে উদ্দেশ্যে ঘাস খাইয়া এটম বোমা তৈয়ারি করিবার ওয়াদা করিয়াই তিনি গত নির্বাচনে পাঞ্জাবের প্রায় সব ভোট হস্তগত করিয়াছেন। নির্বাচনের পরে ঢাকাকে কসাইখানা আখ্যা দিয়া বাঙ্গালি জাতির উপর পাঞ্জাবী সৈন্য লেলাইয়া দেওয়ার কাজে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সমর্থন করিয়া এবং সর্বশেষে এই নৃশংস কাজকে 'আল্লাহ্ পাকিস্তানকে বাঁচাইয়াছেন' বলিয়া অভিনন্দিত করা, এ সবই তাঁর নিজের কাজ। আজ লাহোর ও পিণ্ডির ছাত্র-তরুণরা যা করিতেছেন, সবই ভুট্টো সাহেবের কথা ও কাজেরই প্রতিধ্বনি। তিনি এবং তাঁর দল তরুণদেরে যা শিখাইয়াছেন, তরুণরা আজও তাই করিতেছে। ভুট্টো সাহেব ও তাঁর দলের বয়স্করা যত তাড়াতাড়ি মত ও কথা বদলাইতে পারেন, ছাত্র-তরুণরা তত তাড়াতাড়ি না পারিলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। সেজন্য ছাত্র-তরুণদেরে নূতন কথা শুনাইতে হইবে এবং সেসব কথা হজম করিবার সময়ও তাদেরে দিতে হইবে। ভুট্টো সাহেবের দেশের ছাত্র-তরুণদের মত পরিবর্তনের অপেক্ষায় ভারত ও বাংলাদেশের নেতারা যদি বসিয়া না থাকেন, তবে তাঁদেরেও দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ যখন তারা দেখিতেছেন, ভুট্টো সাহেব অতীতের 'ষ্টান্ট'গুলির সংশোধন করার বদলে নিত্য নূতন 'ষ্টান্ট' মারিতেছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মোলাকাতের জিদ করিতেছেন। স্বীকৃতির আগেও যে দুই রাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে কথা হইতে পারে তার নজির দিতেছেন চীন-মার্কিন নেতৃদ্বয়ের মোলাকাত। এটাও যে একটা 'ষ্টান্ট' ভুট্টো সাহেব তা জানেন। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সম্পর্কের সাথে চীন -মার্কিনের সম্পর্কের তুলনা চলে না এটা না বুঝিবার মতো অজ্ঞ ভুট্টো সাহেব নিশ্চয়ই নন। ভুট্টো সাহেবের পাকিস্তান তাঁর সংবিধানে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের প্রদেশ বলে। কিন্তু চীন-মার্কিনের মধ্যে কেউ অপরকে নিজের প্রদেশ মনে করিত না।

যাহোক, এসব কথা ভুট্টো সাহেবকে বলিয়া লাভ নাই। কারণ, তিনি নিজেই সব বুঝেন। তিনি 'নিয়ন্ত্রণ-রেখা' চূড়ান্ত করিয়া ভারতের দ্বারা দখলিত ভূমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরপর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবশ্যকতা থাকে শুধু যুদ্ধবন্দীদের ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য। ভুট্টো সাহেব যদি তাঁর রাষ্ট্রের বর্তমান সংকট মুহূর্তে প্রায় এক লাখ সৈন্যকে দেশে ফিরাইয়া নেওয়া নিরাপদ মনে না করেন, তবে নিত্য নূতন টালবাহানা সৃষ্টি করিয়া বাংলাদেশের মান্যতা পিছাইয়া নিতেই থাকিবেন। পক্ষান্তরে, তিনি যেদিন তাদেরে দেশে ফিরাইয়া নেওয়া নিরাপদ মনে করিবেন, তখনই বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বীকৃতি পাইবে। শিমলা-চুক্তির পরিকল্পিত উপমহাদেশের চিরস্থায়ী শান্তিকে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

১০ই নভেম্বর–১৯৭২

দ্রব্য-মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি রুধিবে কে?

গত সোমবার ঢাকার সবগুলি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় খুব মোটা হরফে একটি বিবৃতি ছাপা হইয়াছে। বিবৃতিটা ছিল সত্যসত্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিবৃতিদাতা, বিবৃতির বিষয়বস্তু এবং বিবৃতির মর্ম–এই তিন দিক হইতেই। বিবৃতিদাতা ছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিবৃতির বিষয়-বস্তু ছিল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বিবৃতির মর্ম ছিল হুঁশিয়ারি। প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় শক্তিশালী নেতা; দ্রব্য-মূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঘোরতর সমস্যা, এবং উচ্চারিত হুঁশিয়ারিটি কঠোর। এই কারণেই আমাদের সংবাদপত্রগুলি ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দিয়াছেন। ঠিকই করিয়াছেন।

কিন্তু যে সভায় প্রধানমন্ত্রী এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছেন, সেটা ছিল আওয়ামী লীগের সভা। সংবাদটির পৃষ্ঠাব্যাপী হেডিং দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সমাবেশেই বুঝি এই হুঁশিয়ারির উচ্চারণ করিয়াছেন। আমি খুবই পুলকিত হইয়াছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির দাম আছে। যথাস্থানেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। আমার পুলকিত হওয়ার কারণ ছিল এটাই। কিন্তু ও আল্লাহ! সংবাদটির ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম এটা ব্যবসায়ীদের সভা নয়। সে স্থলে এটা আওয়ামী লীগের সভা। তা-ও আবার ঢাকা শহরের আওয়ামী লীগ। চোখ কচলাইয়া সমবেত ভদ্রলোকদের নাম পড়িতে লাগিলাম। যাঁদের নাম পাইলাম তাঁরা কেউ ব্যবসায়ী বলিয়া আমার জানা ছিল না। কাজেই তাঁদের কেউ কালোবাজারি মজুতদারি করিতেছেন, এটা ধরিয়া লইবার উপায় নাই। অথচ বঙ্গবন্ধু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছেন। মুনাফা-শিকারী, মজুতদারী, কালোবাজারী ও অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বঙ্গবন্ধু বলিয়াছেন, 'অবিলম্বে ব্যবসায়ীরা যদি তাদের চরিত্র সংশোধন না করেন তবে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" গত যুদ্ধে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট হইতে কোনও দ্রব্যের বেশি মূল্য না নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন।

আমাদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধি মতে ব্যবসায়ীদের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিলেই বেশি কাজ হইত। ইতিপূর্বে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন মাধ্যমের বিবৃতি-ভাষণে বঙ্গবন্ধু মুনাফাখোর, মজুতদার ও কালোবাজারীদেরে উদ্দেশ্য করিয়া এমনি ধরনের বহু হুঁশিয়ারিই উচ্চারণ করিয়াছেন। ফলের মধ্যে হইয়াছে এই যে, দ্রব্যমূল্য প্রতি হুঁশিয়ারিতে এক এক ধাপ ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। কাজেই আমি আশা করিয়াছিলাম, বঙ্গবন্ধু নিজে এবার ব্যবসায়ীদের একটি সম্মিলনী আহ্বান করিয়া মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা লইয়া তাঁদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করিবেন; দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিবার সরকারী

স্কিমসমূহ তাঁদের সামনে তুলিয়া ধরিবেন; সে সব স্কিম প্রয়োগে ব্যবসায়ীদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করিবেন; বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে সরকারের সহযোগিতায় ব্যবসায়ীদের নিজেদের দ্বারা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধক কমিটি গঠন করাইবেন এবং সর্বশেষে ঐ কাজে সরকারের সাথে সহযোগিতা না করিলে অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি-দেওয়া হইবে বলিয়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিবেন।

এটা না করিয়া বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভা ডাকিয়া এই হুঁশিয়ারি করিলেন কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তা-ও আবার গণ-ভবনে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণের স্থান ঢাকার শহর। সেই 'বাউন্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি'র ঢাকা শহর। গণ-ভবন নয়। আওয়ামী লীগ নেতারাই কালোবাজারী, মুনাফাখোরি করিতেছেন, আশা করি বঙ্গবন্ধু তা মনে করেন না। এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের বিপুল মেজরিটি আওয়ামী লীগার। সেদিক হইতে বিচার করিলে আওয়ামী লীগারদের মধ্যেও কালোবাজারী ও মুনাফাখোর অনেক আছেন। অনেক বলি কেন, বেশিই আছেন। গত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখিয়াছি, ঢাকাসহ সব শহরেই আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে। বিরোধী পক্ষের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ যে সামান্য দুই-একটি আসন হারাইয়াছেন, তার সবগুলিই অজ পাড়াগাঁয়ে। কালোবাজারী ও মুনাফাখোররা সবাই শহরে বাস করেন, পাড়াগাঁয়ে করেন না। অতএব 'দুই-এ-দুই-এ চার' এই নিয়মে প্রমাণিত হইল যে কালোবাজারী মুনাফাখোরদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগের। তাঁরা প্রায় সবাই আগে হইতেই ব্যবসায়ী ছিলেন। গত নির্বাচনের সময় যে সব আওয়ামী লীগার ব্যবসায়ী ছিলেন না, স্বাধীনতার পরে তাদেরও অনেকে লাইসেন্স বাগাইয়া ব্যবসায়ী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসায়ী হইবার আগেই মুনাফা-খোর কালোবাজারী হইয়া গিয়াছেন। অতএব আবার 'দুই-এ দুই-এ চার' নিয়মে প্রমাণিত হইল যে, আওয়ামী লীগারদের মধ্যে দুই ক্যাটিগরির কালোবাজারী আছেন; এক দল ব্যবসায়ের থ্রুতে কালোবাজারী হইয়াছেন। অপর দল কালোবাজারের থ্রুতে ব্যবসায়ী হইয়াছেন। কাজেই কালোবাজারীদের বিপুল মেজরিটিই আওয়ামী লীগার, তাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ গোটা দেশটাই যখন আওয়ামী লীগার, তখন সব কালোবাজারীই আওয়ামী লীগার, এ কথা বলিতেই দোষ কি?

অতএব বঙ্গবন্ধু তাঁর তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞান ও অন্তর্দর্শী উৎপ্রেরণা বলে ঠিকই বুঝিয়াছেন যে, যদি কেউ কালোবাজারী বন্ধ করিতে, অন্ততঃ রোধ করিতে পারেন, তবে আওয়ামী লীগাররাই পারেন। কাজেই তিনি আওয়ামী লীগারদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন। তিনি আওয়ামী লীগারদেরে 'নিঃস্বার্থভাবে' জনগণের সেবা করিবার উপদেশও দিয়াছেন। এই 'নিঃস্বার্থভাবে' কথাটা তিনি ঠিক বলেন নাই। কথাটার যথেষ্ট অপব্যবহার করা হইয়াছে। কথায় কথায় শরীরের 'শেষ রক্তবিন্দু' দিবার মতই এটারও মূল্য আগেই কমিয়া গিয়াছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে 'নিঃস্বার্থ' ও 'শেষ

রক্তবিন্দু'র মূল্য আরও নিম্নগতি লাভ করিয়াছে। অতীতের নেতাদের ব্যবহারে 'নিঃস্বার্থ' ও 'নিজ স্বার্থ' কথা দুইটায় তালগোল পাকাইয়া যাইত। নেতারা যখন কর্মীদের 'নিঃস্বার্থে' কাজ করিতে বলিতেন, তখন নিজেরা 'নিজ স্বার্থে' কাজ করিতে থাকিতেন। তাঁরা কর্মীদের যখন শরীরের 'শেষ রক্তবিন্দু' দিয়া সংগ্রাম করিতে বলিতেন, নিজেরা তখন সকলের 'শেষ রক্তবিন্দু' দিবার জন্য আপাতত: সেনাপতির মতই যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পিছনের কাতারে থাকিতেন।

আওয়ামী লীগ-নেতৃত্ব অমন অতীত নেতৃত্বের প্রতিবাদ। সংগ্রামী আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সকল সংগ্রামে সর্বপ্রকার ত্যাগে কর্মীদের আগে আগে চলেন। আগের দিনে মুসলিম লীগ নেতারা কর্মীদের 'মদিনার খলিফাদের' অনুসরণ করিতে বলিতেন আর নিজেরা 'বাগদাদের খলিফাদের' অনুসরণ করিতেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব নেতা ও কর্মীর এই পার্থক্যের অবসান ঘটাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই এ নেতৃত্বের পিছনে গোটা দেশবাসী কাতারবন্দী হইয়াছে। আওয়ামী-নেতৃত্ব যে দিন এ গুণ হারাইবেন, কর্মীরা সেদিন স্বতঃই আওয়ামী নেতাদের পিছনে হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন।

কাজেই আওয়ামী লীগ কর্মীদের শুধু নিঃস্বার্থভাবে দেশ সেবার কথা বলিলে চলিবে না। তাঁদের সামনে কর্মপন্থা তুলিয়া ধরিতে হইবে। বর্তমান সরকার তাদের সামনে কি কর্মপন্থা তুলিয়া ধরিয়াছেন? দ্রব্যেমূল্যের উর্ধ্বগতিতে গোটা দেশবাসীর সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ আওয়ামী-কর্মীও দুর্দশা পোহাইতেছেন। এই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার উপায় কি, কেন এই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক আকাশ-চুম্বী দ্রব্যমূল্য, আওয়ামী কর্মীদের তা বুঝাইয়া দিবার কোনও স্টাডি-সেল ও প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে কি? ছাত্র-কর্মীদের মধ্যে যারা অর্থ বিজ্ঞানের ছাত্র, যারা পুঁথি-পুস্তকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইনফ্লেশন ও ডিমাণ্ড এণ্ড সাপ্লাই এবং সমাজবাদী অর্থনীতির প্রাইস স্ট্রাকচার ও কমডিটি প্রাইস পলিসির কথা দিন-রাত পড়িতেছেন, তারাও বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির নাগাল পাইতেছেন না।

তার চেয়েও সহজ কথায় আসা যাউক। প্রায় চার মাস আগে সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন, মূল্যবৃদ্ধি কমিবার সাধু উদ্দেশ্যে সরকার অতি সত্বর প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ বা ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিতেছেন। এই চার মাসে সরকার ইউনিয়নে ইউনিয়নে ত দূরের কথা শহরে শহরেও এক একটি করিয়া ফেয়ার প্রাইস শপও খুলেন নাই। এমনকি রাজধানী এই ঢাকা শহরেও না। খুলেন নাই মানে খুলিতে পারেন নাই। পারিবেন যে না, তা আমরা ঐ ঘোষণার সময়েই বুঝিয়াছিলাম। অনেকেই বলিয়াছিলেন যে, সরকার যদি প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া ন্যায্যমূল্যের দোকানের কথা না ভাবিয়া রাজধানী হইতে শহরমুখী বাস্তবানুগ পথ ধরিবার চেষ্টা করিতেন তবে সেটা সম্ভবও হইত। জনগণকে অংশতঃ রিলিফ দেওয়াও যাইত। পল্লী অঞ্চলে জনপ্রিয়তা হারাইবার ভয়ে সম্ভবতঃ মন্ত্রীরা এ ধরনের কাজে হাত দিতে বা ঘোষণা করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু এটা তাদের ভুল। শহরে ফেয়ার প্রাইস শপ

খুলিলে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা তাতে অসন্তুষ্ট হইত না। কারণ, একখানে ঐ ধরনের দোকান খোলা হইলে সব জায়গাতেই তার সুফল পাওয়া যাইত। এটাই অর্থনীতির নিয়ম। একটি ন্যায্যমূল্যের দোকানের প্রভাবেই সকল দোকানের জিনিসের দাম খানিকটা কমিয়া আসে।

অনেকের ধারণা, যথেষ্ট দ্রব্যই নাই। ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিয়া সরকার তাতে জিনিস সরবরাহ করিবেন কোথা হইতে? এ ধারণাটি ঠিক নয়। যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য না থাকিলেও একেবারেই নাই, এ কথা ঠিক নয়। এমন কি যথেষ্ট পরিমাণে নাই, এ ধারণাও ভুল। জিনিস না থাকিলে বা কম থাকিলেই জিনিসের বাজারে আগুন লাগে, অর্থ-বিজ্ঞানের এ কথাও আমাদের দেশে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। একটি মাত্র নজির লওয়া যাক। আটা-চাউলের কথাটাই ধরা হউক।

যুদ্ধ-বন্যার ক্ষয়-ক্ষতির ফলে এবার আমাদের খাদ্য-ঘাটতি ধরা হইয়াছে ত্রিশ লক্ষ টন। তার মানে মাসে আড়াই লক্ষ টন। সরকারী হিসাব মতেই আমরা গত দশ মাসে বিদেশ হইতে আটা-চাউল পাইয়াছি পঁচিশ লক্ষ টন। তার মানে মাসে ঠিক আড়াই লক্ষ টন। আড়াই লক্ষ টন ঘাটতির জায়গায় সাহায্য পাইলাম আড়াই লক্ষ টন। দরকারের চেয়ে কম পাইলাম না। তবু চাউলের দাম মণপ্রতি চল্লিশ হইতে ছয় মাসের মধ্যে ধাপে-ধাপে একশত টাকা, বরং তারও বেশি, হইল কেমন করিয়া? অর্থ-বিজ্ঞানে এর জবাব পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যাখ্যা ছিল, চোরাচালানই চাউলের এই মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। অভিযোগ করা হইত, ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার প্যাক্টের ফাঁক দিয়া সব চাউল সীমান্ত পার হইয়া যাইতেছে। সরকার ছয় মাস অতিবাহিত করিয়াছেন এই চোরাচালানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া। চোরাচালান না হইলে অপরাধী নিশ্চয়ই মজুতদার। সরকার মজুতদার মুনাফাখোরদেরে কঠোর শাস্তির ধমক দিলেন। খাদ্যমন্ত্রী চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিবার হুমকি দিলেন। তাঁদের প্রত্যেক ধমকে মণপ্রতি দশ-বিশ টাকা দাম বাড়িয়া গেল। এই সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধার ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রী যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। নিতান্ত বাস্তববাদী লোকের মতই বাজার দামের চেয়ে দু-পাঁচ টাকা বেশি করিয়াই উপরের সীমা নির্দেশ করিলেন। ঘোষণা মাত্রই চাউলের বাজার দামে ও মন্ত্রীর নির্দেশিত মূল্যের ফাঁকটা ফিল্ আপ্ হইয়া পাঁচ টাকা উপরে চলিয়া গেল। মন্ত্রী মহোদয় তখন আরও দশ-পনর টাকা উপরে গিয়া সীমার খুঁটি গাড়িলেন। বলিলেন, 'চাউলের দাম এর বেশি বাড়িতে দিব না।' কিন্তু খুঁটিতে বন্যার পানি ফিরে না। চাউলের দামের বন্যার পানিও খুঁটির ওপাশে চলিয়া গেল। স্বাধীনতার আমলে চাউলের দাম নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসের ফলাফল দেখিয়া পাকিস্তানী আমলের পাটের দাম নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসটার কথা মনে পড়িল। ফল হুবহু একই রকম। পার্থক্য শুধু এই যে, পাটের ব্যাপারে ছিল সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধা, আর চাউলের ব্যাপারে হইল সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধা। তার মানে পাটের দামে খুঁটি গাড়া হইত নিচে, আর চাউলের দামে খুঁটি গাড়া হইতেছে উপরে। আজকাল চাউলের দামের জোয়ারের পানি যেমন উপরের খুঁটি ডিংগাইয়া যায়, পাকিস্তানী আমলে পাটের দামের ভাটার পানি তেমনি নিচের খুঁটি ডিংগাইয়া যাইত। আগের দিনে পাটের দাম বাঁধা ও বর্তমানে চাউলের দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অনেকটা

পার্থক্য এই যে, আগে সরকারীভাবে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং ঐ নির্ধারিত দামের কমে ক্রয়-বিক্রয়কে দণ্ডনীয় করা হইত। বর্তমানে চাউলের দাম নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতায় বলেন : 'সরকার অত টাকার বেশি চাউলের দাম উঠিতে দিবেন না।' যেখানে ব্যবসায়ীরা দণ্ডের ভয়েও সরকারী আদেশ অমান্য করিতে কসুর করেন নাই, সেখানে মন্ত্রী বিশেষের সদিচ্ছা অনুসারে তাঁরা কাজ করিবেন, এমন আশা সরকারও করিতে পারেন না। এটা জানিয়াও সরকার কেন খাদ্য-দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেন না, তার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন দেশে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য বিদ্যমান আছে বলিয়া সরকার নিজেরাই বলিতেছেন। ব্যাপারটা আরও রহস্যজনক হইয়া উঠিয়াছে এই কারণে যে, আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান ঘোষণা করিয়াছেন, সীমান্তের চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তার উপর অনেক জেলাতেই আমন ধান কাটা শুরু হইয়াছে। তা সত্ত্বেও চাউলের দাম একশ' টাকা মণের নিচে আসে নাই।

আটা-চাউল সম্বন্ধে যে কথা, অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথাই সত্য। এক লবণ ও শুকনা মরিচ ছাড়া আর সব খাদ্য-দ্রব্যের দামই গত বছরের তুলনায় চারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারী উদ্যোগে সমুদ্দুরের মাছ আমদানির পরও মাছ আট-দশ টাকা সের বিক্রয় হইতেছে। সকল প্রকার গোশতের বাজারও গত বছরের দ্বিগুণ। ভারত ও জাপান হইতে দশ কোটি টাকার কাপড় আমদানীর পরেও কাপড়ের বাজারে আগুন। সত্য বটে, দেশের এই দুর্দশার দিনেও পঞ্চাশ হইতে একশ টাকা গজের কাপড় কিনিবার লোকও কিছু কিছু আছেন। কিন্তু গরীব জনসাধারণের অবস্থা কি? তারা এক টাকার গামছা পাঁচ টাকায়, পাঁচ টাকার লুঙ্গি পঁচিশ টাকায়, আর দশ টাকার শাড়ী চল্লিশ টাকায় কিনিবে কি দিয়া? লুঙ্গি-গামছা-শাড়ী ত দেশের তাঁতেই প্রস্তুত হয়। প্রয়োজনমত সূতা সরবরাহ হইলে এসব জিনিসের দাম এমন বাড়িতে পারিত না। ঠিকমত সূতা সরবরাহ হয় না কেন? সূতা তৈয়ারির মিলও ত আমাদের দেশেই কয়েকটি আছে। কাপড়ের কলও আছে প্রচুর। তবে কি এসব মিলে কাজ হইতেছে না? সরকার যে বলিতেছেন, সব মিলে শতকরা পঁচাত্তর-আশি ভাগ কাজ শুরু হইয়াছে, এ কথায় কি কোনও গলদ রহিয়াছে?

মোট কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় দেশবাসীর জীবনে যে অভাবনীয় দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে সরকার তা জানেন। কিন্তু তার প্রতিকারে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতে 'কঠোর শাস্তির' ধমক দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যাইতেছে না। ফলে যুগপৎভাবে দেশবাসীর দৈহিক ও নৈতিক সাংঘাতিক অধঃপতন ঘটিতেছে দ্রুতভাবে। জনগণ খাদ্যাভাবে আজও মরে নাই সত্য, স্বাস্থ্য হারাইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সমাজের সকল স্তরের লোক, বিশেষতঃ অল্প বেতনের সরকারী-বেসরকারী কর্মচারীরাও নিতান্ত প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়া অসদুপায়ে রোজগারের পন্থা দেখিতেছে। এ সবের আশু প্রতিকার দেশবাসী চায়। সরকারও চান।

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে, এটা করিবে কে?

১৭ই নভেম্বর, ১৯৭২

আমাদের নয়া রাষ্ট্রের জীবনে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব

আমাদের দেশের সাধারণ নির্বাচনের আর মাত্র তিন মাস বাকি। একটা সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য এমনিতেই মাত্র তিনমাস অতি অল্প সময়। আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় তিন মাস সময় আরও বেশি কম। আমাদের দেশ একটি নয়া রাষ্ট্র। মাত্র বছর খানেক আগে আমরা স্বাধীনতা হাসিল করিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের মাত্র বছর খানেকের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন করা খুব কম দেশের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তার উপর আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি যুদ্ধ করিয়া। শুধু এই যুক্তিতেও দেশের সাধারণ নির্বাচন আরও অনেক দিন পিছাইয়া দেওয়া যাইত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়াছে আওয়ামী লীগ। দুই বছর আগে এক সাধারণ নির্বাচনে এই আওয়ামী লীগই বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করিয়াছিল। সেই নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আজ দেশ শাসন করিতেছেন। এঁরা ইচ্ছা করিলে আরও অন্ততঃ দুইটা বছর ন্যায় ও যুক্তিসংগতভাবেই দেশ শাসন করিতে পারিতেন। কেউ তাদের প্রতিনিধিত্বহীনতার দায়ে অপরাধী করিতে পারিতেন না।

কিন্তু আওয়ামী লীগ সে দিকে না গিয়া নূতন নির্বাচন দিয়াছে। নির্বাচিত হইবার পর এক বছর গিয়াছে স্বাধীনতা যুদ্ধে। স্বাধীনতা লাভের পর বছর না ঘুরিতেই তাঁরা একটি শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা ও গণ-পরিষদ দিয়া তা গ্রহণ করাইয়াছেন। আগামী ১৬ ডিসেম্বর সে সংবিধান চালু হইবে। আগামী মার্চ মাসে নয়া সংবিধান মোতাবেক সাধারণ নির্বাচন হইবে। এক বছরের মধ্যে সংবিধান রচনা সমাপ্ত করার জন্য আওয়ামী নেতৃত্বকে কৃতিত্ব দিতে বিরোধীপক্ষের আপত্তি আছে। তাঁদের মতে, বাংলাদেশ একটি এক জাতিক, এক কৃষ্টিক ঐকিক রাষ্ট্র হওয়ায় এর সংবিধান রচনায় কোনও জটিলতা ছিল না। কাজেই এ দেশের সংবিধান এক বছর কেন, তার কম সময়ে রচনা করিলেও তাতে অতি-প্রশংসা পাইবার কোনও কারণ ঘটিত না। বিরোধী পক্ষের এ কথা মানিয়া লইলেও এবং সে জন্য সংবিধান রচনার ব্যাপারে আওয়ামী নেতৃত্বকে প্রশংসা করা না গেলেও এত তাড়াতাড়ি সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রশংসা করিতেই হইবে। দুই-তিন বছর আয়ু থাকিতেও যে রুলিং পার্টি নয়া নির্বাচন দেন, তাঁদের তারিফ করিতে কারও কৃপণতা করা উচিত নয়।

কিন্তু বিরোধী দলসমূহের কেউ কেউ এ ব্যাপারেও আওয়ামী লীগকে কৃতিত্ব দিতে রাজী নহেন। তাঁরা বলিতেছেন, দেরিতে ইলেকশন দিলে আওয়ামী লীগ হারিয়া যাইবে,

এই ভয়েই নেতারা তাড়াতাড়ি নির্বাচন ঘোষণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আওয়ামী নেতারা বলিতেছেন, স্বাধীনতা লাভ ও সংবিধান রচনার পরে দেশবাসীর নিকট হইতে নূতন নির্দেশ, ফ্রেশ ম্যানডেট, দিবার জন্যই তারা মেয়াদের আগেই নির্বাচন দিয়াছেন। দুই পক্ষের কথাই সত্য হইতে পারে। সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার উদ্দীপনার রেশ এবং সংবিধান পাইবার উল্লাসের প্রতিধ্বনি বিলীন হইবার আগে গণমন নিশ্চিতভাবেই আওয়ামী লীগের অনুকূল। এটা তাজা থাকিতে থাকিতে নির্বাচন দিয়া তার সুবিধা গ্রহণ করার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানী পরিবেশে ছয় দফাভিত্তিক নির্বাচনে জিতিয়া ছয়দফা হাসিলের সংগ্রামে স্বাধীনতা হাসিল করায় যদি কোথাও কারও মনে কোনও দ্বিধাসন্দেহ ও অস্পষ্টতা থাকিয়া থাকে, তবে তা দূর করার উপায় হিসাবে নূতন ম্যানডেট নেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। আওয়ামী নেতাদের কেউ কেউ বলিতেছেন, আগামী নির্বাচনকে তাঁরা সংবিধানের উপর রেফারেণ্ডাম বিবেচনা করিবেন। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতিলে তাতে সংবিধানটা র‍্যাটিফাইড হইয়া যাইবে।

সুতরাং আগামী নির্বাচনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আওয়ামী লীগ অথবা বিরোধী দল যে পক্ষের কথাই সত্য হউক, এতে একটা সর্বসম্মত সত্য প্রমাণিত হইতেছে। সে সত্য এই যে, জনগণের উপর আওয়ামী লীগের আস্থা আছে। গণতন্ত্রী রাজনৈতিক দলের এটাই সবচেয়ে বড় গুণ। এই গুণের অধিকারী না হইয়া যারা জনগণের ভাল করিতে চান, তাঁরা জনহিতৈষী খুব ভাল মানুষ হইতে পারেন কিন্তু তাঁরা গণতন্ত্রী নন। পক্ষান্তরে, যে পার্টি নিজেদের শক্তির জন্য জনগণের উপর নির্ভর করেন, সরকার হিসাবে তাঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি যতই থাকুক না কেন, সরকার পরিচালনায় তাঁরা যতই ভুলভ্রান্তি করুন না কেন, তাঁরাই গণতন্ত্রী। জনগণও তাঁদের ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া নির্বাচনে তাঁদেরকেই ভোট দিয়া থাকে। মূলতঃ তাঁরা ভোটারদের প্রতিনিধি-সরকার। নির্বাচনে আস্থাহীন বিপ্লবী দল হইতে এঁদের পার্থক্য এইখানেই।

কিন্তু সে নির্বাচন সত্য-সত্যই নির্বাচন হওয়া চাই। নির্বাচিত লোকদের সত্য-সত্যই ভোটারদের প্রতিনিধি হওয়া চাই। এককথায়, নির্বাচনটা হওয়া চাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ; 'ফ্রি এণ্ড ফেয়ার'। এ সম্পর্কে আমি আগেকার এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আজ শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, আগামী নির্বাচনটা আমাদের নবজাত রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য একাধিক দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ। শাসক দল, অপজিশন দল, ছাত্র, তরুণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সকলকে এই তাৎপর্য ও গুরুত্বটা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। কারণ সেই উপলব্ধির উপর নির্ভর করিবে পজিশন ও অপজিশন উভয়পক্ষের রাজনৈতিক আচরণ। সে আচরণ প্রকাশ পাইবে উভয় পক্ষের প্রচার-প্রচারণার ধারায় ও প্রকৃতিতে। সে প্রচার-প্রচারণার ধারা ও প্রকৃতি রূপলাভ করিবে নির্বাচনের ফলে। নির্বাচনের ফল নির্দেশ করিবে নবজাত এই শিশু রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। এ

সম্পর্কে উভয় পক্ষের সতর্কতার প্রয়োজন এখনই। হাতে সময় সত্যই অল্প। নির্বাচনের মামুলি ডামাডোলে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সেগুলি খণ্ডন ও দূর করার যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে নাই। কাজেই বিভ্রান্তি যাতে খুব কম সৃষ্টি হয়, সেদিকে পজিশন অপজিশন উভয় দিককার নেতাদের সজাগ দৃষ্টি থাকিতে হইবে। ভোটারদেরে বিশেষভাবে, জনগণকে, সাধারণভাবে সে কথা বুঝাইতে এবং বুঝিতে দিতে হইবে।

ইতিমধ্যেই নেতাদের কেউ কেউ এবং বুদ্ধিজীবিদের অনেকে, বলিতে লিখিতে শুরু করিয়াছেন ; (১) বাংলাদেশের ভোটাররা বরাবর এক বাক্সে ভোট দেন, এবারও তাই দিবেন। (২) বাংলাদেশের ভোটাররা বরাবর ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, এবারও তাই দিবেন। (৩) একমাত্র আওয়ামী লীগই সংগঠিত দল, আর সব দলই হয় বিভক্ত ও অসংগঠিত, নয় ত নিতান্ত নবজাত। ফলে আওয়ামী লীগের বিজয় সুনিশ্চিত। (৪) এবারকার নির্বাচনে ভোটারদের সামনে সুস্পষ্ট কোন ইস্যু না থাকায় ভোটাররা প্রার্থীদের গুণাগুণ বিচার করিয়া ভোট দিবেন। ফলে পার্টি-নমিনির চেয়ে এবার ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রার্থীদের অধিকতর জয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (৫) সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হইবার মতো পরিবেশ দেশে আজও সৃষ্টি হয় নাই। কাজেই নির্বাচন করিয়া লাভ হইবে না।

এই পাঁচটি কথাই বিভ্রান্তিকর। সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিকূল। কথাগুলির মধ্যে আংশিক সত্য আছে বলিয়া এগুলি আরও বিপজ্জনক। এসব কথার যোগফল এই যে, এতে ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন দল নিরুদ্যম হইয়া পড়িবেন। ভোটাররা এই নির্বাচনে উদাসীন হইয়া পড়িবেন। ভোটার সংখ্যার অনুপাতে ভোটদাতার সংখ্যা কমিয়া যাইবে। প্রার্থী ও ভোটারের পাঠশালা হিসাবে আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব হ্রাস পাইবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের কথা ভাবা ও বলা গণতন্ত্রী কোন দেশহিতৈষীর উচিত নয়। সত্য হইলেও না।

অথচ কথাগুলি সত্য নয়। এক ও দুই নম্বর দফায় বর্ণিত অভিমত দুইটি ভিত্তিহীন। ১৯৪৬, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছিল ইস্যু ভিত্তিক, প্রায় রেফারেণ্ডাম। 'হ্যাঁ' ও 'না' ই ছিল নির্বাচনের আসল উত্তর। কাজেই বাংলার ভোটাররা ঐ তিনটি নির্বাচনে এক বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন। তাই বলিয়া সব নির্বাচনেই তাঁরা ঐরূপ করিবেন, এটা অনুমান করা অন্যায়। ঐ কথার দ্বারা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের ভোটারদের গণতন্ত্রের অযোগ্য রাজনৈতিক চেতনাহীন একপাল 'মব' বলা হয়। কথাটা সত্য নয়। বাংলার জনগণ রাজনৈতিক চেতনায় অনেক উন্নত দেশের জনগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এটা অনেক বিদেশী প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ঐ তিনটা নির্বাচনের আগে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন হইয়াছিল তাতে বাংলার মুসলিম ভোটাররা কৃষক-প্রজা-পার্টি ও মুসলিম লীগকে

প্রায় সমান-সমান আসন দিয়াছিলেন। ক্ষমতাসীন দলকে বাংলার ভোটাররা ভোট দেন না, এটাও ঠিক নয়। ১৯৫৭ সালে তেরটি উপ-নির্বাচনের বারটিতেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করিয়াছিলেন।

তিন নম্বর দফার অভিমতটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে জিতিয়াছিল, সেই হেতুতে মুক্তিসংগ্রামে স্বভাবতঃই নেতৃত্ব দিয়াছিল, এবং ঐ কারণে বর্তমানে গবর্ণমেন্ট চালাইতেছেন। শুধু এই কারণেই বলা যায় না যে, আওয়ামী লীগই বর্তমানে একমাত্র সুসংগঠিত দল। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম করিবার কু-মতলবেই এ ধরনের কথা বলা হইতেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন, এটা যেমন তাঁদের পক্ষে সুবিধা, তেমনি এটা তাঁদের পক্ষে অসুবিধা। দেশের সব দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার জন্য ক্ষমতাসীন দলকে দোষী করা যেমন সহজ, ভোটারদের তা বিশ্বাস করানও তেমনি সহজ। বস্তুতঃ তাঁদের হাতে ক্ষমতা যতটা, দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক কঠিন। তাছাড়া আওয়ামী লীগ আজ সরকারী পার্টি হিসাবে যতটা শক্তিশালী, গণপ্রতিষ্ঠান হিসাবে ততটা সংহত না। প্রায় সাত মাস আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটি, কাউন্সিল, জিলা ও মহকুমা কাউন্সিল সব ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাত মাসেও নির্বাচিত কাউন্সিল, ওয়ার্কিং কমিটি ও অফিস বেয়ারার মনোনীত কর্মকর্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন নাই। এ সব নির্বাচনের আগে যে প্রাইমারী মেম্বর তালিকাভুক্ত করিতে হয়, তা আজও করা হয় নাই। ফলে আওয়ামী লীগ আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি মনোনীত সংস্থা। আওয়ামী লীগের তেইশ বছরের জীবনে এই প্রথম এটা এক ব্যক্তির মনোনীত প্রতিষ্ঠান হিসাবে চলিতেছে। বঙ্গবন্ধু অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী। তাঁর আস্থাভাজন লোকেরাও স্বভাবতঃই জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার কথা। কিন্তু অবস্থাগতিকে তা হয় নাই। বঙ্গবন্ধু আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বটা এমন কঠিন ও জটিল যে, হাজার ক্যারিসমেটিক নেতাও সেখানে জনপ্রিয়তা রক্ষা করিতে পারেন না। সেজন্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ও সরকারের নেতৃত্ব আলাদা রাখিবার নিয়ম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য এই যে, এখানে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রীত্ব একত্র করা হইয়াছে। পাকিস্তানে ঘটিয়াছিল এবং সে কারণে মুসলিম লীগের পতন ঘটিয়াছিল, বাংলাদেশে তাই ঘটিয়াছে। মুসলিম লীগের বিপদ আওয়ামী লীগকে না পাইয়া বসে, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। সে যাই হউক, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের পজিশন এই যে, তাঁরা ক্ষমতায় আছেন বলিয়াই সব ভোট তাঁরাই পাইবেন, এটাও যেমন ঠিক নয়, ঐ কারণে তাঁরা মোটেই ভোট পাইবেন না, এটাও তেমনি ঠিক নয়। এটা নির্ভর করিবে, আগামী তিন মাসে পজিশন ও অপজিশন দলসমূহের গণতান্ত্রিক সদাচরণের

উপর। সে সদাচরণ হইতে হইবে দূরদর্শী। ক্ষমতাসীন দলের সদাচরণ হইবে নির্বাচনে সরকারী ক্ষমতা, যানবাহন ও প্রচারযন্ত্র ব্যবহার না করা এবং নিরংকুশ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্বন্ধে অপজিশন দলসমূহের মনে আস্থা সৃষ্টি করা। আজ অপজিশন দলসমূহের সদাচরণ হইবে যে কোনও ছুতায় নির্বাচন ভণ্ডুল করার অথবা মারি অরি পারি যে প্রকারে নীতিতে আওয়ামী লীগকে গদিচ্যুৎ করার চেষ্টা না করা। উভয়পক্ষের এই সদাচরণই খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতির ভবিষ্যত নির্ধারক। একদিকে আওয়ামী লীগ যদি তার বর্তমান মর্যাদা ও সরকারী ক্ষমতা খাটাইয়া কতিপয় নেতার কথিত মত 'নির্বাচন সুইপ' করিয়া ফেলেন এবং '৭০ সালের নির্বাচনের মতই শতকরা নিরানব্বইটি আসন দখল করেন, তবে সেটা হইবে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বিকাশের প্রতিবন্ধক। যে কারণে বর্তমান পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে হইল, আগামী পরিষদ এক পার্টি হাউস হইলে ওটাও সে কারণে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। না দিলে দেশের সমূহ বিপদ ঘটিবে।

অপরদিকে অপজিশন দলসমূহকেও যে কোন উপায়ে আওয়ামী লীগকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

বাংলাদেশকে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পথে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার ইহাই একমাত্র পথ। ক্ষমতাসীন দলকে গদিচ্যুত করিয়া নিজেরা ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা অপজিশন দলসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকার, তা সত্ত্বেও আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিতেছি এই জন্য যে, দেশের সামগ্রিক অবস্থা বর্তমানে শাসক দলের অনুকূলে নয়। অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বহু ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে। দ্রব্যমূল্যের অভাবনীয় ঊর্ধ্বগতি, শান্তি-শৃঙ্খলার অধঃপতন, শিল্প-বাণিজ্যে বিপর্যয় ও সরকারী অফিস-আদালতে অরাজকতা, সবকিছু মিলিয়া গণজীবনে চরম দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে। এসব দূরবস্থার কতটা নয়া রাষ্ট্রের জীবনে স্বতঃই অপরিহার্য, আর কতটার জন্য সরকার দায়ী, তা বাছাই করা জনগণের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে এর সবগুলির জন্যই জনগণ সরকারকেই দায়ী করিতেছে। সেই পরিমাণে আওয়ামী লীগ তার পূর্ব জনপ্রিয়তা হারাইতেছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারেরও প্রধান হওয়ায় এই অজনপ্রিয়তা তাঁকেও স্পর্শ করিতেছে। এ অবস্থায় অপজিশন দলসমূহের পক্ষে সরকার ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোটারদের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা খুবই সহজ হইয়াছে। সহজ বলিয়াই অপজিশনসমূহের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছে। সরকার ও আওয়ামী নেতাদের অনুসৃত নীতি ও দুর্নীতি উভয়টাকেই আক্রমণ করিবার অধিকার অপজিশন দলের আছে। আছে বলিয়াই তাঁদের সতর্কতার আরও বেশি প্রয়োজন হইয়াছে। আওয়ামী সরকারের অনুসৃত সমস্ত অভ্যন্তরীণ নীতির নিন্দা করুন, তাঁদের 'জাতীয়করণ' নীতি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সর্বনাশ করিয়াছে বলুন, প্রশাসনেও

রাজনীতি আমদানী করিয়া আওয়ামী লীগ শাসন-সৌকর্যের বারটা বাজাইয়া দিয়াছে বলুন, এমনকি পররাষ্ট্র নীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার সাম্রাজ্যবাদী ও প্রসারণবাদী ক্যাম্পের লেজুড় হইয়া গিয়াছেন, তাও বলুন, কিন্তু একটি কাজ করিবেন না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সেকিউলার ক্যারেক্টার নষ্ট করিবেন না। আর এ দেশের নাগরিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন না। এই একটি মাত্র ব্যাপারেই অপজিশন দলসমূহকে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। একদিকে বিষয়টি যেমন নাজুক ও আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎনির্ধারক, অপরদিকে, আমাদের সরকার ও আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকে ভুলও করিয়াছেন এখানেই বেশি। বাংলাদেশের ভোটারদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবার এটাই হবে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ পন্থা। আগামী নির্বাচনে এই ইস্যুটাই অন্যসব ইস্যুকে তলাইয়া দিতে পারে বলিয়া আমার আশংকা হইতেছে। তাই এ বিষয়ে দেশবাসীকে সাধারণভাবে এবং ভোটার, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র-তরুণ ও পার্টি নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে সচেতন থাকিতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রের সেকিউলার চরিত্রের সাথে সাম্প্রদায়িক মানে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন, বাংলাদেশ-ভারত প্রশ্ন এবং ভারত-বাংলাদেশ পাকিস্তানের মৈত্রীর মাধ্যমে এই উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি ও উন্নতির প্রশ্ন, এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে যে, এর একটি ছাড়া আরেকটি সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রশ্নটি এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা এত আবশ্যক যে, এ বিষয়ে একটি স্বাতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন। আমি আগামী প্রবন্ধে এই বিষয়টিই বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭২

উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি ও জেনারেল এসেম্লির প্রস্তাব

বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর করার ব্যাপারে জেনারেল এসেম্লি যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলাদেশের হিতৈষী কেউ কেউ বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাবের দ্বারা বাংলাদেশের মেম্বর হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাকিস্তানের জয় হইয়াছে বলিয়া সেখানে উল্লাস করা হইতেছে। এই দেখিয়া আমাদের সমর্থকদের মধ্যে কিছুটা নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে।

কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদের হিতৈষী বন্ধুদের আশংকা ও নৈরাশ্য অমূলক। এ বিষয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ তাঁর সর্বশেষ প্রেস কনফারেন্সে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাই ঠিক। তিনি ঠিক ধরিয়াছেন যে, প্রথম প্রস্তাবে জেনারেল এসেম্লি বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর হওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং মেম্বর করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে শর্তহীন সুপারিশ করিয়াছেন। এ প্রসংগে স্মরণ রাখা উচিত যে, জেনারেল এসেম্লির ক্ষমতা এইটুকুই। মেম্বর হওয়ার ব্যাপারে জেনারেল এসেম্লি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে শুধু সুপারিশ করিতে পারেন। মেম্বর করিতে পারেন না। মেম্বর করার পূর্ণ ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের। পক্ষান্তরে, জেনারেল এসেম্লি বা তার এ্যাডমিশান কমিটি সুপারিশ না করিলে নিরাপত্তা পরিষদও নিজ হইতে কোনও রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের মেম্বর করিতে পারেন না। অতএব, আইনগত পরিস্থিতি এই যে, আসলে জেনারেল এসেম্লি বা এ্যাডমিশন কমিটিই মেম্বর করিবার প্রকৃত অধিকারী। জেনারেল এসেম্লি বা এ্যাডমিশন কমিটির সুপারিশের পর নিরাপত্তা পরিষদের কাজটা একটা আইনগত ফর্মালিটি মাত্র। জেনারেল এসেম্লি বা এ্যাডমিশন কমিটি সুপারিশ করিলে নিরাপত্তা পরিষদ স্বতঃই সুপারিশিত রাষ্ট্রকে মেম্বর করিয়া থাকেন। জেনারেল এসেম্লি বা এ্যাডমিশন কমিটির সুপারিশ গ্রহণের পথে বাধা মাত্র একটি। সে বাধা স্থায়ী মেম্বরদের কোনও এক বা একাধিক জনের ভেটো। বাংলাদেশ এ্যাডমিশন কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও আজও যে জাতিসংঘের মেম্বর হইতে পারে নাই, তার কারণ চীনা ভেটো। চীন ভেটো দেওয়ার পরেই বিষয়টা বিবেচনার জন্য জেনারেল এসেম্লিতে আসিয়াছিল। জেনারেল এসেম্লির প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট যে বাংলাদেশের পক্ষে পড়িত, সে ছিল নিশ্চিত। কিন্তু জেনারেল এসেম্লি ঐভাবে বাংলাদেশকে সুপারিশ করিলেও বাংলাদেশ মেম্বর হইতে পারিত না। কারণ, চীনের ভেটো ওত পাতিয়া বসিয়াই ছিল। চীনা প্রতিনিধি গলার জোরে চীৎকার করিয়া বলিতেই ছিলেন যে, চীনের মন মতো প্রস্তাব না হইলে চীন ভেটো মারিতেই থাকিবে।

এই কারণে জাতিসংঘের অধিকাংশ মেম্বর একটা আপোস ফরমুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এদিকে সম্ভবতঃ চীনা প্রতিনিধির উদ্যোগে আর্জেন্টিনাসহ কয়েকটি দেশ যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবের পাল্টা প্রস্তাবস্বরূপ এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার শর্তে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর করা হউক। এই দুইটি প্রস্তাবের মধ্যে একটা সহজ সমন্বয়বিধানের চেষ্টায় জেনারেল এসেম্লির বৈঠক দুই দুইবার মুলতবী রাখা হয়। প্রাইভেট আলোচনার ফলে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি ও যুদ্ধবন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে দুইটি আলাদা প্রস্তাব গ্রহণে সকলে সম্মত হন। সর্বশেষ চেষ্টা হিসাবে চীন-পাকিস্তান দুইটি প্রস্তাবকে ইন্টারলিংকড, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। দুইটি প্রস্তাবই স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে বিনাশর্তে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে পক্ষগণের মধ্যকার তর্কিত বকেয়া বিষয়সমূহ 'পারস্পরিকতা'র ও একে অন্যের প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে 'আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে' নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্য পক্ষগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

দুইটি প্রস্তাবই গুরুত্বপূর্ণ, মেম্বর-রাষ্ট্রসমূহের উপর বাধ্যকর। বাংলাদেশকে মেম্বর করিবার পর তার উপরই এই বাধ্য-বাধকতা বর্তাইবে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঠিকই বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় প্রস্তাবটি বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের মেম্বর হওয়ার পথে বাধা ত নয়ই, বরঞ্চ সহায়ক। বাংলাদেশ জাতিসংঘের মেম্বর হওয়ার আগে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি বাংলাদেশ ত পালন করিতেই পারিবে না, পাকিস্তানও পারিবে না। কারণ, বকেয়া তর্কিত বিষয় মিটাইতে দুইটি পক্ষ লাগিবে। বাংলাদেশ মেম্বর হওয়ার পরই পাকিস্তানের সাথে 'পারস্পরিকতা ও 'একে অন্যের প্রতি সম্মানের' ভিত্তিতে আলোচনায় বসিতে পারে। তার আগে নয়। এই দিক হইতে বাংলাদেশের জাতিসংঘ যাওয়া পাকিস্তানেরও স্বার্থের অনুকূল। ন্যায়তঃ চীনও আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করিতে পারিবে না। দুই প্রস্তাবই সর্বসম্মতিতে পাস হওয়ায় চীনও ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন ধরিয়া নিতে হইবে। কাজেই বাংলাদেশের মেম্বর হওয়ার প্রস্তাবটি যখন নিরাপত্তা পরিষদে আসিবে, তখন চীন আর ভেটো প্রয়োগ করিবে না, এটা নিঃসন্দেহে আশা করা যাইতে পারে। বরঞ্চ সমর্থনই করিবে বলা যাইতে পারে। চীন ও পাকিস্তান দুইটি প্রস্তাবকে ইন্টারলিংক্ড্ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। বলা যাইতে পারে একদিক হইতে তারা সফল হইয়াছে। দুইটি প্রস্তাব 'ইন্টারলিংক্ড্' না হইলেও 'ইন্টারডিপেণ্ডেন্ট' হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রথম প্রস্তাবের উপর 'ডিপেণ্ডেন্ট' হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমটি আগে না করিলে দ্বিতীয়টি করা সম্ভব হয় না। জেনারেল এসেম্লির সভাপতি প্রস্তাব দুইটিকে যে 'ইন্টারডিপেণ্ডেন্ট' বলিয়াছেন, তা তিনি বলিয়াছেন এই অর্থেই। বাংলাদেশের মেম্বরগিরির প্রস্তাবটিই যে এক নম্বর প্রস্তাব, এটাও তাৎপর্যপূর্ণ ও পরিষ্কার অর্থবহ। আগের প্রস্তাব আগে প্রয়োগ করিতে হইবে, এটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা। তাছাড়া, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আগের প্রস্তাব আগে প্রয়োগ না করিলে দ্বিতীয়টিতে

হাত দেওয়াই যায় না। অথচ দুইটি প্রস্তাবই গুরুত্বপূর্ণ: বাংলাদেশ-পাকিস্তানের নিজেদের স্বার্থের জন্য, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও প্রগতির জন্য এবং সমগ্র এশিয়া ও বিশ্বশান্তির জন্য। এই জন্যই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী উভয় প্রস্তাবকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিনি ঠিকই করিয়াছেন। এ বিষয়ে জেনারেল এসেম্ব্লির প্রেসিডেন্ট যে ভাষণ দিয়াছেন, তাতে বাংলাদেশের স্ট্যাণ্ড সমর্থিত হইয়াছে। কারণ, তিনিও কার্যতঃ এই কথাই বলিয়াছেন যে, উপমহাদেশের শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপই হইবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করা ও তাকে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা। বাংলাদেশ সরকার ও বন্ধুরাষ্ট্র ভারত সরকারও আগাগোড়া এই কথাটিই বলিয়া আসিতেছেন।

কথাটি এতই সত্য এবং উপমহাদেশের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য ইহা এমন অপরিহার্য যে, পাকিস্তানের দৃঢ় সমর্থক পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহও আজ তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং প্রকাশ্যভাবে তা স্বীকারও করিতেছেন। এমনকি, নয়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোও আজকাল এই কথাই বলিতেছেন। তিনি সম্প্রতি পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করিয়া জনসভায় এই মর্মে বক্তৃতা করিতেছেন যে, যেখানে পাকিস্তান সকল মুসলিম রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা কামনা করিতেছে, যেখানে পাকিস্তান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রকেও স্বীকৃতি দিয়াছে সেখানে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া শুধু পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতিরই খেলাপ নয়, খোদ পাকিস্তানেরও স্বার্থ বিরোধী।

এই কথাটা বহু আগেই পাকিস্তানের সকল নেতার, বিশেষতঃ জনাব ভুট্টোর বুঝা উচিত ছিল। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ভুট্টোসহ পাকিস্তানের অনেক নেতা ও খবরের কাগজের সম্পাদকরা মাত্র কিছুদিন আগে হইতে বলা শুরু করিয়াছেন: "বাংলাদেশের অভ্যুদয় 'পাকিস্তান কনসেপ্টের' বিরোধী নয় বরং লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ রূপায়ণ।" এই সহজ কথাটাও তাঁদের অনেক আগেই উপলব্ধি কর দরকার ছিল। এমনকি, যুদ্ধে হারিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বীকার করাও তাঁদের উচিত ছিল। তাঁদের বুঝা উচিত ছিল যে, লাহোর প্রস্তাব-বিরোধী যে এক পাকিস্তান স্থাপন করা হইয়াছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানের' সম্মতি ছাড়া তা একদিনও টিকিতে পারে না এবং টিকা উচিত নয়। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে জিতিয়া তদানিন্তন মুসলিম লীগ নেতারা যে 'এক পাকিস্তান' করিয়াছিলেন, সেটা ছিল নির্বাচনের পরে নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করার ঘোরতর অন্যায়। তার উপর সেই 'এক পাকিস্তানের' রাজধানী মেজরিটির দেশ পূর্ব বাংলায় না করিয়া করাচীতে করার দিন হইতেই পূর্ব-বাংলা কার্যতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের কলনী হইয়া গিয়াছিল। জনমত যাচাই করিয়া বা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এ বিষয়ে বাঙালিদের মতামত না লইলেও এবং বাঙালিরা পশ্চিম-কেন্দ্রিক পাকিস্তান মানিয়া লইয়াছে ধরিয়া লইলেও পশ্চিমা নেতাদের সাধারণভাবে এবং সেখানকার ওয়ার লর্ড'দের বিশেষভাবে বুঝা উচিত ছিল, তাঁরা যুদ্ধ করিয়া পূর্ব বাংলা দখল করেন নাই। যুদ্ধ করিয়া যে দেশ দখল করা হয় নাই, জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সে দেশ হাতেও রাখা যায় না, এই সহজ কথাটা কেন তাঁদের মাথায় ঢুকে নাই, এটা বুঝা মুশকিল। মুশকিল

হইলেও পশ্চিমা সমরনায়করা তাই মনে করিতেন। জেনারেল আইউব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবেই উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার নজির দিয়া আমাদের 'সিভিল ওয়ারের' ডর দেখাইয়াছিলেন। '৭১ সালে যা ঘটিয়াছিল তা ছিল সেই 'সিভিল ওয়ার'। পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে এটা সোলজার্স ওয়ার হইলেও 'পূর্ব পাকিস্তানের' পক্ষে ছিল এটা পিপলস ওয়ার। তবু এই যুদ্ধের ফলাফলটা এমন হইয়াছিল যাকে পশ্চিমা সামরিক জান্তার জোর বরাত বলা যাইতে পারে। 'পূর্ব পাকিস্তানে' ভারতীয় বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় সহযোগিতা দিয়াছিল। 'পশ্চিম পাকিস্তানে' পাল্টা আক্রমণ করিয়া ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান ভূখণ্ডের অনেক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। উভয় ফ্রন্টেই ভারতীয় বাহিনীর জয় হইতেছিল। অথচ পূর্ব ফ্রন্টে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথেই ভারত সরকার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে মান্যতা দিলেন এবং পশ্চিম ফ্রন্টে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করিলেন। এক কথায়, পাকিস্তানের নেতারা পঁচিশ বছর যা পারেন নাই, ভারত সরকার তাই করিয়া দিলেন: 'পাকিস্তান'কে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক করিয়া দিলেন। এতে 'পাকিস্তানের'ও লাভ হইল, ভারতেরও লাভ হইল। 'পাকিস্তান' লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ায় সেখানে সামরিক শাসনের আবশ্যকতা দূর হইল এবং সেকিউলার ডেমোক্র্যাসির সম্ভাবনা নিশ্চিত হইল। 'পূর্ব পাকিস্তান'কে অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে কব্জায় রাখার একমাত্র উপায় হিসাবেই পশ্চিমা শাসকরা 'ইসলাম' ও 'মার্শাল ল' চালাইতেছেন, এটা বুঝিতে ভারতীয় দূরদর্শী নেতাদের বাকী ছিল না। এখন 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন হইয়া 'বাংলাদেশ' এই সিকিউলার রাষ্ট্র নাম গ্রহণ করায় এখানেও গণতন্ত্র নিশ্চিত হইল। 'পূর্ব পাকিস্তান' হাতছাড়া হওয়ায় 'পশ্চিম পাকিস্তানে'ও রাজনৈতিক ইসলামের ও মার্শাল ল'র প্রয়োজন থাকিল না। কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও ভারত সরকার বরাবর এটাই চাহিতেছিলেন। বস্তুতঃ, কংগ্রেস নেতৃত্ব এটা আশা করিতেছিলেন বলিয়াই হিন্দু-মুসলিম সমস্যার চূড়ান্ত ও স্থায়ী মীমাংসা হিসাবে ভারত বাঁটোয়ারা মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁরা আশা করিয়াছিলেন, এইভাবে ভারতে একটি হিন্দু মেজরিটি, অপরটি মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্র স্থাপনের দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। হইয়াও যাইত যদি পাকিস্তানের শাসকরা ইসলামের যিকির না তুলিয়া সেকিউলার গণতন্ত্রের দ্বারা দেশ পরিচালনা করিতেন। তা না করায় পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করিল। তার প্রতিক্রিয়া এ প্রতিধ্বনিরূপে ভারতেও সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের অবসানের বদলে ওটা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। আগে যেটা ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, সেটাই হইয়া উঠিল পাক-ভারত বিরোধ। এই বিরোধের ফলে উভয় রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। জনগণের কল্যাণের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল, সে অর্থে যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। বাংলাদেশ সেকিউলার গণতন্ত্রী দেশ হওয়ায় পাকিস্তানও এখন সেকিউলার গণতন্ত্রী দেশ হইতে পারে, তার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়াছে। ভারত সরকার ও কংগ্রেস নেতৃত্বের আনন্দের কারণ এইখানে।

ভারতের জনগণের একাংশের বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের মধ্যে 'পাকিস্তান ভাঙ্গার' উল্লাস দেখিয়া কেউ যেন ওটাকে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও ভারত সরকারের উল্লাস মনে না করেন। কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও ভারত সরকার '৪৭ সালের বাঁটোয়ারাকে ব্যর্থ করিতে চান না; বরঞ্চ সফল করিতে চান। সে চেষ্টা তাঁরা সর্বতোভাবে করিয়া আসিতেছেন। অদূরদর্শী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও অতিবিপ্লবীরা বুঝিতে না পারিলেও কংগ্রেস-নেতৃত্ব এটা বুঝেন যে, '৪৭ সালের বাঁটোয়ারা ব্যর্থ হইলে নতুন করিয়া গুরুতর সমস্যা দেখা দিবে এবং অন্যরূপ বাঁটোয়ারার আবশ্যকতা দেখা দিবে। জনগণের কল্যাণের প্রশ্ন, সমাজবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের প্রশ্ন, সবই আবার অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানির নিচে চাপা পড়িয়া যাইবে।

কাজেই পাকিস্তানের নেতাদের আগেও বুঝা উচিত ছিল, এখনও উচিত আছে যে, কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও ভারত সরকার পাকিস্তানের 'হাজার বছরের' শত্রু নন, চিরকালের বন্ধু। তাঁরা সত্য সত্যই তিনটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমান অধিকার স্বীকৃতির বুনিয়াদে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে বিশ্বাসী। ভারতের এই বন্ধুত্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি। তিনটি রাষ্ট্রের সরকার, নেতৃবৃন্দ ও জনগণের এই উপলব্ধিই উপমহাদেশের চিরস্থায়ী শান্তির গ্যারিন্টি।

জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্লির দুই নম্বর প্রস্তাব, জেনারেল এসেম্লির প্রেসিডেন্টের ভাষণ ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সের বিবৃতি, সবগুলিতেই উপমহাদেশের যে স্থায়ী শান্তির কথা বলা হইয়াছে, তাই এই শান্তি। শিমলাতে ইন্দিরা-ভূট্টোর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে যে চিরস্থায়ী শান্তির কথা বলা হইয়াছে, সেটাও এই শান্তি। এই শান্তির উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তি ও পাকিস্তানের দ্বারা বাংলাদেশের মান্যতা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। কারণ, এই মান্যতার দ্বারাই বাংলাদেশ পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক ও বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বকেয়া বিতর্কগুলির মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর প্রেস কনফারেন্স বিবৃতিতে বলিয়াছেন: "পাকিস্তান বাংলাদেশকে মান্যতা না দিয়া এই দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। পাকিস্তান নিজেই যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন।" সৌভাগ্যের বিষয়, জেনারেল এসেম্লির দুই নম্বর প্রস্তাবে পাক যুদ্ধবন্দী মুক্তির সঙ্গে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের স্বদেশে ফিরিয়া আসার কথাও বলা হইয়াছে। যুদ্ধবন্দীদের সাথে এইসব আটক বাঙালির তুলনা করা অন্যায় ও বেআইনী। তথাপি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধবন্দীদের সাথে এদের এওয়াজ-বদল করিবার কথা বলিতেছেন। এমনকি বাংলা সরকারের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করিবার অভিপ্রায়ের জবাবে তিনি আটক বাঙালিদের বিচারের হুমকি দিয়াছেন। স্পষ্টতঃই তাঁর এই ঘোষণা দূরাভিসন্ধিমূলক ও প্রতিশোধব্যঞ্জক। প্রথমতঃ, বাংলা সরকার পাক যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার কথা কখনও বলেন নাই। শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলিয়াছেন। 'যুদ্ধবন্দী' ও 'যুদ্ধাপরাধী' এক কথা নয়। এদের সম্বন্ধেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানবিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছেন। তিনি

প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেন: 'তোমরা যে ঘোরতর পাপ করিয়াছ, তার জন্য ক্ষমা চাও, বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমা করিতেও পারে। 'আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলিয়াছেন, যুদ্ধবন্দী মুক্তির গোটা প্রশ্নটাই দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক আলোচনা দ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে। যুদ্ধবন্দীসহ দুই পক্ষের মধ্যকার সমস্ত বিরোধ-বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করিবার এর চেয়ে সুস্পষ্ট আভাস আর কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে? তবু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সুবুদ্ধি হইতেছে না, এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। যেসব প্রশ্ন বহু আগেই মীমাংসিত হইয়া যাইত, শিমলায় দ্বিপাক্ষিক সম্মিলনীর স্থলে ত্রিপাক্ষিক সম্মিলনী বসাইয়া যেসব প্রশ্ন অতি সহজে মিটান সম্ভব ছিল, শুধু পাকিস্তান-প্রেসিডেন্টের অহেতুক অযৌক্তিক একগুঁয়েমির দরুন সেসব মীমাংসা বিলম্বিত হইতেছে। তাতে একপক্ষের বন্দী ও অপর পক্ষের আটকদের দুর্দশা ও মানসিক যন্ত্রণাই শুধু বাড়িতেছে। উভয়ের সম্পর্কের তিক্ততা আরও বাড়িতেছে। পাকিস্তান-প্রেসিডেন্টের এমন অহেতুক জিদের একটি এই যে, বাংলাদেশকে মান্যতা দিবার আগে তিনি একটিবার মাত্র আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলিতে চান। জনাব ভুট্টো তাঁর 'ইন্টারিম কনস্টিটিউশনেও' বাংলাদেশকে পাকিস্তানের প্রদেশ বলিয়াছেন। এ অবস্থায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করিতে পারেন না, এটা না বুঝিবার মতো নির্বোধ ভুট্টো সাহেব নন। তবু যে তিনি একই কথা বার বার আওড়াইয়া যাইতেছেন, তার কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং সে কারণটি শুভবুদ্ধি প্রণোদিত নয়। এটা সুস্পষ্ট যে, কোনও ছুঁতায় বাংলাদেশের মান্যতা বিলম্বিত করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু কেন তা করিতে চান, এটাই রহস্যজনক। জেনারেল এসেম্লির এই প্রস্তাবের ফলে ভুট্টো সাহেব তাঁর কৌশল ত্যাগ করিবেন বলিয়া সকলে আশা করেন। তিনি বলিতেছেন, বিশ্বের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মধুর সম্পর্ক স্থাপনে তিনি আগ্রহী। ব্যবসা-বাণিজ্যে পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে 'বিশেষ অনুকূল শর্তের সম্বন্ধ' স্থাপনের স্বপ্নও তিনি দেখিতেছেন। অথচ এই বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে তাঁর এত বিলম্ব ঘটিতেছে কেন? শুধু নিজেদের মান্যতাই তিনি বিলম্বিত করিতেছেন না, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মান্যতাও তিনি ঠেকাইয়া রাখিতেছেন। এটা পারিতেছেন তিনি 'পাকিস্তান ভাঙ্গার' জন্য ভারতকে দোষী করিয়া এবং বাংলাদেশের মেজরিটি এখনও পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিতে চায়, এই ধাপ্পা দিয়া। এ ধাপ্পা যে আর বেশি দিন বিকাইবে না, এটা কি তিনি আজও বুঝেন নাই? যদি বুঝিয়া না থাকেন, তবে শীঘ্র বুঝিবার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে যত দেরী হইবে, লোকসান তত বেশি হইবে। সে লোকসান সকলেরই সহিতে হইবে।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

আজিকার বিজয় দিবস হউক আমাদের হলফ নিবার দিন

আজ আমাদের বিজয় দিবস। বাংলাদেশের নাগরিকরা আজিকার দিনকে পালন করিতেছে উৎসবের দিন হিসাবে। আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যই এটা উৎসবের দিন। এক বছর আগে এইদিনে বর্বর পাক-বাহিনী যুদ্ধে হারিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সে আত্মসমর্পণটা ঘটিয়াছিল ঢাকা শহরের বুকে সোহ্‌রাওয়ার্দী ময়দানে। ঢাকার বিজয় উৎসবটাও হইতেছে এই সোহ্‌রাওয়ার্দী ময়দানেই। এটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরাজিত পাকবাহিনী যদিও আত্মসমর্পণ করিয়াছিল ভারত-বাংলাদেশের যুক্ত কমাণ্ডের কাছে। আসলে কিন্তু সে আত্মসমর্পণটা হইয়াছিল বাংলাদেশের জনগণের কাছে। কারণ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা ছিল আসলে সকল অর্থেই জনযুদ্ধ।

সব যুদ্ধ জয়েই ন্যায় ও সত্যের জয় হয় না। কিন্তু আমাদের জয়ে তাই ঘটিয়াছিল। আমাদের জয়ে সত্য ও ন্যায়ের জয় হইয়াছিল। এ যুদ্ধে মিথ্যা-অসত্য, শোষণ-পীড়ন ও অন্যায়-অত্যাচারের পরাজয় ঘটিয়াছিল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শুধু পাকিস্তানী শাসকের হাত হইতে দেশ মুক্ত করেন নাই, পাকিস্তানী একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের হাত হইতে বাংলাদেশের জনগণকেও মুক্ত করিয়াছেন। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শুধু সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী ছিলেন না; নিরস্ত্র কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-তরুণরাও মুক্তিসংগ্রামের সৈনিক ছিলেন। গোটা দেশবাসী এক কাতারে দাঁড়াইয়া মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার এমন দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় খুব কম আছে।

যে দেশেই ঘটুক, জনগণের মুক্তিযুদ্ধ আসলে দুনিয়ার সকল শোষিত জনগণের মুক্তিযুদ্ধ। এক দেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের যুদ্ধ সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদ কবলিত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের যুদ্ধ। এই দিক হইতে বাংলাদেশের জনগণের গত মুক্তিযুদ্ধটাও ছিল আসলে দুনিয়ার সকল শোষিত জনগণের যুদ্ধ। জয়টাও কাজেই সকলেরই জয়। এ হিসাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে দুনিয়ার সকল মুক্তিযুদ্ধের মিল আছে। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা ছিল নজিরবিহীন অসাধারণ। তার মধ্যে এই কয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক. আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা আগ্রাসক ছিল না। পাক-বাহিনীই ছিল আগ্রাসক।

দুই. পাক-বাহিনী আতেক্কা বিশ্বাসঘাতকের গুপ্তছুরি চালাইয়াছিল।

তিন. আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নেতাহীন অবস্থায় লড়িতে হইয়াছিল।

চার. সেই কারণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বাস্তব ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে লড়িতে হইয়াছিল।

যুদ্ধ বা যে-কোনও প্রকারের সংঘাতেই এই চারটি প্রতিকূলতাই ঘোরতর অসুবিধাজনক। প্রথমতঃ আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দুনিয়ার সব মুক্তিসংগ্রামেই মুক্তিযোদ্ধারা গুপ্ত-সমিতি গঠন করিয়া কর্মীদের ট্রেনিং দিয়া দেশের সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ শুরু করে। সরকারী সৈন্যদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে আসে অনেক পরে। আমাদের বেলা তা-ঘটে নাই। আমাদের রাজনৈতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের আশায় নির্বাচনে লড়িয়াছিলেন। জনগণের আস্থালাভ করিয়া সামরিক সরকারকে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বলিতেছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামে ক্ষমতা দখল করার কোনও অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। কাজেই গোপন করে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিবার কোন প্রশ্নই উঠে নাই। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শুধু বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর. ও পুলিশ বাহিনী অস্ত্র ধরিতে জানিতেন। এঁদের ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা আশিজন ছিলেন যে ছাত্র-তরুণরা, তাদের অধিকাংশ এর আগে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে লইয়াও দেখেন নাই। ফলে এঁরা অস্ত্রের জোরে লড়েন নাই — দেশ স্বাধীন করিবার উদগ্র বাসনাই ছিল এঁদের একমাত্র অস্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ পাক-বাহিনীর আগ্রাসন ছিল বিশ্বাসঘাতকের আতেক্কা হামলা। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন দেশের প্রেসিডেন্টের আহ্বানে ও উপস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত, যখন আমাদের নেতারা সরল আন্তরিকতার সাথেই বিশ্বাস করিয়াছেলেন যে, আপোসরফা হইয়াই গিয়াছে, যখন তাঁরা দেশবাসীর কাছে বলিতেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট যে কোন মূহুর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা করিবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পাক-বাহিনী নিদ্রিত ঢাকা নগরীর উপর কামান-বন্দুকের গুলি বর্ষণ শুরু করে।

তৃতীয়তঃ এমন আতেক্কা নৃশংস আক্রমণের পরেও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নেতাহীনভাবে বিশৃংখলতার মধ্যে সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। যে নেতা তাঁদের প্রাণে সাহস ও প্রেরণা যোগাইতে পারিতেন, যাঁর ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বে তাঁরা যে কোন দুর্বার শক্তির মুখামুখি রুখিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, মুক্তিযুদ্ধের আগাগোড়া তাঁরা সেই প্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত ছিলেন। যুদ্ধের শুরুতেই পাক-বাহিনী সেই নেতাকে বন্দী করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে সৈন্যনিবাসে নিয়া গোপন করে। দেশবাসী সাধারণভাবে ও মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষভাবে তাঁর কোনও উদ্দেশ্য পায় নাই। ফলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শুধু অমন নেতার প্রত্যক্ষ পরিচালন হইতেই বঞ্চিত ছিলেন তা নয়, তাঁর হায়াত-মউত লইয়াও দুশ্চিন্তা পোহাইতে হইয়াছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের। এমন অবস্থায় অন্য যে কোনও দেশের মুক্তিযোদ্ধারা কাণ্ডারিহীন নৌকার মতই অকূল পাথারে ভাসিয়া যাইত। কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় কৃতিত্ব এই যে এতবড় দুর্বিপাকের মধ্যেও তাঁরা ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। এ অবস্থায়ও আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা,

আমাদের জনগণ, সবাই এই অসাধারণ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। তাঁরা সকলেই কোণঠাসা বিড়ালের মতই জান দিয়া লড়িয়াছেন সশস্ত্র আততায়ী সিংহের সাথে। সিংহের শুধু দেহের বলই ছিল, মনের বল ছিল না। তাই আত্মরক্ষায় মরণপণকারী ক্রুদ্ধ বিড়ালের থাবার আঘাতে আততায়ী সিংহ শিয়ালে পরিণত হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এইভাবেই আমরা আজ জয়ী হইয়াছি। রক্তাক্ত-দেহ ও ছিন্ন বস্ত্র হইয়াও আজ আমরা স্বাধীন ও উন্নত শির। আমরা আমাদের মাতৃভূমি শত্রুর কবলমুক্ত করিয়াছি। নিজের ভাগ্য নিজে গড়িবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছি। মুক্তিযুদ্ধের এই ফলটাই বড় কথা। ক্ষতির পরিমাণটা বড় নয়।

তাই আজিকার বিজয় উৎসবের দিনে ক্ষতির আলোচনা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু কেউ কেউ কথাটা আগেই তুলিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই দু-এক কথায় এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি। কেউ কেউ বলিয়াছেন, আওয়ামী লীগ নেতারা, বিশেষতঃ তাঁদের প্রধান শেখ মুজিব, ৭ই মার্চ ও ২৫শে মার্চ অন্যরূপ করিলে আরও অনেক কম লোকসানে আমরা স্বাধীন হইতে পারিতাম। ঘটনার পরে বুদ্ধিমান হওয়া আমাদের দেশী ভাষায় 'চোর গেলে বুদ্ধি বাড়া' খুবই সাধারণ সহজ কাজ। এই সহজ কাজটাও আমার দ্বারা সম্ভব নয় দুইটি কারণে। প্রথমতঃ আমি মূলতঃ গান্ধীবাদী। রাজনীতিতেও আমি অহিংসায় বিশ্বাসী। নীতিতঃই আমি যুদ্ধবিরোধী। এমন লোকের পক্ষে যুদ্ধের স্ট্রাটেজি, টেকনিক ও ট্যাকটিক্স সম্বন্ধে কথা বলার যোগ্যতা ও অধিকার থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানী রাজনীতিতে আমি লাহোর প্রস্তাবে বরাবর দৃঢ় বিশ্বাসী থাকিয়াও এবং তার ফলে পূর্ব পাকিস্তান এক দিন স্বাধীন হইবে এটা জানিয়াও, আমি কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, এর জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের দরকার হইবে। আমি পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত বলিয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়াছি, পশ্চিমা ভাইয়েরা একদিন ভূগোলের কঠিন সত্যটা উপলব্ধি করিবেনই। আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে আমি লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক 'দুই পাকিস্তান' ও দিল্লী প্রস্তাবভিত্তিক 'এক পাকিস্তানে'র মধ্যে একটা আদর্শ কমপ্রমাইজ ফরমুলা মনে করিয়াছি। এর প্রতিবাদে জেনারেল আইউব উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নজির দেখাইয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 'সিভিল ওয়ারের' হুমকি দেওয়ার পরেও আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এটা সম্ভব। বরঞ্চ আমি তখনও আশা করিয়াছি যে, পশ্চিমা নেতারা একদিন লাহোর প্রস্তাবের দূরদর্শী তাৎপর্য হৃদয়ংগম করিবেন এবং আমরা একদিন দুই সহোদরের মতই আপোসে দায়-জায়দাদ ভাগ করিয়া পৃথক সংসারপাতিতে সক্ষম হইব।

কাজেই সশস্ত্র সংঘাতের কথা কোনদিন আমার মনেই পড়ে নাই। পড়ে নাই বলিয়াই এদিককার কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ করিবার যোগ্যতা ও জ্ঞান হইতে আমি বঞ্চিত। এই জন্যই যাঁরা বলেন "৭ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বক্তৃতা শুনিবার জন্য যে বিশ লাখ লোক সোহ্‌রাওয়ার্দী ময়দানে জমায়েত হইয়াছিল, শেখ

সাহেব যদি তাঁদের লইয়া কুর্মিটোলার সেনানিবাস আক্রমণ করিতেন, তবে তথাকার মাত্র হাজার পাঁচেক পাক-সৈন্য আত্মসমর্পণ করিত এবং সেইদিনই সামান্য রক্তপাতে বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া যাইত।" তাঁদের সাথে আমি একমত হইতে পারি না। বরঞ্চ আমি মনে করি, শেখ মুজিবের মতো জননেতা যে এমন সহজ কাজটি করেন নাই, তা তিনি জানিয়া-শুনিয়াই করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, ভালই করিয়াছেন। অমন আক্রমণ যদি তাঁর অভিপ্রেতই হইত, তবে ময়দানে সমবেত ঐ বিশ লক্ষ নিরস্ত্র লোক কেন, ই.পি. আর. ও পুলিশ বাহিনীর অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র ও ট্রেনিং প্রাপ্ত যোদ্ধা লইয়াও তিনি ঐ দিন কুর্মিটোলা দখল করিতে পারিতেন। তা যখন করেন নাই, তখন স্পষ্টতই বোঝা যায়, সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার ধারণাই তাঁর ছিল না। যে কাজের ধারণা থাকে না, সেটা না করাকে ভুল বলা যায় না।

তারপর আরেক শ্রেণীর পণ্ডিত লোক আছেন যাঁরা বলেন, ২৫শে মার্চ পাকবাহিনী আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে–এটা জানিয়াও আওয়ামী লীগ নেতারা সাধারণভাবে এবং শেখ সাহেব বিশেষভাবে দেশবাসীকে সাবধান না করিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। এমন কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা আওয়ামী নেতৃত্বের উপর নিতান্ত অবিচার করিয়া থাকেন। নিজেদের দূরদর্শী পাণ্ডিত্য প্রমাণের জন্যই ব্যাপারটার বিচার না করিয়াই এ কথা বলিয়া থাকেন। ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করিয়াছেন ঐসব লোক যাঁরা বলিতেছেন যে, বেংগল রেজিমেন্টের কোনও কোনও অফিসার শেখ সাহেব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে আগেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মতলব ভাল নয়। তিনি আক্রমণের প্রস্তুতি ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আরও বেশি সৈন্য আমদানির সময় নিবার দূরভিসন্ধিতেই আলোচনার ভণ্ডামি করিতেছেন। অনেক জাহাজ ও বিমানে করিয়া সৈন্যও সরবরাহ আসিতেছে, এমন খবরও নাকি আওয়ামী নেতারা জানিতেন।

এসব কথা সত্য হইলেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, এ সব খবর হয়ত তাঁদের এত দেরীতে দেওয়া হইয়াছিল যে, সংঘবদ্ধভাবে এবিষয়ে দেশবাসীকে, এমনকি ঢাকাবাসকিেও সতর্ক করিবার সময় ছিল না। তা যদি থাকিত তবে দেশবাসীকে সাবধান না করিবার কোনও কারণ ছিল না। দেশবাসীকে সতর্ক করিবার যথেষ্ট সুযোগও আওয়ামী লীগের ছিল। স্মরণ রাখা দরকার, এই যুদ্ধতে রেডিও, টেলিভিশন, সরকারী রেডিওগ্রাফ, ই.পি. আর বাহিনীর ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন সার্ভিস সবই তখন আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পঁচিশে মার্চের অমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দেশবাসীকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দিতেন। এটা যে তারা করেন নাই, তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আওয়ামী নেতৃত্ব এটা জানিতেন না।

আর না জানাটা কি অন্যায় হইয়াছে? একদল ভদ্রলোকের সাথে রাজনৈতিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে আলোচনা করিবার সময় তাঁদের সততায় ও আন্তরিকতায় সন্দেহ না করাটা কি অসংগত? অপর পক্ষ আলাপ-আলোচনার ভান করিয়া আস্তিনের নিচে ছুরি বা পকেটে রিভলবার লইয়া আসিয়াছেন, এটা ধরিয়া না লওয়াটা কি নির্বুদ্ধিতা? আর ছুরি-রিভলবার লইয়া আসাটাই কি ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা? গুপ্তছুরির ঘাতক হওয়ার চেয়ে গুপ্তছুরির শিকার হওয়াই কি অধিকতর মহত্ত্ব ও গৌরবের বিষয় নয়? শিবাজী-আফজল আলোচনা-বৈঠকে শিবাজী আস্তিনের নিচে ছুরি আনিয়াছিলেন, আফজল খাঁ আনেন নাই। তাই শিবাজীর ছুরিতে আফজল খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে কার জয় হইয়াছে, শিবাজী না আফজল খাঁর? কাজেই আমাদের নেতারা যদি পশ্চিমা নেতাদের আগে আক্রমণ করিবার জন্য ছুরি ধারাইয়া না থাকেন, তবে সে জন্য আমাদের লজ্জা না পাইয়া গৌরব বোধ করাই উচিত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা বরাবর পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা আক্রান্ত ও শোষিত হইয়াছি, কোনও দিনই আমরা তাদেরে শোষণ-আক্রমণ করি নাই, আওয়ামী লীগ নেতারা আমাদের এই ঐতিহ্যই রক্ষা করিয়াছেন। তাছাড়া 'আক্রমণই শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা' এটা যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যই সত্য, রাজনৈতিক দরবারের জন্য সত্য নয়।

অতএব, আমাদের নেতারা মুক্তি-সংগ্রামে কোনও ভুল করিয়াছেন আমি তা মনে করি না। মূল্য একটু বেশি দিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু কম আর বেশি স্বাধীনতার দাম আমাদের দিতে হইত সব অবস্থাতেই। সস্তা কোনও জিনিসই ভাল না। সস্তায় স্বাধীনতা পাইলে সে স্বাধীনতা আমরা সস্তায় হারাইয়া ফেলিতাম। বেশি দাম দিয়া আমরা যে স্বাধীনতা কিনিলাম, সেটা রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতঃই আমরা বেশি যত্নবান হইব। এ স্বাধীনতাকে সকল দিকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের সর্বপ্রকারের চেষ্টা করিতে হইবে। এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

আমাদের নব-লব্ধ এই অতিদামী স্বাধীনতাকে সফল করিবার উপায় কি? সে সাফল্যের মানেইবা কি? আমরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা ছিল প্রকৃতই জনযুদ্ধ। তাই যদি হয়, তবে এ যুদ্ধ জয়টাও হইয়াছে জনগণেরই। স্বাধীনতার ফলটাও তবে পাওয়া উচিত জনগণেরই। সত্য সত্যই কি তা হইয়াছে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া উচিত আজকার এই বিজয় দিবসে। আমাদের সকলের দেখা উচিত স্বাধীনতা যুদ্ধের এই বিজয় উৎসব যেন শুধু আমাদের সকলের আমাদের অন্তরেই ধ্বনিত না হয়। জনযুদ্ধের আসল বিজয়ী যে জনগণ–তাদের সকলের এবং প্রত্যেকের অন্তরেও যেন এই উৎসব ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। এ বিজয় দিবস যেন আগের দিনের বিজয় উৎসবের মতো সরকারী ছুটির দিনে এবং আলোকসজ্জার রাতে সীমিত না হয়। এ উৎসব যেন আরও গভীর হয়। এটা যেন বাইরের ব্যাপারে পর্যবসিত

না হইয়া অন্তরের ব্যাপারে রূপান্তরিত হয়। সেটা তবেই সম্ভব যদি স্বাধীনতার ফল আমরা যথাসম্ভব জনগণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। এ 'যথাসম্ভব' কথাটা ভুল বুঝিবেন না। এ যথাসম্ভব মানে যা পারা যায় তা'ই নয়। এ যথাসম্ভব অর্থ স্বাধীনতার ফল গোটা দেশ যা পাইবে, সকলে তা সমান অংশে ভাগ করিয়া খাইবে। জাতীয় সম্পদের বিতরণ হইবে ইনসাফের মাপকাঠিতে। তা কি আমরা পারিয়াছি? এ প্রশ্নের উত্তরও দিতে হইবে আজিকার বিজয় দিবসেই। সে উত্তর দিতে হইবে প্রথমতঃ নিজের অন্তরের কাছেই। দেশ শাসনের দায়িত্ব যাঁরা নিয়াছেন পরের এবং জনগণের সমালোচনা, নিন্দা ও দাবি শুনিবার আগেই তাঁরা যেন নিজেদের বিবেকের এই প্রশ্নের জবাব দেন : নিজে ঠিক আছেন ত'? নিজের কর্তব্য করিতেছেন ত'? যা করিতেছেন তা জনগণের জন্য ত'? আপনার কৈফিয়তে আপনার নিজের বিবেক সন্তুষ্ট হয় ত'?

আমি জানি, আমাদের দেশে সমস্যার অন্ত নাই। এ দেশকে একটি সমাজবাদী সুখী দেশে পরিণত করিতে হইলে এসব সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য-ঘাটতির দুনিয়াজোড়া সমস্যা আমাদের আছেই, তার উপরে নব-জাত রাষ্ট্রের ফর্মেটিভ মুদ্দতের স্বাভাবিক সমস্যা আমাদের রহিয়াছে। এছাড়া আমাদের অতি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অতীত আমাদের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যিক, ভাষিক ও র‍্যাশিয়াল জটিলতা খুবই বিভ্রান্তিকর। এই জটিলতা আমাদের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ও কৃষ্টিক স্বকীয়তাকে করিয়া তুলিয়াছে কুয়াশাচ্ছন্ন। রাষ্ট্রীয় পরিচিতিকে করিয়াছে বিভ্রান্তিকর। এই জটিলতা ও বিভ্রান্তি আমাদের রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়ক সবাইর মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে মানসিক অস্থিরতা চিত্তের চঞ্চলতা ও ধারণার অস্পষ্টতা। এসব কাটাইয়া আমাদের উঠিতে হইবে। জাতীয় স্বকীয়তার সন্ধান আমাদের পাইতেই হইবে। এটা করিতে পারিলেই আমরা সম্মানিত ও মর্যাদাবান জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে যোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিব। অন্যথায় আমরা সমস্যা হইতে সমস্যান্তর, জটিলতা হইতে অধিকতর জটিলতায়, বিভ্রান্তি হইতে গাঢ়তর বিভ্রান্তিতে, এক কথায় উত্তপ্ত কটাহ হইতে জ্বলন্ত চুলায় পতিত হইব। এটা ঘটিলে জনগণতন্ত্রী সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়া হইবে আমাদের পক্ষে সুদূরপরাহত।

কাজেই কর্তব্য আমাদের কঠিন। দায়িত্ব আমাদের গুরুতর। আজিকার বিজয় দিবসও কাজেই আমাদের পরীক্ষার দিন। আমাদের আজিকার বিজয়-দিবস বিজয়া-দিবসে, বিসর্জনের দিনে পরিণত না হয়, সেদিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইদিক হইতে আজিকার দিন আমাদের আত্মোবিনোদনের চেয়ে আত্মসমালোচনার, সরব উল্লাসের চেয়ে নীরব ধ্যানের দিন। লঘুতার চেয়ে দৃঢ় সংকল্পের দিন। আসুন সকলে আমরা এইদিনে জাতি গড়ায় হলফ নেই।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

ঐতিহাসিক এগার দফার আলোকে আমাদের শিক্ষা-সংস্কার

বাংলা সরকারের শিক্ষা-নীতি আজও ছাত্রসমাজ ও শিক্ষক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ সরকারও আজ পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষা–নীতি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন নাই। তাই ছাত্ররা তাঁদের বিভিন্ন সম্মেলনী ও সভা-সমিতিতে আজও তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। সরকারের পক্ষে মন্ত্রীরাও 'করি-কচ্ছি' করিয়া এ ব্যাপারে অযথা কাল কাটাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আইউবী আমলের এবং পরবর্তীকালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স সবই আইনতঃ এবং কার্যতঃ আজও বলবৎ রহিয়াছে। ছাত্রদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের জবাবে সরকার এ বিষয়ে কিছু না করিয়া সেদিন ভার্সিটির অধ্যাপকেরা পর্যন্ত এক বিবৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁরা তাঁদের বিবৃতিতে দাবি করিয়াছেন, অন্ততঃ ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস হইতে যেন অর্ডিন্যান্সটি বাতিল করা হয়। সম্ভবতঃ তাঁদের এই দাবি মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী তার ঐ দিবসের বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ দিন হইতে সব কালা-কানুনের সংগে সংগে ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সটিও বাতিল হইয়া গিয়াছে।

দুই কারণে এই ঘোষণা আইনের দিক হইতে যথেষ্ট নয়। প্রথমতঃ, আইন বাতিল করিতে হয় অপর একটি আইন করিয়া। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাতেও আইন বাতিল হইয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঐ অর্ডিন্যান্সটি বাতিল করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য ও ছাত্র সমাজের দাবি পূর্ণ হয় না। মার্শাল ল' আমলের ইউনির্ভার্সিটি অর্ডিন্যান্স বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন সংকুচিত করিয়া উহাদিগকে সরকারী বিভাগে পরিণত করিয়াছিল। শিক্ষাকে জাতীয় প্রয়োজনে আধুনিকরণের পথে ওটা ছিল একটা দুর্লঘ্য প্রতিবন্ধক। সেই জন্যই দেশবাসী সাধারণভাবে এবং ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে উহা বাতিলের দাবি করিয়াছিল। ওটা বাতিল করিয়া বসিয়া থাকিলেই আপনা আপনি শিক্ষা সংস্কার হইয়া যাইবে না; ছাত্রসমাজের দাবি-দাওয়াও পূর্ণ হইয়া যাইবে না।

এ সম্পর্কে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের সর্বদলীয় এ্যাকশন কমিটির এগার দফা দাবির উল্লেখ অপ্রাসংগিক হইবে না। সকলের স্মরণ থাকিবার কথা, আওয়ামী লীগের 'ছয় দফার' মতই গোটা ছাত্রসমাজের 'এগার দফাও' তৎকালে বাংলাদেশের সকল মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 'এগার দফার' ঐ জনপ্রিয়তার দরুণই আওয়ামী লীগ তাঁদের 'ছয় দফার' সাথে সাথে ছাত্রদের 'এগার দফাকেও' তাঁদের নির্বাচনী

ইশতাহাররূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। নির্বাচনী ওয়াদা হিসাবে আজ আওয়ামী লীগের 'ছয় দফার' চেয়েও ছাত্রদের 'এগার দফার' গুরুত্ব বেশি। কারণ বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়া যাওয়ায় আওয়ামী লীগের 'ছয় দফার' গুরুত্ব এবং সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের কর্তব্য তেমন কিছু বিদ্যমান নাই। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্রদের 'এগার দফার' সতরটি উপদফা-বিশিষ্ট এক নম্বর দফার শিক্ষা-বিষয়ক অংশের গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। এ অবস্থায় ছাত্রদের 'এগার দফার' ঐ অংশই বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা। এই দফা পূরণ আজ বাংলাদেশ সরকারের শুধু রাজনৈতিক কর্তব্য নয় ন্যায়নৈতিক দায়িত্বও বটে। এ ওয়াদা খেলাফ করিলে শুধু রাজনৈতিক অপরাধই হইবে না, ন্যায়নৈতিক অপরাধও হইবে। 'এগার দফা'র এক নম্বর দফার ১৬ নম্বর উপ-দফার বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ও সতর নম্বর উপদফায় আইউবী শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামদুর রহমান রিপোর্টসহ সমস্ত শিক্ষা সংকোচন আইন বাতিল করার দাবি করা হইয়াছিল। অতএব স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে এইটিই তাঁদের প্রথম করণীয় কর্তব্য ছিল। বাংলাদেশ সরকার নির্বাচনী ওয়াদার বাইরেও অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। বকেয়া ট্যাক্স-খাজনা মাফ, পঁচিশ বিঘার কম জমির খাজনা রেহাইর কথা এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এর মধ্যে পঁচিশ বিঘার কম জমির খাজনা রেহাইর কথাটা ছয় দফায় ছিল না বটে, তবে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে ছিল। '৭০ সালের নির্বাচন ছয়-দফাভিত্তিক রেফারেণ্ডাম ঘোষিত হওয়ায় আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টোর অন্যান্য ধারার গুরুত্ব কমিয়া যায়। কাজেই ট্যাক্স-খাজনা সম্পর্কে অত তাড়াতাড়ি কিছু না করিলেও সেজন্য কেউ আওয়ামী সরকারকে দোষ দিতে পারিত না। তথাপি আওয়ামী সরকার যে স্বাধীন বাংলাদেশ কার্যকর শাসনভার হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই খাজনা-ট্যাক্স সম্পর্কে ঐ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাতে তাঁদের গণস্বার্থ চেতনাই প্রমাণিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত নয়া রাষ্ট্রের প্রাথমিক নির্মাণকার্যের ঝামেলার মধ্যেও বাংলাদেশ সরকার জনগণের আর্থিক বিপদের কথা ভুলেন নাই। এটা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার কথা। ঠিক এই কারণেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার তাঁদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনী ওয়াদা 'এগার দফার' কথাও ভুলেন নাই।

এখানেই প্রশ্ন উঠে, যদি ভুলেন নাই, তবে 'এগার দফার' একটি উপ-দফাও তাঁরা কার্যকরী করলেন না কেন? এক নম্বর উপ-দফা হইতে পনর উপ-দফা পর্যন্ত দাবিগুলি কার্যকর করিতে কিছু সময় লাগিবার কথা ধরিয়া নিলেও ষোল-সতর উপ-দফায় বর্ণিত অর্ডিন্যান্স বাতিলে ত কোনও সময় ও অর্থ-ব্যয়ের দরকার ছিল না। তবে অর্ডিন্যান্স বাতিলের এই এক কথার কাজটি করিতে এত সময় লাগিতেছে কেন? ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া না রাখিলে এমন কাজে সময় লাগিবার কথা নয়। যে আওয়ামী লীগ সরকার সত্য সত্যই জনপ্রিয় সরকার, যে সরকার জনগণের এবং ছাত্রসমাজের দাবি-দাওয়া পূরণে সর্বদাই প্রস্তুত, সেই সরকার যদি ছাত্রদের এই সর্বদলীয় ও সার্বজনীন দাবিটি এবং

নিজেদের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে অনাবশ্যক বিলম্ব করেন, তবে এই সিদ্ধান্ত ছাড়া গত্যন্তর নাই যে, সরকার ইচ্ছা করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করিতেছেন না। বর্তমান সরকারের মতো জনপ্রিয় ও জনহিতৈষী সরকার যদি ইচ্ছা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলে বিলম্ব করেন, তবে বুঝিতে হইবে তাঁদের মতে এই অর্ডিন্যান্স বাতিলে বাস্তব অসুবিধা রহিয়াছে। সে অসুবিধাটা কি, সরকার আজও তা বলেন নাই। ছাত্রসমাজ ও জনগণকে সরকার এ বিষয়ে মনের কথা খুলিয়া বলেন নাই। বলিলেই ভাল করিতেন।

আসল কথা, বর্তমান সরকার ঐ অর্ডিন্যান্সের দেওয়া ক্ষমতা হাতছাড়া করিতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা পাওয়ার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর হইতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অত তাড়াতাড়ি উঠাইয়া নেওয়া নিরাপদ হইবে না। 'বিশেষ অবস্থার' জন্য 'বিশেষ ক্ষমতা' সরকারের হাতে থাকা দরকার বলিয়া যেসব 'বুদ্ধিমান' -রাষ্ট্রনেতা এতকাল 'নিরাপত্তা' আইন বহাল রাখিয়াছিলেন, যে 'নিরাপত্তা' আইনের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন আওয়ামী লীগ সারা জীবন বর্তমান সরকার সেইসব 'বুদ্ধিমানের' পাল্লায় পড়িয়াছে বলিয়াই বহু-নিন্দিত ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সটি বাতিল করেন নাই।

এখন তাঁরা বলিতেছেন যে, সংবিধান প্রয়োগ হওয়ার ফলেই সব কালা-কানুনের মতই বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সটিও বাতিল হইয়া গিয়াছে। সংবিধানের কোন্ ধারার বিধান-বিরোধী বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া গিয়াছে, সরকার সে কথা না বলা পর্যন্ত এবং সরকার বর্তমানে সংবিধান-বিরোধী আইনের ঝাড়াই-পোছাই করিয়া যে তালিকা করিতেছেন, সেই তালিকাভুক্ত হইয়া ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

ওটা হইবার পরও সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম কমিটির 'এগার দফা' দাবি মিটিয়া যাইবে না। 'এগার দফার' এক নম্বর দফার এক উপ-দফা হইতে পনর উপ-দফা পর্যন্ত সবগুলি দাবি পুনরায় পড়িয়া দেখিতে আমি সরকারকে অনুরোধ করিতেছি। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই সব দাবির প্রায় সবগুলিই আমাদের গণমুখী শিক্ষা প্রসারের জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য না করিতে পারিলে আমাদের কোন সমস্যা মিটিবে না; শিক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রুতগতিতে প্রসারিত হইবে না। এ অবস্থায় বর্তমান সরকারকে 'এগার দফা' পূরণে হাত দিতেই হইবে এবং তা আগামী নির্বাচনের আগেই করিতে হইবে।

তাড়াতাড়ি ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স বাতিলের পর এ সম্পর্কে নয়া অর্ডিন্যান্সও করিতে হইবে। রীতিমত এ্যাক্টের কথাই বলিতাম। কিন্তু আইন পরিষদ না থাকায় অর্ডিন্যান্স করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাজেই আর কালবিলম্ব না করিয়া নয়া ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। সিনেট-সেন্ডিকেটে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বের বিধান করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেটে ছাত্র প্রতিনিধি নিবার দাবি অনেক দিনের। দাবিটা অন্যায়ও নয়, নজিরবিহীনও নয়। যে পশ্চিম পাকিস্তানকে (বর্তমানের পাকিস্তান) আমরা

এসব ব্যাপারে বরাবর প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদগামী বলিয়া থাকি সেখানেও ইতিমধ্যে আইউবী আমলের ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স সংশোধন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হইয়াছে এবং সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নিবার বিধান করা হইয়াছে। অতএব আমি আশা করি, আমাদের সরকারও এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে বিধান করিবেন। আগামী নির্বাচনের পরে করিবার ওয়াদা ছাত্ররা মানিয়া লইবেন বলিয়া মনে হয় না।

ছাত্রদের দাবি-দাওয়াসহ সামগ্রিক শিক্ষা-সংস্কারে দেরি করা সম্ভবও নয়, তার দরকারও নাই। এ সম্পর্কে শুধু ছাত্ররাই যে তাঁদের অভিমত স্পষ্ট দাবির ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তা নয়। আমাদের শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক নেতারাও বহুদিন ধরিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া এবং মতামত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তাতে এ বিষয়ে করণীয় কাজগুলির মূলনীতি মোটামুটি ঠিক হইয়াই গিয়াছে। বাকি শুধু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রয়োগবিধির খুঁটিনাটি রচনা করা। এ কাজে খুব বেশি সময় লাগিবার কথা নয়।

শিক্ষা-সংস্কারের অন্যতম প্রধান কাজ পরীক্ষা-নীতি ও প্রণালী নির্ধারণ করা। অবাস্তব যে পরীক্ষা-নীতি এতদিন চলিতেছিল, তথাকথিত 'নকলের জুলুম' ঐ অবাস্তব প্রথারই প্রতিবাদ। শিক্ষাবোর্ডসমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমানে পাসের হার সম্বন্ধে বাস্তব ও দূরদর্শী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এটা প্রশংসার যোগ্য। আগের দিনের শতকরা অনধিক পঞ্চাশ পাসের স্থলে বর্তমানে যে শতকরা পঁচানব্বইর কাছাকাছি পাস দেওয়া হইতেছে, এ জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ না হইয়াও আমি গত পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ এই কথাটিাই বলিয়া আসিতেছি। ১৯৫৬ সালে 'ছয় দিনের শিক্ষামন্ত্রী' হিসাবে তৎকালীন শিক্ষক-পরীক্ষকদেরে আমি এই উপদেশটাই দিয়াছিলাম। এত বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন দেখিয়া আমার মতো আনন্দিত বোধ হয় পাস করা ছাত্ররাও হয় নাই। পরীক্ষা-নীতি ঠিক হইয়াছে। এখন পরীক্ষা-প্রণালীটা ঠিক করিলেই এ বিষয়ে মোটামুটি কর্তব্য শেষ হইবে।

এ সম্পর্কে আরেকটা কথা না বলিলে কর্তব্যচ্যুতি হইবে বলিয়া আমি মনে করি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের ছাত্রসমাজের অবদান ছিল সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, একথা সর্বজনস্বীকৃত। স্বাধীনতাযুদ্ধে ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের মোটামুটি দুইটি বছর খোয়া গিয়াছে। 'নষ্ট' হইয়াছে বলিলাম না। কারণ ও সময়টা সৎকাজেই ব্যয়িত হইয়াছে। কাজেই এই দুইটা বছর ত্যাগের দরুণ ছাত্ররা চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারী চাকুরির দরখাস্তের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ গণনার সময় দরকার মতো এই দুইটা বছর বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে। এবারকার এম. এ.-বি.এ. হইতে শুরু করিয়া নিম্নতম ক্লাসের ছাত্রদের সবাইকে এই সুবিধা দিতে হইবে। দেশবাসীর পক্ষ হইতে সরকার ছাত্রদিগকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য এই পুরস্কার দিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে এটা লেখা থাকিবে।

আশা করি, সরকার এসব বিষয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭২

খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভরতা লাভই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পয়লা শর্ত

আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সেদিন ঘোষণা করিয়াছেন, বাংলাদেশকে আগামী পাঁচবছরে খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এটি আমাদের জাতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই করা হইয়াছে। গোটা জাতির জন্যই এটা সুসংবাদ। এ পরিকল্পনার সাফল্যের সাথে আমাদের মরা-বাঁচার প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খাদ্য সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে একটা পবিত্র দায়িত্ব। এ কথা সকল দলের স্মরণ রাখা উচিত।

কিন্তু পরিকল্পনার যথাসম্ভব নির্ভুলতার উপরই তার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। খাদ্য উৎপাদনের পাঁচসালা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইবার পরই এ বিষয়ে আলোচনার সময় আসিবে। কিন্তু আগেই এ সম্পর্কে সরকার ও জনগণের বিবেচ্য ও করণীয় কতকগুলি ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার।

কৃষিপ্রধান সকল দেশের, বিশেষতঃ দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিপ্রধান দেশসমূহের মতই বাংলাদেশেও কতকগুলি সাধারণ সমস্যা আছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভর হওয়ার জন্য আমাদের সেসব সমস্যার সমধান করিতে হইবে। সেদিকে সরকার ও দেশবাসীর মনোযোগ দান করিয়া আগে একটি মূলকথা সকলের উপলব্ধি করিতে হইবে। তার কথাই আগে বলিয়া লইতেছি। কথাটি এই যে, কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভর হওয়ার যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, সে সবের সাফল্য নির্ভর করিবে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য অর্জনের উপর। আর এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের সাফল্য করিবে বাংলাদেশ ও ভারতের সহযোগিতার উপর। এর একটা ছাড়া অপরটা সফল হইবে না। অনেকেরই স্মরণ আছে যে, ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে 'পূর্ব পাকিস্তানের' বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে ক্রুগমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল। এই মিশন খাট-মেয়াদী ও লম্বা-মেয়াদী দুইটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনাটির ব্যয় ধরা হইয়াছিল চার শ' কোটি টাকা। সুপারিশে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল এই পরিকল্পনা সফল করিতে ভারত সরকারের সহযোগিতা অপরিহার্য। কারণ, বন্যা-বাহিকা নদীগুলির উৎস ভারত ভূমিতে। সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার উদ্যোগে ভারত সরকার বন্যা-নিয়ন্ত্রণের এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে এবং অন্ততঃ অর্ধেক ব্যয় বহন করিতেও রাজি হইয়াছিলেন। চারশ' কোটি টাকার কথা শুনিয়া পাঠক পরিকল্পনাটিকে তাচ্ছিল্য করিবেন না। ১৯৬৮ সালে এই পরিকল্পনারই খরচ বাড়িয়া হইয়াছিল তিন হাজার দুইশ কোটি

টাকা। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর এদিকে আর এক পা বাড়ান হয় নাই। বরঞ্চ আইউবী আমলে পাক-ভারত সম্পর্কে তিক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় ক্রুগমিশনের রিপোর্টটিও ভুলিয়া যাওয়া হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতের সাথে আমাদের দুশমনির অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হইলেও সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা স্কীমে ভারতের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে বাধে নাই। বরঞ্চ ১৯৬০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুকে লাহোর, করাচী সফর করাইয়া সিন্ধু অববাহিকা চুক্তি সমাধান স্বাক্ষর করা হয়। তার ফলে 'পশ্চিম পাকিস্তানের' পানি সমস্যার সমাধান হইয়াছে। তারবেলা-মঙ্গলা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাফল্যে আজ তথাকার বিজলী সরবরাহ সন্তোষজনক হইয়াছে।

বাংলা স্বাধীন হওয়ায় আজ আমাদেরও ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ আসিয়াছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ শুধু বাংলাদেশের আর্থিক জীবনের জন্যই অত্যাবশ্যক নয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের জন্যও বন্যানিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। পদ্মা, তিস্তা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, গোমতি, সুরমা ইত্যাদি সব নদীতেই বাংলাদেশ-ভারতের স্বার্থক সমভাবে জড়িত। সৌভাগ্যের কথা, উভয় দেশের সরকার এ বিষয়ে একটি যুক্ত নদী-কমিশন গঠন করিয়া দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তবু আমাদের সরকারকেই এদিকে সর্বক্ষণ অধিকতর সচেতন থাকিতে হইবে। কারণ, ভারতের জন্য এটা একটা আঞ্চলিক প্রশ্ন; আর বাংলাদেশের জন্য এটা সর্বাত্মক মরা-বাঁচার জাতীয় প্রশ্ন।

এ বিষয়টার উপর এত বেশি জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আমাদের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারত সরকারের সহযোগিতার মূল্যের অসাধারণত্ব আমাদের রাজনীতিকদের বিশেষভাবে ও জনসাধারণকে সাধারণভাবে, আজও ভাল করে বুঝান হয় নাই। অনেক রাজনৈতিক নেতা নিজেরাই বুঝেন নাই। তা যদি বুঝিতেন, তবে কথায় কথায়, নানা ছুতায় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির চেষ্টা করিতেন না। ভারতের প্রত্যক্ষ ও সামরিক সহায়তায় আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এই কারণে ভারত সরকার ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে অনেক অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া যে একটি প্রচারণা চলিয়াছে, আমি আজ তার সত্য-মিথ্যা বিচার করিতেছি না। আমি ধরিয়া লইতেছি, এসব অভিযোগের মধ্যে কম-বেশি সত্য আছে। এটা মানিয়া লইয়াও আমি যে কথাটির দিকে পজিশন-অপজিশন সকল দলের রাজনৈতিক নেতার, বুদ্ধিজীবীর ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, তা' এই যে, আমাদের আজ সাবধানে বিচার করিতে হইবে: ঐসব ছোট-খাট ব্যাপার লইয়া ভারতের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করা ও বড় বড় ব্যাপারে আমাদের জীবন মরণ প্রশ্নে, ভারতের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা লাভ করা, এই দুইটার কোনটা বড়? কোনটা রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের ও শোষিত মানুষ হিসাবে বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য অধিকতর হিতজনক?

ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী চুক্তিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হইয়াছে, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যুক্ত কমাণ্ডের ভারতীয় নেতৃত্ব আজও বহাল আছে, তাতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রসারণের দ্বারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি নৈয়ায়িক ও আনুমানিক অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনমনকে বিষাক্ত, বিক্ষুব্ধ করা এবং তার ফলে ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় ফাটল ধরান কি বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের অনুকূল? বন্যা নিয়ন্ত্রণের আলোচনা করিতে গিয়া এসব কথার অবতারণা করিতেছি এই জন্য যে, এই একটিমাত্র ব্যাপার হইতেই আমরা ভারতের সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিব। ভারত সহযোগিতার দায়িত্ব ও খরচে শরিকির ভার না নিলে আমাদের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কোনমতেই সফল হইবে না। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সফল না হইলে আমরা খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনে স্বয়ং-নির্ভর কোনকালে হইতে পারিব না। এখন তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া দেখুন বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য সমস্যার সমাধান করাই বড় কথা, না আমাদের সার্বভৌমত্বের চুলচেরা হিসাব করাটাই বড় কথা? বন্যা নিয়ন্ত্রণের বড় বড় ড্যাম হইতে বিজলী উৎপাদন করিয়া তদ্বারা সারা উত্তর বাংলাকে শিল্পায়িত করার কাজটাই বড়, না আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রসারিত করাটাই বড়?

এ বিষয়ে বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে বড় নজির দিয়া পাঠকদের সামনে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিতে চাই। এ নজির জাপান। জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হারিয়া মার্কিন দখলে গিয়াছিল। সে দখল এমন সর্বাত্মক ছিল যে, বার বছরকাল জাপানের কোনও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই ছিল না। পররাষ্ট্র তার কোনও স্বীকৃতি ছিল না। অবশেষে ১৯৫৬ সালে জাপান তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় এবং ঐ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘের মেম্বরগিরি লাভ করে। জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপ আজও মার্কিন সমর-শিবির। দীর্ঘ আটাশ বছর পরে এই সেদিন মাত্র ওকিনাওয়া ত্যাগের মার্কিন-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই আটাশ বছরকাল জাপানের প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল না। প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের কোনও অধিকারই জাপানের ছিল না। কিন্তু তার ফলে জাপানের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথে কোনও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে? ঘটে নাই। বরঞ্চ জাপান আজ শিল্পে-বাণিজ্যে, রাজনীতি ও কূটনীতিতে, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে, এক কথায় রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে, এমন বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে যে, সারা দুনিয়ায় জাপানই আজ একমাত্র দেশ যার মুদ্রা 'ইয়েন' মার্কিন মুদ্রা 'ডলারের' উপর টেক্কা মারিয়া চলিতেছে। জাপানকে এই আটাশটি বছর প্রতিরক্ষায় জাতীয় বাজেটের শতকরা চল্লিশ-পঞ্চাশ ইয়েন খরচ করা হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন মার্কিন সরকার জাপানের প্রতি প্রেমাতিশয্যে নয়, জাপানকে শাসনে রাখিবার উদ্দেশ্যেই। কিন্তু জাপানের তাতে কি পরিমাণ নিট লাভ হইয়াছে, সহজেই তা অনুমান

করা যায়। জাপানের এই লাভ হইয়াছে এই জন্য যে, এই আটাশ বছর সে তার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করিবার অধিকার লইয়া মার্কিন সরকারের সহিত তর্ক করিতে বসে নাই। সে নীরবে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিল। বাংলাদেশও এভাবে জাপানকে অনুকরণ করিতে পারে। আমার বিবেচনায় করা উচিত। অন্য সব কথা বাদ দিলেও শুধু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংনির্ভরতা লাভেই বাংলাদেশ ভারত হইতে অনেক শিক্ষা ও সহযোগিতা লাভ করিতে পারে। এ কাজে শুধু কন্যা-নিয়ন্ত্রণই নয়, আরও অনেক ব্যাপারে ভারতের অনেক সহায়তা লইতে এবং পাইতে পারে।

খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনের জন্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণের দিক ছাড়া আরও দিক আছে প্রথমেই ধরুন, এ বিষয়ে গবেষণা করা ও বই-পুস্তক লেখার কথা। আমাদের শাসকদের তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে পথ প্রদর্শন করার যে দায়িত্ব আমাদের বিশেষজ্ঞগণের আছে, তার কিছুই আজ অবধি করা হয় নাই। পাকিস্তানী আমলে সরকারী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে আমাদের বিশেষজ্ঞগণকে বিশেষ কিছু করিবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় নাই। বাংলাদেশের মাটির শ্রেণী-জরিফ, কৃষিসম্পদের সম্ভাবনা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়, উন্নত ধরনের কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ, উন্নত শ্রেণীর ধান-কলাই-সরিষার প্রবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের কৃষি-বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের বহু কাজ অসমাপ্ত পড়িয়া রহিয়াছে। এখন এসব কাজে হাত দিবার সুযোগও আসিয়াছে। উপযুক্ত বিশেষজ্ঞেরও অভাব হইবে না। কিন্তু এ সবই গবেষণার কাজ। সময় লাগিবে। খাদ্য উৎপাদনের মতো বিষয়ে গবেষণার আশায় বসিয়া থাকা যায় না। কাজ এখনই এই মুহূর্তে শুরু করিতে হইবে। এ কাজে ভারতীয় কৃষিবিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের পঁচিশ বছরের, এমনকি তার বেশিদিনের গবেষণার ফলস্বরূপ পুস্তকাদি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা সরকার এই সব পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিশেষজ্ঞদের হাতে দিতে পারেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের, বিশেষতঃ বিহার-উড়িষ্যা পশ্চিম বাংলা আসাম ও ত্রিপুরা। রাজ্যের মাটি, নদী-নালা, জলা-বিল ও আবহাওয়ার সাথে বাংলাদেশের ঐসব বস্তুর সাদৃশ্য এত বেশি যে, ঐসব রাজ্য সম্পর্কে ভারতীয় গবেষকদের গবেষণা ও রিপোর্টকে আমরা মোটামুটি আমাদের দেশের গবেষণা ও রিপোর্ট ধরিয়া লইতে পারি।

তাছাড়া, লোকবল, কৃষি-শ্রম ও শ্রমিক, কৃষকদের ছয়মাস ব্যাপী বেকারত্ব, কৃষি উৎপাদনের শ্রেণী, কৃষির ঋতু ও মৌসুম, জলা-জমির শ্রেণী ও তাদের উদ্ধারের উপায় ইত্যাদি ব্যাপারেও বাংলাদেশ ও পূর্বাঞ্চলীয় ভারতকে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের দিক হইতে একই কৃষি অঞ্চলরূপে বিচার করা যাইতে পারে। খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি বিষয়ক উন্নতির কথা বলিলেই আজকাল অনেক মিকানাইয্ড কালটিভেশন, মানে যান্ত্রিক চাষাবাদের কথা তুলিয়া বসেন। ইউরোপ-আমেরিকার সুদূর বিস্তীর্ণ সমতলভূমির উপযোগিতার বিচারে আবিষ্কৃত ও নির্মিত কৃষি-যন্ত্রাদির সবগুলি আমাদের নদীমাতৃক

দেশের অসমতল মাটির উপযোগী নয়। এ ব্যাপারেও বাংলাদেশের ভূমি ও পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের ভূমির মিল রহিয়াছে। কাজেই এ বিষয়েও আমরা ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীদের সুপারিশ হইতে শিক্ষা ও সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিব।

যান্ত্রিক হালচাষের ব্যবস্থা এই মুহূর্তে সর্বত্র করা না গেলেও আমাদের হালের ভাল গরুর ব্যবস্থা ও উন্নতমানের বীজ সরবরাহ অবিলম্বে করিতে হইবে। গত দুই বৎসরের ঝড় বন্যায় অনেক গবাদি পশু মারা গিয়াছে। পাক-বাহিনী অনেক গরু খাইয়া-মারিয়া গিয়াছে। তাছাড়াও হালের গরু আমাদের বরাবরই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আগের দিনে আমরা মধ্য ভারত হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু আনিতে পারিতাম। দেশ ভাগ হওয়ার পর ভারত হইতে বাংলায় গরু আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১৯৫৭ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে আমরা 'পূর্ব পাকিস্তানে' ভারতের গরু আমদানী চুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর পাকিস্তানের সরকার এদিকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। এখন স্বাধীন বাংলাদেশ এ ব্যাপারে ভারতের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় গরু আমদানি করিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের কৃষিমন্ত্রী তার আলোচ্য বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ভারত বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় গবাদি পশু সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে; তাই আমাদের কৃষি দফতর এদিককার পরিকল্পনা বাতিল করিয়াছেন। কথাটা আমি বলিতে পারিলাম না। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে কিরূপ এবং কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, ভারত সরকার কি কারণে গরু সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না, এ বিষয়ে স্বয়ং মন্ত্রী সাহেবের উদ্যোগী হওয়া দরকার বলিয়া আমি মনে করি। উন্নতমানের বীজ ও সস্তা সার সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যে আরেকটি কাজ আমাদের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের প্রথম শর্ত, তা হইতেছে পানিসেচের ব্যবস্থা। সাধারণভাবে নলকূপ ও বিশেষ বিশেষ জায়গায় গভীর নলকূপ খনন অবশ্যই করিতে হইবে। এইসঙ্গে পাম্পের যথেষ্ট সরবরাহ সচল রাখিতে হইবে। মন্ত্রী সাহেবের বিবৃতিতে জানা গেল, এবার ৩৫ হাজার পাম্প সরবরাহ করার পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে ২৮ হাজার ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হইয়াছে। বাকি ৭ হাজার জানুয়ারির মধ্যে বিতরণ করা হইবে। এ সম্বন্ধে দুইটি সতর্কতা গোড়া হইতেই অবলম্বন করিতে হইবে। জার্মানীর মিলমার কোম্পানীকে গভীর নলকূপ খননের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাদের দ্বারা স্পেয়ার পার্টস নির্মাণ ও সরবরাহের স্থানীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি না, তা জানা যায় নাই। স্পেয়ার পার্টস, মেরামতের মিস্ত্রী ও ডিজেল তেল সরবরাহের নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা আগে হইতে করিয়া না রাখিলে সব আয়োজন ভণ্ডুল হইবে। তার ফলও মারাত্মক হইবে। আশা করি কৃষি-দফতর এ বিষয়ে সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতেছেন।

খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শিল্পোন্নয়নের সমস্ত চেষ্টা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। আশা করি সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

২৯শে ডিসেম্বর '৭২

শিল্পনীতির আগে বাণিজ্য-নীতির মানে ঘোড়ার আগে গাড়ি

বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এ বছরের ছয় মাসিক বাণিজ্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহের তালিকা হিসাবে এই দলিলটিকে মোটামুটি ভাল বলা যায়। কিন্তু এটাকে ঠিক সরকারী বাণিজ্যনীতি ঘোষণা বলা যায় না। কারণ সরকারী বাণিজ্য নীতির চারটি মূল উদ্দেশ্য: এ ধরনের ঘোষণায় থাকতেই হইবে। এই চারটি উদ্দেশ্য: ১) রফতানী বৃদ্ধি, ২) আমদানি নিয়ন্ত্রণ, ৩) বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসার ও ৪) ব্যালেন্স অব পেমেন্ট–আমদানি-রফতানির সমতা। এই চারটি মূল উদ্দেশ্যের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রীর ঘোষিত 'বাণিজ্যনীতি'কে কোনও মতেই 'নীতি' ঘোষণা বলা চলে না। বাণিজ্যনীতি ত নয়ই, আমদানিনীতি'ও না। আমাদানি তালিকা মাত্র। এটা বুঝিতে অর্থবিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নাই যে বাণিজ্য নীতি মানে ক্রয়-বিক্রয় নীতি। আন্তর্জাতিক ভাষায় এটাকেই বলে রফতানী-আমদানি নীতি। আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রী যা করিয়াছেন, তাকে 'বাণিজ্যনীতি' না বলিয়া যে 'আমদানি' নীতি বলা হইয়াছে তাও ঠিক না। কারণ প্রথমতঃ এতে রফতানির কোনও কথা নাই। শুধু আমদানির কথা বলা হইয়াছে, কাজেই কথা বলা হইয়াছে আধা বলা হয় নাই। মুদ্রার এক পিঠ দেখান হইয়াছে, অপর পিঠ দেখান হয় নাই। বলা হইয়াছে. উনিশ কোটি টাকার মাল আগামী ছয় মাসে আমদানি করা হইবে। এই দুইশ' উনিশ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে। কত রফতানী আয়ে পাইব, কত বার্টার বাণিজ্যে পাইব, কত ঋণ বাবত পাইব। কত উদ্বৃত্ত থাকিবে, কিছুই বলা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই আমদানিটাও কোনও নীতি-ভিত্তিক নয়। সেটা হইবার উপায় ছিল না। নীতিভিত্তিক আমদানি তালিকা তৈয়ার করিতেও যে পরিবেশ দরকার, বাণিজ্যমন্ত্রীর সে সুবিধাও ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে বাণিজ্যমন্ত্রী একাকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি 'বাণিজমন্ত্রী' না হইয়া যদি শুধু 'আমদানিমন্ত্রী' হইতেন, তবু আলোচ্য 'বাণিজ্যনীতি' নামে আমদানিনীতি'র জন্য বাণিজ্যমন্ত্রীকে দোষ দেওয়া যাইত না। শুধু আমাদানির তালিকা ঘোষণার জন্য বাণিজ্যমন্ত্রীর দরকারই ছিল না। এটা কন্ট্রোলার অব-এক্সপোর্ট-ইম-পোর্টকে দিয়া বলাইলেই চলিত।

কারণ দেশের আমদানি-নীতি রফতানী-নীতি হইতে আলাদা নয়। সরকারী রফতানী-নীতি দেশের উৎপদাননীতি হইতে পৃথক হইতে পারে না। আর দেশের উৎপাদন নীতি মানেই তার শিল্পোন্নয়ন নীতি। সবগুলি আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশের বাণিজ্য-নীতি তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের একাধারে আয়না ও নিয়ামক। কৃষি-শিল্প

ইত্যাদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের বাণিজ্য-নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। আবার বাণিজ্য-নীতিও শিল্পোন্নয়ন পরিচালিত করে। সেজন্য গণতান্ত্রিক সব দেশেরই সরকার সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন নীতি গ্রহণ করিয়া সেই নীতি সহায়ক ও পরিপূরক হিসাবে আমদানি ও রফতানীনীতি, এক কথায়, বাণিজ্য-নীতি পরিচালিত করিয়া থাকেন। বাংলাদেশের মতো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ ত বটেই, সব দেশেরই বাণিজ্যনীতি নিরূপণের সময় এই কয়টি অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে:

১. দেশের প্রাথমিক অভাব ও প্রয়োজন কি কি?

২. দেশের প্রাথমিক প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ কি?

৩. দেশের প্রাথমিক অর্থনৈতিক মূল বুনিয়াদ কি?

৪. দেশের রফতানীযোগ্য ও আমাদানিযোগ্য বস্তুর সমাহার কোথায়?

আলোচ্য আমাদানি-নীতিতে এসব প্রশ্নের বিচার করা হইয়াছিল অথবা এসব কথা স্মরণ রাখা হইয়াছিল, তার কোনও প্রমাণ বাণিজ্যমন্ত্রীর ভাষণে পাওয়া যায় নাই। আমাদের দৈনন্দিন বৈদেশিক লেনদেনের মতই বৈদেশিক বাণিজ্যের আসল বিচার্য হইল টার্ম-অব-ট্রেড অর্থাৎ কারবারের শর্ত। তার মানে কি দিয়া কি পাইলাম? এই 'শর্ত' কথা বুঝিবার জন্য 'বার্টার ট্রেড' বা বিনিময় বাণিজ্যের নজিরটা লওয়া যাক। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-মহলে 'টার্ম-অব-ট্রেড' কথাটা 'বার্টার ট্রেডে'ই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। 'বার্টার ট্রেড' বা বিনিময় বাণিজ্যে পণ্যের দাম আদান-প্রদান হয় না, পণ্যের বদলে পণ্য দেওয়া-নেওয়া হয়। মনে হইবে, ভারি সুবধা ত। আমার যেটা কার্টেল আছে, সেইটা আপনাকে দিলাম। আপনার যেটা কার্টেল ও আমার ঘাটতি আছে, সেইটা আমাকে দিলেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অত সহজ ও সুবিধার নয়। এর মধ্যে 'কারবারের শর্ত' আছে এবং খুব বেশি করিয়াই আছে। কারণ এই এওয়াজ বদলের দুইটা জিনিসেরই দাম ধরা হইয়াছে। এই ধরা দাম সমান হইয়াছে বলিয়াই উভয়পক্ষ এওয়াজ বদলে রাজি হইয়াছেন। এই দাম ধরাটাই হইল আসল ব্যবসা। আমার জিনিসটার ন্যায্য বাজার মূল্য আপনার জিনিসটার ন্যায্য বাজার মূল্যের সমান হইলেই বলা যাইতে পারে, এটা সত্য সত্যই বিনিময় বাণিজ্য হইল। এক পক্ষ বেকায়দায় পড়িয়া আমার অল্প দামের জিনিসটা নিয়া তার বদলে তাঁর বেশি দামের জিনিসটা দিতে বাধ্য হইলে এটাকে প্রকৃত অর্থে বিনিময়-বাণিজ্য বলা যায় না। অসহ্য ক্ষিধার তাড়নায় কেউ এক ভরির সোনার আংটির বিনিময়ে এক পোয়া চিড়া ও একটা কলা পাইলে সেটাকে বিনিময়-বাণিজ্য বলা চলিবে না।

আমরা ছয় মাসে দুই শ' উনিশ কোটি টাকার বহির্বাণিজ্য করিবার আয়োজন করিয়াছি। এ পর্যন্ত সরকার বিভিন্ন মুখপাত্রের বা প্রেসনোটের মারফত যে সব তথ্য দেশবাসীকে জানাইয়াছেন, তাতে ধরা যায় কম-বেশি এক শ' কোটি টাকা আমরা পাট, চা ও চামড়া রফতানী করিয়া আয় করিয়াছি। তের-চৌদ্দ কোটি টাকা আমরা বিনিময়-বাণিজ্যে পাইয়াছি। এ অবস্থায় ধরিয়া লওয়া যায়, কম-বেশি এক শ' কোটি টাকা আমরা

বিদেশী ঋণ পাইয়াছি। এই ঋণের টাকায় আমরা যে বিদেশে কিনাকাটা করিতে যাইতেছি, বিনিময় বাণিজ্যের মতই এখানেও 'টার্ম-অব ট্রেড' থাকার সম্ভাবনা আছে। খুব বেশি করিয়াই আছে। সাধারণতঃ থাকিয়া থাকে। ঋণের যিনি মহাজন তিনি দয়া করিয়া ঋণটাও দিয়াছেন। এই শর্তেই যে, ঐ টাকায় যে সওদা করা হইবে, সেটা করিতে হইবে ঐ মহাজনের দেশেই। মালটা খরিদ করিতে হইবে মহাজনদেশের নির্ধারিত দামেই। সে দাম আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের অনেক বেশি হইলেও আমরা কিছু বলিতে পারিব না। বুদ্ধিমানেরা বলেনও না। পাকিস্তানী আমলে বুদ্ধিমান শাসকরাও কিছু বলিতেন না। তাঁরা 'ঋণংকৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ' করিতেন। কারণ মহাজন নিজেই ছিলেন গোয়ালা। তার দেওয়া টাকা দিয়াই তাঁর দোকানের ঘি কিনিতেন। কাজেই টাকাও তাঁর ঘিও তাঁরই। ক্রেতার হিসাবের দরকার কি? ঘি এর দাম যাচাই করিবার প্রয়োজন কোথায়?

আমাদের সরকার আশা করি তা করিবেন না। এক ব্যাপারে পাকিস্তানী নেতাদের অনুসরণ করিলে অপর ব্যাপারেও তাই করিতে হইবে। পাকিস্তানী আমলে আমাদের তৎকালীন ক. মহাজন দেশের এক বড় কর্তাকে আমি বলিয়াছিলাম, 'তোমরা দয়া করিয়া আমাদেরকে টাকা ঋণ দাও তার দ্বারা আমাদের কোনই উন্নতি হইতেছে না। কারণ ঐ ঋণের টাকায় চড়া দামে যন্ত্রপাতি বিক্রয়ে এবং সে সব যন্ত্রপাতি স্থাপনের কারিগরদের মাহিয়ানা বাবত শতকরা নব্বই টাকাই তোমরা নিয়ে যাও।' তিনি কান পর্যন্ত গাল পাশ করিয়া বলিলেন; 'তবু ত তোমাদের দশ টাকা লাভ।' আমি রাগ গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম: 'ঋণটাত থাকিল আমাদেরই।' তিনি দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিলেন: 'ওটা যে তোমরা শোধ করিবেই সে আশা আমরা করি না।' কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তি-মহাজনরা যেমন দাদনের টাকা ফেরৎ চায় না, খাতকের সম্পত্তিটা চায়, জাতি-মহাজনরাও তেমনি ঋণের টাকা ফেরৎ চায় না, খাতক জাতির দেশটা চায়। এ অবস্থায় বাণিজ্যমন্ত্রীর কথিত ১৯৭২ সালের জুলাই-ডিসেম্বরের দুই শ' একষট্টি কোটি টাকার সবটুকু এবং ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি-জুনের অন্ততঃ এক শ' কোটি বিদেশী ঋণের টাকায় আমদানি করা পণ্য যে মহাজন দেশসমূহের নির্ধারিত চড়া দামেই আসিতেছে, সেটা সহজেই অনুমেয়। অতএব বিগত আঠার মাসের আমদানি ঘাটতি আমাদের দ্রব্যমূল্যের বাজারে আগুন লাগাইয়াছে এটা যেমন সত্য, আমদানি করা পণ্যের চড়া দামও এজন্য দায়ী। এটাও তেমনি সত্য। আমাদের বাণিজ্যনীতি তার মানে শুধু আমদানিনীতির অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত নীতিই এ জন্য দায়ী, এটাও আমাদের বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ঐ সঙ্গে এটাও আমাদের বুঝা উচিত যে, আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রীকে ঘোরতর অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে। সে অসুবিধা এই যে, আমাদের শিল্পনীতি আজও ঘোষিত হয় নাই। শিল্পনীতি নির্ধারণের আগে বাণিজ্যনীতি, রফতানিনীতির আগে আমদানিনীতি, এসবই ঘাড়ার সামনে গাড়ী জোড়ার ব্যাপার। উন্নত দেশে এ ধরনের নীতি চলিতে পারে। কারণ সেখানে সব কাজ হয় অটমেটিক্যালি। যার-তার এলাকার

মধ্যে সবাই যার-তার কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মতো বিকাশশীল, অনুন্নত ও বিধ্বস্ত অর্থনীতির দেশে একটার কথা না ভাবিয়া অপরটার কথা ভাবা যায় না। তাই আমাদের দেশের শিল্পনীতি অনেক আগেই নির্ধারিত ও ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল। গত ছয়মাস ধরিয়া সরকারী মুখপাত্রেরা দেশবাসীকে শুনাইয়া আসিতেছেন যে সরকারের শিল্পনীতি প্রস্তুত, দুই-এক দিনের মধ্যে ঘোষিত হইবে। কিন্তু আজও হয় নাই।

শিল্পোন্নয়ন সব দেশেই দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের জন্য শিল্পায়ন জীবন মরণ প্রশ্ন। শিল্পায়ন ছাড়া কোনও নয়া বিকাশশীল রাষ্ট্রেরই আর্থিক উন্নয়ন সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশ শিল্পায়ন ছাড়া এক পা আগে বাড়িতে পারে না। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সাবেক উপনিবেশ অনুন্নত দেশসমূহের সাধারণ অসুবিধাগুলি ত আমাদের দেশে মাটি ও মানুষের অনুপাত দুনিয়ার সর্বোচ্চ। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি এলাকা। কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা এখানে নিতান্তই সীমিত। শিল্পায়নই আমাদের একমাত্র উপায়ান্তর। এ ব্যাপারে বহুবার আমি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডাঃ কলিন ক্লার্কের মতের উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারকে উপদেশ দিয়াছিলেন : পূর্ব বাংলার শিল্পায়ন ও পশ্চিমাঞ্চলের কৃষায়নই পাকিস্তানের আর্থিক উন্নয়নের একমাত্র পথ। ১৯৫৩ সালে যা সত্য ছিল, আজও তা সত্য আছে। কাজেই স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোনও সরকারে প্রথম কাজ হওয়া উচিত এ দেশের শিল্পায়নে হাত দেওয়া। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আমাদের মতো অসুবিধার সম্মুখীন কোন দিনই ছিল না। তথাপি স্বাধীনতা লাভের সাত মাসের মধ্যে ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের গোড়াতেই ভারত সরকার তাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হওয়ার পরও ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষিত শিল্পনীতির ভিত্তিতেই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

ভারত যা করিয়াছিল স্বাধীনতা হাসিলের সাত মাসের মধ্যে, আমরা স্বাধীনতার এক বছর পরেও তা করি নাই। আজও আমাদের সরকার তাঁদের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন নাই। যেটা ছিল আমাদের সরকারের প্রথম কাজ, সেটাই তাঁরা ফেলিয়া রাখিয়াছেন পরের জন্য। অথচ অর্থনৈতিক কারণে ত বটেই, রাজনৈতিক কারণেও শিল্পনীতি ঘোষণা করা আমাদের সরকারের আশু অবশ্য কর্তব্য ছিল। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের বাশেন্দাদের মধ্যে শিল্প স্থাপনের যে স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়, সে আগ্রহের মাথায় প্রথম দিনই আমরা কুঠারাঘাত করিয়াছি। শুরু হইতেই আমরা বলিতে শুরু করিয়াছি, সব শিল্প আমরা জাতীয়করণ করিব। আমরা সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করিব। সকল প্রকার পুঁজিবাদ আমরা নির্মূল করিব। এ সবই ভাল কথা। কিন্তু কথা যতই ভাল হউক, কাজ তার চেয়ে ভাল। কাজে হাত না দিয়ে কথা বলিবার ফলে ভাল-মন্দ কোন কাজই হইল না। এক বছরেও একটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত ত হইলই না, যা ছিল তারও কাজ-কর্ম বন্ধ হইল। তবু সরকার তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য করিলেন না। শিল্পনীতি

ঘোষণা করিলেন না। আর যা করিলেন, তার প্রায় সবই ভুল হইল। শিল্প কারখানা বন্ধ হওয়ার জন্য শ্রমিকদের দায়ী করিয়া শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইল। শ্রমিক অসন্তোষ পুঁজিপতি অসন্তোষের মতই শিল্পায়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। শিল্পকারখানায় অনিশ্চয়তার অরাজকতা চলিল। উৎপাদন বন্ধ হইল। চারদিকে বিভ্রান্তি।

এই বিভ্রান্তির মধ্যে রচিত হইল সংবিধান। সংবিধানের বিধানসমূহ সে বিভ্রান্তির কুয়াশাকে করিল আরও অন্ধকার। একথা বলিয়া আমি সংবিধানের নিন্দা করিতেছি না। 'ইত্তেফাকে'র পাঠকরা জানেন, আমি সংবিধানের মোটামুটি সমর্থন করিয়াছি। আমি এটাকে দোষেগুণে ভাল বলিয়াছি। তবু শিল্পায়নের কথা বলিতে গিয়া সংবিধানের উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে সংবিধানের ব্যাখ্যার অভাবেই আমাদের শিল্পায়ন শুধু বিঘ্নিত হয় নাই, একেবারে অচল হইয়াছে। এ অবস্থার প্রতিকার করিতে পারিত শিল্পনীতি ঘোষণা। দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকার এই কাজটি করেন নাই।

এটা ছাড়া চলে না এইজন্য যে, সংবিধানে সমাজবাদকে আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি বলা হইয়াছে। সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মালিকানাকে রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত এই তিন শ্রেণীর করা হইয়াছে। কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। এই মূলনীতি বাধ্যকর নয়। এগুলিকে আদালত যোগে বলবৎ করা যাইবে না। পক্ষান্তরে, সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদে সম্পত্তির মালিকানা সংরক্ষিত করা হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য। এই অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে আইন না করিয়া কারও সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাইবে না। এ বিষয়ে আজও কোন আইন করা হয় নাই। পার্লামেন্টই বসে নাই। আগামী নির্বাচনে পার্লামেন্ট গঠিত হইবে। সেই পার্লামেন্ট এ বিষয়ে আইন রচনা করিবে। ততদিন পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি ও শিল্পকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা নিরাপদ। পার্লামেন্ট হওয়ার পরও তা নিরাপদই থাকিবে। পার্লামেন্ট হইবে জনগণের নির্বাচিত। তার মেজরিটিই সম্পত্তির মালিকানা সম্বন্ধে আইন করিবেন। মেজরিটি যা করিবেন দেশের ভালর জন্যই করিবেন। এ বিশ্বাস সকলের থাকা উচিত।

এর মধ্যে একটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে। সংবিধান রচিত হইবার আগে ব্যাংক-ইনসিওরেন্সের মতই কতকগুলি শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা হইয়াছে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার বলে। সংবিধানে এই অর্ডারটি সংরক্ষিত করা হইয়াছে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি বরাবরের জন্যই রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া গিয়াছে। এই শিল্পগুলির ব্যাপারে সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদ প্রযুক্ত হইবে না। কিন্তু সংবিধান বলবৎ হইবার আগের মুদ্দতের আরও কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান ও কারবার প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় নাই। শুধু 'টেকেন-ওভার' হইয়াছে, মানে ওসবের ব্যবস্থাপনার ভার সাময়িকভাবে সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। এসবের মালিকানা এখনও ব্যক্তিগতই রহিয়াছে।

এইসব ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এবং এখন হইতে যেসব শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইবে সেসব সম্পর্কে সরকারী নীতি কি হইবে, তা দেশবাসীকে সাধারণভাবে এবং শিল্প স্থাপনেচ্ছুক 'এনট্রেপ্রেনার'- দিগকে বিশেষভাবে, জানান সরকারের আশু ও অবশ্য কর্তব্য। এর নামই সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা। এটা না করা পর্যন্ত কোনও শিল্পোদ্যোগীই শিল্প স্থাপনে অগ্রসর হইবেন না। ব্যাংকের অথবা ব্যক্তিগত তহবিলের টাকায় লগ্নি হইবে না। সব জমা টাকা 'অলস' হইয়া ঘুমাইতে থাকিবে। শিল্পায়ন এক পা আগ বাড়িবে না। ছোট-বড়-ক্ষুদ্র-মাঝারী সব শিল্পই, বিশেষতঃ যন্ত্রচালিত সব শিল্পই, সরকারের জন্য পড়িয়া থাকিবে। সরকারের পক্ষে সব শিল্প স্থাপন-পরিচালন সম্ভব নয়। কাজেই নতুন শিল্প স্থাপনই হইবে না। নিত্য-নতুন শিল্প স্থাপনের দ্বারা জনগণের কর্ম সংস্থানের যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তার অবসান বা অন্ততঃ ব্যাঘাত ঘটিবে। বেকার সমস্যার সমাধানের যে প্রধান উপায় শিল্পায়ন, তার অভাবে আমাদের বেকার সমস্যা দিন দিন হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিবে। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্র-দ্রব্যের সবটুকুর জন্য আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইবে। শিল্পজাত রফতানী বাড়াইতে না পারিলে শুধু বিদেশী ঋণের উপর ভরসা করিয়া এসব আমদানি করা যাইবে না। নিত্যব্যবহার্য বস্তু ক্রমেই অধিকতর দুর্মূল্য ও দুর্লভ হইবে। আমাদের শিল্পায়ণ-নীতি সম্পর্কে পরে, বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। আজ কার আলোচনার জন্য শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, সরকারী শিল্পনীতি ঘোষণার আগে এই অচল অবস্থা দূর হইবে না। আমদানিনীতি হাজার শিল্প মুখী করিলেও না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য আমদানি-নীতির যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির ব্যবস্থার কথাই ধরা যাক। শিল্পের মালিক ও ব্যবস্থাবান সরকার। আমদানিকারকও সরকার। যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দরকার কার? বাণিজ্য দফতর লাইসেন্স দিবেন কাকে? কে দরখাস্ত করিবেন? গত বছর 'তিনশ ছেচল্লিশ' কোটি টাকার লাইসেন্স ইস্যু করা সত্ত্বেও যে মাত্র একশ' কোটি টাকার মাল আমদানি হইয়াছে, তার কারণ এটাই। আগামী মৌসুমে আরও অনেক কম আসিবে। ...খুব স্বাভাবিক কারণেই। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িলে এমন হইবেই।

অনিষ্ট যা হইবার হইয়াছে। আর যাতে না হয়, অবিলম্বে তা করা দরকার। আশার কথা, এখনও সময় আছে। আমদানির এই ছয়-মাস মৌসুমের শুরুতেই শিল্পনীতি ঘোষণা করিলে এবং সে নীতি ঘোষণায় বৃহৎ ও ভারী শিল্প বাদে সব শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিত করিলে এ বিপদ কাটিতে পারে। আগামী নির্বাচনের আগেই এটা করা দরকার। কারণ এরই উপর আমাদের গণতান্ত্রিক আর্থিক উন্নয়ন নির্ভর করিতেছে।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৩

সরকারী শিল্প লগ্নি নীতি অসম্পূর্ণ কিন্তু বাস্তবানুগ

আমাদের শিল্পমন্ত্রী অবশেষে সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন দেখিয়া আমি খুশি হইয়াছি। বোধ হয় সবার চেয়ে, এমনকি স্বয়ং সরকারের চেয়েও, খুশি হইয়াছি। আমি গত প্রবন্ধে এ বিষয়ে সরকারকে তাগিদ দিয়াছিলাম বলিয়াই তাঁরা এটা করিয়াছেন, এমন দাবি আমি করিতেছি না। তবু আমার তাগিদী প্রবন্ধ প্রকাশের পরে সরকার তাঁদের শিল্পনীতি ঘোষণা করায় আমার গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত আছে। কিন্তু আমার আনন্দ অন্য কারণে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার, যে সরকারের জনপ্রিয়তা আছে, সে সরকারের সুনাম আমার কাম্য, সেই সরকার দেশের স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেও শিল্প-নীতি ঘোষণা করেন নাই বলিয়া মনে মনে আমি লজ্জাবোধ করিতেছিলাম। সে কারণ আজ দূর হইল। এটাই আমার খুশির ব্যাপার। গর্বের বিষয়। ঘোষিত শিল্পনীতি আমার পছন্দ হইয়াছে কি না, সেটা পরের কথা এবং আলাদা কথা।

এইবার শিল্পনীতির বিষয়বস্তুর আলোচনা করা যাউক। ঘোষিত শিল্প-নীতি ঠিক হইয়াছে কি না, এটা বুঝিতে হইলে আগে আমাদের বুঝিতে হইবে, সরকারী শিল্পনীতিতে উন্নয়নশীল সব দেশে সাধারণভাবে এবং আমাদের দেশে বিশেষভাবে, কি কি বিষয়বস্তুর উল্লেখ থাকা উচিত। কাজেই সে আলোচনাটাই আগে করা যাউক। সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত সাবেক উপনিবেশসমূহের সরকারী শিল্প-নীতিতে এই কয়টি মূলনীতি নির্ধারিত হইতেই হইবে :

১. পাবলিক ও প্রাইভেট (সরকারী ও বেসরকারী) সেক্টরের এলাকা ও সীমা নির্ধারণ।
২. শিল্পায়নের প্রায়োরিটি বা অগ্রগণ্যতা ঘোষণা।
৩. পুঁজি-মুখী ও শ্রম-মুখী শিল্পের সামঞ্জস্য ও অনুপাত নির্দেশ।
৪. খাদ্য উৎপাদন-ভিত্তিক ও বস্ত্র উৎপাদন-ভিত্তিক শিল্পের যোগসূত্র নিরূপণ।
৫. ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ভারী শিল্পের অনুপাত স্থানীয় মান নির্ধারণ।
৬. কুটির-শিল্পের ভবিষ্যৎ নিরূপণ।
৭. রফতানী-মুখী শিল্প ও আমদানি-বদলা শিল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ।
৮. জাতীয় ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ-ভিত্তিক শিল্পের অগ্রাধিকার নির্দেশন।
৯. কনজিউমাস ও প্রডাকটিভ অর্থাৎ খরচাবস্তু ও উৎপাদক দ্রব্য-শিল্পের সামঞ্জস্য বিধান।
১০. দেশের সকল অঞ্চলে শিল্প প্রসারণ এবং
১১. বিদেশী পুঁজির ভূমিকা ও এলাকা নির্ণয়ন।

এই এগার দফা মূলনীতি ছাড়া আমাদের দেশের বেলায় একটা বিশেষ অবস্থা রহিয়াছে। আমাদের সংবিধানে-বর্ণিত সমাজবাদের মোকাবিলায় ১৩নং অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা কর দরকার ছিল। এটাও ছিল শিল্প-নীতির বিষয়বস্তু।

এই সবগুলি বিষয়েরই খুঁটি-নাটি সরকারী শিল্পায়ন নীতিতে উল্লেখ থাকিতে হইবে, তা নয়। এ সবের সুস্পষ্ট নির্দেশনামা ও খুঁটিনাটি বিবরণ থাকিবে পাঁচসালা পরিকল্পনায়। শিল্পনীতিতে ঘোষিত হইবে শুধু মূলনীতি ও পরিচালন-নীতি বা গাইড লাইন। এই মাপকাঠিতে মাপিয়া আমাদের বলিতেই হইবে যে, শিল্পমন্ত্রী-ঘোষিত শিল্পনীতি মোটামুটি বেশ সুন্দর ও বাস্তবানুগ হইয়াছে। কয়েকটি বিষয় ছাড়া উপরে বর্ণিত সবগুলি বিষয়েই সরকারী ঘোষণা ও শিল্প-মন্ত্রীর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইয়াছে। যদিও এই ঘোষণায় মূলনীতির সব কথা বলা হয় নাই; যতটুকু বলা হইয়াছে, মোটামুটি ঠিকই বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ এই নীতি ঘোষণাকে শিল্প-লগ্নি-নীতি না বলিয়া শুধু শিল্পনীতি বলিলেই ভাল হইত। লগ্নি-নীতি বলিয়া সরকার তাঁদের ঘোষণার ক্ষেত্র ও এলাকা প্রসারিত করিয়াছেন। কিন্তু ঘোষণায় এলাকার সবটুকু কভার করেন নাই। মন্ত্রী সাহেবের কথায় মনে হয় সে সব কথা পরিকল্পনা রচয়িতাদের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ওটা নিশ্চয়ই সুখবর। কিন্তু ও কথার দ্বারা তিনি যদি বুঝাইয়া থাকেন যে, শিল্পায়নের সামগ্রিক এলাকা নির্ধারণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিকল্পনা-রচয়িতাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তবে কাজটা ভাল হয় নাই। পরিকল্পনা রচয়িতাদের বোঝা অতিশয় ভারী করিয়া ফেলিয়াছেন। সরকার নিজের দায়িত্ব পরিকল্পনা রচয়িতাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। মন্ত্রী সাহেব তাঁর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন : 'শিল্পোন্নয়নের প্রধান এলাকা নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার নিরূপণ করিয়া ব্যাপক শিল্প-নীতি ঘোষণা শুধু প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যেই করা যাইতে পারে।' কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। শুধু ভুল নয়, প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত। শিল্পমন্ত্রীকে এই উপদেশ কে দিয়াছেন জানি না। কিন্তু উপদেশটা ভুল। পাঁচসালা পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয় না। বরং সরকার ঘোষিত শিল্পায়ননীতির বুনিয়াদেই পাঁচসালা পরিকল্পনার কাঠামো রচিত হয়।

এই মৌলিক ভুলের দরুণই মন্ত্রী সাহেব ঘোষিত সরকারী শিল্পনীতি 'শিল্প-লগ্নি-নীতি' হইয়াছে। এই কারণেই শিল্পনীতির উপরে বর্ণিত এগার দফার মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বাদ পড়িয়াছে মানে পরিকল্পনা রচয়িতাদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই পরিকল্পনা রচয়িতা অর্থবিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের কাজ মন্ত্রী সাহেব নিজে করিয়াছেন; আর মন্ত্রী সাহেবের রাজনীতি-নির্ধারকের দায়িত্ব অর্থ বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের কাঁধে চাপাইয়াছেন। ফলে, অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, সরকার শিল্পনীতি ঘোষণায় পাবলিক প্রাইভেট ও দেশী বিদেশী সেক্টরের এলাকা, ক্যাটাগরি ও শিল্প শ্রেণীর কথা না বলিয়া মূলধন ও মূল্যের কথা বলা হইয়াছে।

এতে বাস্তব ও নৈতিক উভয় প্রকারের ভুল হইয়াছে। কোন শ্রেণীর কোন শিল্পের কত মূলধন লাগিতে পারে এটা বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। সরকার এই কাজটি পরিকল্পনা রচয়িতাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, পঁচিশ লাখ টাকা মূলধনেও এমন শিল্প স্থাপন করা যায়, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই যে শিল্প বিদেশী, এমন কি বেসরকারী মালিকানা থাকা উচিত হইবে না। ইনভেষ্টমেন্ট বোর্ডের অনুনতি সাপেক্ষতা এর যথেষ্ট প্রতিষেধক নয়।

এই ধরনের কতিপয় ত্রুটি ছাড়া শিল্পমন্ত্রী ও সরকার দেশের শিল্পপ্রয়োজন ও সরকারী কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট চেতনার ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের বুনিয়াদী প্রয়োজনের মাপকাঠিতে আমাদের প্রধান প্রধান শিল্পোন্নয়ন এলাকা নির্ধারণ, আমদানির উপর আমাদের নির্ভরতা দূরীকরণ, আমাদের নিজস্ব জাতীয় সম্পদসমূহের শিল্পকরণ, শিল্প প্রসারের দ্বারা দেশবাসীর কর্মসংস্থান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-কারখানা বিস্তারের দ্বারা সকল অঞ্চলের জন্য উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সমতাবিধান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, বিদেশী পুঁজির ভূমিকা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে শিল্পমন্ত্রীর প্রেস বিবৃতিতে যেসব কথা বলা হইয়াছে, তাতে আমাদের শিল্প-প্রয়োজন সম্বন্ধে সরকারের নির্ভুল উপলব্ধির চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি যে, অন্যান্য ব্যাপারেও সরকারের ধারণা এমনি সুস্পষ্ট ও নির্ভুল রহিয়াছে। কৃষি সহায়ক ও খাদ্য উৎপাদক শিল্পের অগ্রাধিকার পুঁজি-মুখী শিল্প ও শ্রমমুখী-শিল্পের অনুপাত ও সামঞ্জস্য রফতানী বর্ধক শিল্প আমদানি বদলা শিল্প, সর্বোপরি ভারী শিল্প ও মেশিন-টুল-শিল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে ও তাদের প্রাইওরিটির ব্যাপরেও সরকারী সিদ্ধান্তের উপর দেশবাসী নির্ভর করিতে পারে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমাদের কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির জন্য সার ফার্টিলাইজার শিল্পের এবং আমাদের নদী-মাতৃক দেশের রাস্তাঘাট পুল ও দালান-ইমারতের জন্য সিমেন্ট শিল্পের গুরুত্ব ও আশু প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের সরকার কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। আমাদের শিল্প উদ্যমের প্রতিবাদে বিদ্যুতের প্রয়োজন সুস্পষ্ট ও সর্বজন-বিদিত। কাজেই থার্মাল ইলেকট্রিসিটি ও হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির পরিপূরক হিসাবে এটমিক এনার্জি হইতেও আমাদের বিজলী সংগ্রহ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, পাকিস্তানী আমলে এটমিক এনার্জি কমিশন বাংলাদেশের এটমিক গবেষণায় যথেষ্ট অবিচার করিয়াছিল। রূপপুর তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। এখন আমাদের সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। আমাদের নিজস্ব এটমিক এনার্জি কমিশনকে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার ছাড়াও পাওয়ার রিয়েক্টারও স্থাপন করিতে হইবে। একদিকে আইসোটপের সাহায্যে যেমন কৃষি উৎপাদনে ফার্টিলাইজারের সম্পূরণ করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি এটমিক পাওয়ার দ্বারা আমাদের তাপ-বিজলী ও পানি-বিজলীর সম্পূরণ করিতে হইবে।

সিমেন্ট শিল্পে সরকারকে বিশেষ তৎপর হইতে হইবে। ছাতকে আমাদের একমাত্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরী অবস্থিত। অথচ পাক আমলে নানা দিক হইতে এর অনিষ্ট করা হইয়াছে। এটির উন্নতি বিধান ছাড়াও আরও সিমেন্ট ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে হইবে। এটা খুবই আনন্দের কথা যে, আমাদের সরকার ভারত সরকারের সাথে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির জন্য চুনাপাথর সরবরাহের একটি চুক্তি করিয়াছেন। এই চুক্তির শর্তাবলী প্রকাশিত না হওয়ায় এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছুটা না বলিয়া পারিতেছি না। সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চীপ ইঞ্জিনিয়ার ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য দেড় লক্ষ টন সিমেন্ট চাহিয়াছিলেন। ঐ সময় ছাতক ফ্যাক্টরির উৎপাদন ছিল মাত্র ৪৭ হাজার টন। ফ্যাক্টরির মালিকগণকে আমরা এক লক্ষ টন উৎপাদনের নির্দেশ দেই এবং প্রয়োজন মতো মিল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করি। ফ্যাক্টরি-মালিকরা '৫৭ সালের মাঝামাঝি এক লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদনের সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলেন। বাকি ৫০ হাজার টনের জন্য এই ব্যবস্থা হয় যে, ভারত তার উৎপাদন হইতে ঐ পরিমাণ সিমেন্ট পূর্ব পাকিস্তানকে দিবে এবং তার বিনিময়ে ঐ পরিমাণ সিমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতকে দেওয়া হইবে। পরে ছাতক ফ্যাক্টরির আরও সম্প্রসারণ করিয়া এবং রোপওয়ের উন্নতি-বিধান করিয়া চুনাপাথর সরবরাহ বৃদ্ধি করতঃ উৎপাদন আড়াই লক্ষ টনে উন্নিত করার পরিকল্পনাও করা হইয়াছিল। এ বিষয়ে ভারতস্থ চুনাপাথরের এলাকাটি নিরানব্বই বছরের লীজ দিতেও ভারত সরকার রাজি ছিলেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে এ বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। বরং ভারতের সংগে 'যুদ্ধংদেহী' নীতি অবলম্বন করিয়া ছাতক ফ্যাক্টরিটি কার্যতঃ অচল করা হয়। এই পনর বছরের অবহেলায় বাংলাদেশের একমাত্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরিটি আজ মৃতপ্রায়। অথচ এতদিনে বাংলাদেশের একমাত্র সিমেন্ট চাহিদা দেড় লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া চার লক্ষ টনে উঠিয়াছে। সিমেন্টের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা আজ বাংলাদেশের সকল প্রকার নির্মাণ কাজ প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। সুতরাং এদিককার আশু কর্তব্য সম্বন্ধে সরকার নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সজাগ রহিয়াছেন।

তারপর থাকিল বিদেশী লগ্নি ও শিল্পের মরেটরিয়ামের কথা। বলিতে গেলে এই দুইটিই আলোচ্য শিল্প-নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। সরকার এই দুইটি নীতি ঘোষণা করিয়া খুব জরুরী কর্তব্য সাধন করিয়াছেন। বস্তুত এই ধরনের সরকারী নীতি ঘোষণার অভাবে এতদিন নয়া শিল্প স্থাপনের সকল উদ্যোগ ও উৎসাহ স্থগিত ছিল। সরকার আশা করেন যে, এই ঘোষণার ফলে বিদেশী ও দেশী পুঁজিপতিরা বাংলাদেশে শিল্পস্থাপনে অগ্রসর হইবেন। শিল্পমন্ত্রি তাঁর প্রেস বিবৃতিতে বলিয়াছেন: আমাদের আশা এই যে, 'আমাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলের মনের সন্দেহ দূর হওয়ায় এখন তাঁরা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে তাঁহাদের মূল্যবান ভূমিকা পালনে অগ্রসর

হইবেন।' শিল্পমন্ত্রীর এই আশায় আমরাও শরিক হইতেছি। সমাজবাদের ডর দেখাইয়া এবং জাতীয়করণের হুমকি দিয়া সরকার দেশী-বিদেশী সকল পুঁজিপতিকে যেরূপ ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাতে সরকারী উদ্যোগ ছাড়া বাংলাদেশের শিল্পায়নের আর কোন দ্বিতীয় রাস্তা খোলা ছিল না। অথচ একা সরকারের পক্ষে এতবড় দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিল না। সুখের বিষয়, সরকার এটা উপলব্ধি করিয়াছেন। শিল্পমন্ত্রী বলিয়াছেন: 'বর্তমান স্তরে সরকারকে যদি সব শিল্পের মালিকানার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেটা হইবে সরকারী ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত চাপ। শুধু অতিরিক্ত চাপ নয়, একবারেই অসম্ভব বলিলেই ঠিক কথা বলা হইত। যা হউক কথাটা বলিয়া শিল্পমন্ত্রী বাস্তববুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। এটা খাঁটি সত্য কথা যে, যথাসম্ভব অল্পসময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে শিল্পায়িত করিতে হইলে দেশী-বিদেশী উভয় প্রকারের প্রাইভেট পুঁজির দরকার হইবেই। শিল্পমন্ত্রী সংবিধানের 'মূলনীতির' দিকে নজর রাখিয়া এটাকে মিশ্র-অর্থনীতি বলিতে অস্বীকৃতি জানাইলেও এটাই আসলে মিশ্র অর্থনীতি : পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের সহঅবস্থান। এক দিকে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'লেযাসফেয়ার' বা অবাধ পুঁজিবাদ আজ দুনিয়ার কোথাও নাই। অপরদিকে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিল্পকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই ন্যাশনালিযেশন বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় না। ইংরাজ আমলেও রেল, ডাক, তার ও অস্ত্র নির্মাণ রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল।

ইংল্যাণ্ডেও আজ বহু প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত। তাতেই আগের বৃটিশ ভারতে এবং বর্তমান ইংলণ্ডে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় নাই। গণতন্ত্র যেমন একটা রাজনৈতিক জীবনধারা, সমাজবাদও তেমনি একটা অর্থনৈতিক জীবন-ধারা। সংবিধানে লেখা থাকিলেই যেমন কোনও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়া যায় না, সংবিধানে লেখা থাকিলেই তেমনি সমাজবাদ প্রবর্তিত হইয়া যায় না। কাজেই শিল্পমন্ত্রীর ওতে শরম পাইবার কিছু নাই। বিশ পঁচিশ লাখ টাকার নিচের মূলধনের শিল্প লইয়া বিব্রত হইবার সময় যেমন সরকারের নাই, শত শত কোটি টাকার বড় বড় প্রকল্প হাতে লওয়ার ক্ষমতাও তেমনি সরকারের নাই। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, তিস্তা ও গঙ্গা-কপোতাক্ষ ব্যারাজ স্কিম, যমুনা নদীর বাঁধ ও তৎসংলগ্ন পানি-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার দরকার হইবে। এদের বরাদ্দ খরচের অর্ধেকেরও বেশি হইবে বিদেশী মুদ্রায়। এসবের নির্মাণ সমাপনে বিদেশী বিশেষজ্ঞের সেবা-সহযোগিতা হইবে অপরিহার্য। কল-কব্জার সবই আমদানি করিতে হইবে বিদেশ হইতে। এ অবস্থায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার অজুহাতে 'বিদেশী লগ্নি হইতে দিব না' বলা শুধু অবাস্তব হইবে না, কার্যতঃ দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার শত্রুতা করাই হইবে। দেশে-পঁচিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি লইয়াও 'সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের গম সাহায্য লইব না', বলিতে পারেন শুধু শহরবাসী তাঁরাই যাঁরা টয়োটা-মাজদা চড়িয়া 'চাইনিজ' খাইতেছেন। ভুখা জনগণের প্রকৃত নেতারা এসব কথা বলিতে পারেন না।

কাজেই 'সুবিধাজনক ও লোভনীয় শর্তে' বিদেশী পুঁজিপতিদের আমন্ত্রণ করিয়া সরকার ঠিক কাজই করিয়াছেন। বরঞ্চ আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় 'সুবিধাজনক শর্তগুলি' কিছুটা 'অতিরিক্ত লোভনীয়' হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য এই যে, সরকার বিদেশী পুঁজিপতিদের অধিকার খর্ব করিতে গিয়া তাঁদের অধিকতর সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বলা হইয়াছে 'যুক্ত প্রকল্পসমূহে আমাদের সরকারের থাকিবে শতকরা ৫১ ভাগ ও বিদেশী পুঁজিপতিদের থাকিবে ৪৯ ভাগ।' মেজরিটি-মাইনরিটি শেয়ারের প্রশ্ন উঠে প্রাইভেট ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব ও পরিচালন-ক্ষমতা লাভের জন্য। আলোচ্য প্রকল্পসমূহে আমাদের সরকারের অধিকার ভোটের জোরে নয়, রাষ্ট্রক্ষমতায়। পরিচালনার অধিকার লইয়াও তর্ক উঠিবে না। এই নীতি-ঘোষণাতেই বলা হইয়াছে, যেসব প্রকল্পে দেশী দক্ষ লোক পাওয়া যাইবে না সেগুলির পরিচালনভার লগ্নিকারকদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এতে তর্ক বা সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই যে, সব না হইলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বিদেশ হইতেই আনিতে হইবে। এ অবস্থায় প্রকল্পের ৫১ভাগের মালিকানা পাইয়া সরকারের কি লাভ হইল? লাভ ত হইল না, বরঞ্চ আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় লোকসান হইল। অথচ সরকার যদি সব মালিকানা বিদেশী লগ্নিকারকদের দিয়া দিতেন অথবা যুক্ত প্রকল্পের প্রতীকস্বরূপ একটি মাত্র শেয়ার রাখিতেন, তবে কি হইত? প্রকল্পের সবটুকু মূলধন বিদেশী লগ্নিকারকরাই বহন করিতেন। প্রায় সব অবস্থায়ই লগ্নিকারকরা তাঁদের স্বদেশে তৈয়ারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবেন। সরকারী নীতি অনুসারে ঐ সব যন্ত্রপাতি দিলেই তাঁদের শেয়ার মূল্য শোধ হইয়া গেল। তাঁদের দেশী যন্ত্রপাতি বিক্রয় হইল এটাই তাঁদের প্রথম লাভ। অতঃপর প্রকল্প সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সব খরচ আমাদের সরকারকেই বহন করিতে হইবে। এসব খরচের মধ্যে আছে স্পেয়ার-পার্টস খরিদ, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বেতনের রিপ্যাট্রিয়েবল অংশ (প্রত্যেক মাসে দেড়শ পাউণ্ড), এবং ডিভিডেন্ড। এ সবই দিতে হইবে বিদেশী মুদ্রায়। অথচ মূলধনের সাকুল্য বা অধিকাংশ যদি বিদেশী পুঁজিপতিদের হইত তবে যন্ত্রপাতি খরিদের পর উদ্ধৃত্ত টাকাতেই এসব দেনা শোধ করা যাইত। এ ব্যবস্থা সরকার কেন করিলেন না, তা বুঝা সহজ নয়। এমন ঘটনা ইতিমধ্যেই দুই-একটা ঘটিয়াছে। সকলেই জানেন, পাকিস্তানী আমলে বিদেশী লগ্নিকারকরা স্বাভাবিক কারণেই রাজধানীর বগলে থাকিবার জন্য তাঁদের শিল্প-কারখানা করাচী বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও স্থানে স্থাপন করিতেন। ঔষধের কারখানা এই শ্রেণীর শিল্পের অন্যতম প্রধান। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান ঔষধ শিল্পে স্বয়ং-নির্ভর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আঞ্চলিক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঔষধ চাহিদার শতকরা ৭৫ ভাগ আসিত পশ্চিম পাকিস্তান হইতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর এদের কেউ কেউ বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সরকারী শিল্প-নীতি ঘোষণা না হওয়ায় তাঁরা নাকি প্রস্তাব দিয়াছিলেন যে, তাঁদের দেওয়া আমদানি লাইসেন্সের

পরিমাণের দ্বিগুণ টাকার ঔষধ আনিতে দেওয়া হউক। লাইসেন্সের অতিরিক্ত টাকাটা বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা থাকিবে। সরকার শিল্প-নীতি ঘোষণা করিলে ঐ সময় জমা টাকা দিয়া কারখানা স্থাপন ও পরিচালন করা যাইবে। শুধু যন্ত্রপাতি আমদানির জন্যই বিদেশী মুদ্রা লাগিবে। সরকার যদি তখন বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর নাও করিতেন তবু বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারীরা বাংলাদেশে তাঁদের জমা টাকার মায়াতেই নিজ খরচে যন্ত্রপাতি আনিতে বাধ্য হইতেন। এই সময়ে দেশে ঔষধের দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। তথাপি সরকার নগদ বিদেশী মুদ্রার ঔষধ কিনিলেন,বাকি দামে বাংলাদেশী টাকায় কিনিলেন না। এটা 'সমাজবাদী' কমপ্লেক্স বা 'কোনদিকে না জানি ঠকিয়া যাই', 'অত উদারতার পিছনে নিশ্চয়ই কুমতলব আছে' এই ধরনের অজানা ভীতি?

এসব ভীতি অমূলক। ঘোষিত মরেটরিয়াম দেশী শিল্পপতিদের কাজে লাগিবে। বুদ্ধিমান বিদেশী লগ্নিকারকেরা মরেটরিয়ামের দশ বছর ও গুটাইবার দশ বছর একুনে বিশ বছরে তাঁদের লগ্নির টাকা সুদে আসলে উঠাইয়া নিতে পারিবেন সরকারের দেওয়া 'ক্ষতিপূরণ বাদেই' মূলধনের ৪৯ অংশ দিয়া সরকার তাঁদের এই কাজটি অধিকতর সহজসাধ্য করিয়াছেন। তবু এ সম্পর্কে সরকারী নীতি মোটামুটি ভালই হইয়াছে। দশ-বিশ বছরের মরেটরিয়ামের ওয়াদা পালনের জন্য আওয়ামী লীগ গদিনশীন থাকিবে এটা বিদেশী পুঁজিপতিরা এবং ঐ সঙ্গে দেশী পুঁজিপতিরাও ধরিয়া নিতে পারেন।

ক্ষুদ্র শিল্পের পারমিশন ও কুটির শিল্পের কর্পোরেশনের প্রস্তাবটা আমার ভাল লাগিল না। এতে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগে অযথা বিলম্ব ঘটিবে। যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল খরিদের লাইসেন্সের জন্য এদের ই আই সির কাছে আসিতেই হইবে। প্রার্থীদের বোনাফাইডি তস্‌দিক্ করিবার জন্য তার দফতরের অনুসন্ধানই যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া উচিত।

কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের নাম বদলাইয়া কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ফাইনান্স কর্পোরেশন রাখিলেই চলিবে। কর্পোরেশনের নিজের পক্ষে কোনও কুটির শিল্পে হাত দেওয়া সম্ভবও নয় উচিতও নয়। অথচ কুটির শিল্পদের অর্থ সাহায্য ও অন্য প্রকারের সহায়তা ও উপদেশের দরকার আছে।

আশা করি সরকার এ কয়টি বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিবেন।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৭৩

•

সুখী ও সন্তুষ্ট শ্রমিক-শক্তিই শিল্পোন্নয়নের একমাত্র গ্যারান্টি

আমাদের অর্থনৈতিক জাতীয় জীবনে সামগ্রিকভাবে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাই আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সরকারী নীতি। আবার শিল্পায়নই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মপন্থার প্রধান পদক্ষেপ। শিল্প ক্ষেত্রে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমরা চলতি শিল্পসমূহের অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ব করিয়াছি। ভবিষ্যতের বৃহৎ ও ভারী শিল্পসমূহও রাষ্ট্রের মালিকানায় স্থাপন করা হইবে বলিয়া সরকারী শিল্প-লগ্নি-নীতি ঘোষণায় বলা হইয়াছে।

তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, শিল্প-শ্রমিকদের দায়িত্ব কি? অধিকারইবা কতটুকু? প্রশ্নটা সরকার তুলেন নাই। তোলা হইয়াছে শ্রমিকদের তরফ হইতেই। সরকারের মতে শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া যাওয়ার পর শ্রমিকদের আর দর কষাকষির মওকা নাই। সে অধিকারও কাজেই তাঁদের থাকিতে পারে না। শ্রমিকদের সমবেত দর-কষাকষি কলেকটিভ বার্গেনিং, তার মানে ষ্ট্রাইক করিবার যে মৌলিক অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত, আমাদের সরকার গত অক্টোবরে ঘোষিত তাঁদের শ্রমনীতিতে সেই ষ্ট্রাইক নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আমি যথাসময়ে এই সরকারী ঘোষণার সমালোচনা করিয়াছিলাম। শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এমনকি সরকারের সমর্থক প্রতিষ্ঠান শ্রমিকলীগও সরকারের ঐ ঘোষণার প্রতিবাদ ও উহা প্রত্যাহারের দাবী করিয়াছিলেন। সরকার এত দিন শ্রমিকদের ঐ প্রতিবাদে কান দেন নাই। কিন্তু মাত্র কয়েক দিন আগে শিল্পমন্ত্রী তার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সরকার তাঁহাদের পূর্ব ঘোষিত শ্রমনীতি পুনর্বিবেচনা করিতেছেন। ঐ পুনর্বিবেচনায় সরকার শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার অধিকার ফিরাইয়া দিবেন কি না, তা বুঝা যায় নাই। শিল্পমন্ত্রী তেমন কোন আশ্বাসও দেন নাই বা ইঙ্গিত করেন নাই। তথাপি শিল্পমন্ত্রী এক শ্রমিক সমাবেশে ঐ ভাষণ দিয়াছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃই শ্রমিকরা আশা করিতে পারেন যে, সরকার তাঁদের শ্রমনীতিকে শ্রমিকদের অনুকূলে সংশোধন করিবেন। সমাজবাদের মোকাবিলায় শ্রমনীতি নির্ধারণ একটা দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ সে সমাজবাদ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। আমাদের সরকারের লক্ষ্যও গণতন্ত্রী সমাজবাদ। গণতন্ত্র ও সমাজবাদ উভয়টাই আমাদের সংবিধানে সুনিশ্চিত। এ অবস্থায় গণতন্ত্রের পথ ছাড়া অন্য কোনও পথে সমাজবাদে পৌঁছার উপায় আমাদের সামনে খোলা নাই। যারা গণতন্ত্র বাদ দিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজবাদ স্থাপন করিতে চান, তারা অবশ্য সংবিধানের বাধা মানিবেন না। গণতন্ত্র তাঁদের কাছে বড় নয়, সমাজবাদই বড়। কিন্তু যাঁরা সংবিধান মানেন তাঁরা গণতন্ত্রের লম্বা প্রসেসের মধ্য দিয়াই সমাজবাদ প্রবর্তন করিতে বাধ্য। তাঁদের সামনে কোন সোজা ও খাট রাস্তা নাই।

কাজেই আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে, এ অবস্থায় শ্রমিকদের অধিকার সংকুচিত করা ন্যায়সংগত বা আবশ্যক কি-না। সমাজবাদী রাষ্ট্রে দর কষাকষি বা কলেকটিভ বার্গেনিং এর, সুতরাং ধর্মঘট করিবার, অধিকারের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ, শ্রমিক মালিক না হইলে মজুরির দর-কষাকষি কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। শ্রমিক-আন্দোলনের জন্মই হইয়াছে পুঁজিবাদীদের মোকাবিলায় তাঁদের নিকট হইতে শ্রমের ন্যায্যমূল্য আদায় করিবার জন্য। সমাজবাদী রাষ্ট্রে মেহনতী জনতাই, তার মানে শ্রমিকরা নিজেরাই, সমস্ত শিল্পের মালিক। সব উৎপাদনযন্ত্রেরই এমনকি গোটা রাষ্ট্রেরই একচ্ছত্র মালিক তাঁরা। 'একচ্ছত্র' এই জন্য যে, যে রাষ্ট্রে 'তথাকথিত' বুর্জুয়া গণতন্ত্র বা ভোটাভোটির কারবার নাই। সেখানে চলে ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেটারিয়েট। সর্বহারা শ্রমিকদের একনায়কত্ব। শিল্প কারখানা সেখানে শ্রমিকদের সকলের ও প্রত্যেকের। কাজেই শ্রমিকরা শ্রম করিতেছে নিজেদের সম্পত্তিতে। নিজের ক্ষেত-খামারে বা মিল কারখানায় কাজ করিয়া কেউ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করিয়াছে কোন দিন? অতএব, যুক্তিসঙ্গত কারণেই সমাজবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার থাকিতে পারে না। তার মানে, সে অধিকার নাই।

জনগণের, সুতরাং শ্রমিকদেরও স্বাধীনতা ও অধিকার সংকোচনের একাধিক যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু গণ-মালিকানার যুক্তিতে এটা করা যুক্তি ও ন্যায়সংগত কি না, তার বিচার করা যাউক। আমাদের রাষ্ট্র আজও সমাজবাদী হয় নাই। সমাজবাদী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বলা যায়, আধাপথে আগ বাড়িয়াছে। কতক শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছে আর কিছুতে ব্যক্তিগত মালিকানা রহিয়াছে। সংবিধানে 'উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের' তিন কিসিম স্বীকার করা হইয়াছে; রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তিগত। স্পষ্টতঃই আমাদের দেশের শ্রমিকরাই শিল্পের মালিক, এই যুক্তিতে তাঁদের কলেকটিভ বার্গেনিং-এর মৌলিক অধিকার সব শিল্পের ক্ষেত্রে হরণ করা যায় না। যে সব রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সমাজবাদী হইয়াছে, মানে যে সব দেশে সব উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিতরণ সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে, সেখানকার কথাই আগে আলোচনা করি। তাতেই আমাদের দেশের অবস্থাও বলা হইয়া যাইবে।

সমাজবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকদের কলেকটিভ বার্গেনিং এর অনাবশ্যকতা বলা হয় দুইটি যুক্তির বলে। এক. শিল্পের মালিক স্বয়ং শ্রমিকরা। দুই, পুঁজিপতিদের শিল্পের মতো সমাজবাদী শিল্পে মুনাফা করা হয় না। এই দুইটা দাবির মধ্যে মালিকানার দাবিটারই আলোচনা করা যাউক আগে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিক শ্রমিকরা। এ কথাটার বাস্তব তাৎপর্য কি? কি হিসাবে কোন্ দিকে তাঁরা শিল্পের মালিক? দান-বিক্রি, ভোগ দখল, পরিচালনা-হস্তান্তর ইত্যাদি মালিকানার যে সব বাস্তব রূপ আছে, তার কোন্টা শ্রমিকরা করিতে পারে? ব্যক্তিগত মালিকানার কথা বাদ দিলেও এজমালি মালিকানারই কোন্ দিকটা তারা ভোগ বা দাবি করিতে পারে? যে কোনও শ্রমিক যে কোনও শিল্পে যখন ইচ্ছা

কাজ করিতে বা বেতন দাবি করিতে পারে? না, পারে না। সব জায়গাতেই চাকরি দেওয়া-নেওয়া আছে। রাষ্ট্র জনগণের হইলেও তার যেমন পরিচালনার জন্য সরকার থাকে, শিল্প শ্রমিকদের হইলেও তা পরিচালনার জন্য ম্যানেজার ডিরেক্টর থাকেন। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মালিক স্বয়ং আল্লাহ্। তাও 'ম্যানেজ' করেন মোতাওয়াল্লিরা। এই সবই সুপরিচালনার জন্য পরিচালক-ম্যানেজার দরকার। শৃংখলা ও ডিসিপ্লিন আবশ্যক। এই কারণেই ম্যানেজাররাই আসল কর্তা। এজমালি মালিকানাটা সেও থিওরিটিক্যাল স্বত্ব, মানে কাগজে-কলমের ব্যাপার মাত্র। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পও অবিকল তাই। শিল্পের শ্রমিকরা চাকর মাত্র। ম্যানেজাররা তাদের নিয়োগ করেন। বেতন দেন। কাজের অযোগ্য প্রমাণিত হইলে ডিসমিসও করেন। ফলে, এখানকার সম্পর্কও 'এমপ্লয়ার' ও 'এমপ্লয়ির' সম্বন্ধ। কার কত বেতন হইবে তাও নির্ধারণ করেন নিয়োগকর্তারাই। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদের পযিশনের চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ বা পৃথক নয়। এ অবস্থায় প্রাইভেট শিল্পের শ্রমিকদের কলেকটিভ বার্গেনিং-এর অধিকার যারা মানেন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদেরও সে অধিকার তাঁদের মানিতে হইবে।

তারপর ধরুন মুনাফার কথা। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মুনাফা নাই। এ কথা ঠিক নয়। লগ্নির চেয়ে উৎপাদন বেশি, খরচার চেয়ে আয় বেশি করাই সব শিল্পকারখানা ও কায়-কারবারের সাফল্যের মাপকাঠি। এই অতিরিক্ত আয় বা উৎপাদনের নামই 'সারপ্লাস ভ্যালু'। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভাষায় একেই বলা হয় 'সঞ্চয়' ও পুঁজিগঠন। এরই সহজ নাম মুনাফা। লগ্নির মতই মুনাফাটারও ব্যবহারের মালিকও লগ্নিকর্তা নিজেই। সে লগ্নিকর্তা রাষ্ট্রই হউক আর ব্যক্তিই হউক। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহারও প্রায় একই ধরনের হয়। উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফা বা সারপ্লাস ভ্যালুটা রিইনভেষ্ট বা পুনলগ্নিও করা যায়, আবার ভোগে বা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধিতেও খরচ করা যায়। অতএব, সারপ্লাস ভ্যালু বা মুনাফার দিক দিয়া প্রাইভেট শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে কোনও পার্থক্য নাই। কাজেই উভয়ের শ্রমিকদের দায়িত্ব ও অধিকার কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা গেল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয়করণ বা সমাজবাদ প্রবর্তনের নামে শ্রমিকদের অধিকার হরণ বা সংকুচন কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের দেশে আধাআধি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই সরকার যে শ্রমিকদের কলেকটিভ বার্গেনিং-এর অধিকার হরণ করিয়াছে, এটা ন্যায় বা যুক্তি সংগত হয় নাই।

শিল্প-ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা স্থাপনের ও উৎপাদনবৃদ্ধির যুক্তিতে শ্রমিকদের অধিকার সংকোচন বা হরণ করা যায়। কিন্তু এটা করিবার আগে সরকারকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এভাবে শ্রমিকদের অধিকার সংকুচিত না করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে না এবং করিলে নিশ্চিতরূপে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে।

প্রথমতঃ ধরুন, শ্রমিকদের স্বাধীনতা ও অধিকার কেন হরণ বা সংকোচন করিতে হইবে? শ্রমিকদের এভাবে আইন করিয়া বাধ্য না করিলে তাঁরা কি উৎপাদন বাড়াইবেন

না? শিল্পের উৎপাদন বাড়াইলে দেশের ভাল হইবে। এটা সরকার বা মন্ত্রি-মেম্বররা বুঝেন, শ্রমিকরা কেন বুঝিবেন না? বুঝিয়া-শুনিয়াও উৎপাদন বৃদ্ধি করিবেন না। বরঞ্চ বৃদ্ধির ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবেন। মন্ত্রি-মেম্বর-অফিসাররা কেন না করিবেন? শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি না করা বা হ্রাস করা যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, এটা শ্রমিকরা বুঝেন না? বুঝিয়াও দেশের ক্ষতি তাঁরা করিবেন, মন্ত্রি-মেম্বর-অফিসারদের এমন মনে করিবার হেতু কি? তাঁরা কি শ্রমিকদের দেশের অনিষ্টকামী শত্রু মনে করেন? শ্রমিকদের মধ্যে দেশপ্রেম নাই, শুধু মন্ত্রি-মেম্বররা অফিসাররাই দেশপ্রেমিক, এটাই কি তাঁরা মনে করেন?

তাছাড়া, দেশের ভালর সংগে শ্রমিকদের নিজেদের ভাল-মন্দ শিল্পের ভাল-মন্দের সাথে জড়িত। উৎপাদন বাড়িলে শিল্প বাড়িবে শিল্প বাড়িলে শ্রমিকদের চাকুরি বাড়িবে, বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়িবে, উৎপাদন না বাড়িলে শিল্প থাকিবে না। শিল্প না থাকিলে শ্রমিকদের চাকুরি থাকিবে না। চাকুরী না থাকিলে তারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া পথে বসিবেন, এতসব জানিয়া-শুনিয়াও শ্রমিকেরা শিল্পের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তার মানে নিজেদের অনিষ্ট করিবেন–শ্রমিকদের এত নির্বোধ মনে করিবার কি যুক্তি সরকারের কাছে আছে? বাধ্য করিয়া বিরত না রাখিলে শিশুরা যেমন নিজ হাতে বিষ খাইয়া ফেলিতে পারে, আইন করিয়া শ্রমিকদের বাধ্য না করিলে তাঁরাও তেমনি শিল্প ধ্বংস করিয়া আত্মহত্যার প্রবৃত্ত হইবেন, শ্রমিকদেরে এমন নির্বোধ শিল্পমন্ত্রীরা কেন মনে করেন?

জ্ঞান-বুদ্ধি ও দেশপ্রেমে শ্রমিকরা মন্ত্রি-মেম্বরদের চেয়ে কম, এমন অহংকার মন্ত্রি-মেম্বরদের অন্তরে স্থান পাইল কেমন করিয়া? তাঁরা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, মন্ত্রি-মেম্বর-অফিসারের সংখ্যা যেখানে তিন-চার শ শ্রমিকদের সংখ্যা সেখানে তিন-চার লাখ? কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অত বেশি সংখ্যক লোকের দেশপ্রেমের বিচার-ভার অত অল্প-সংখ্যক লোকের উপর ন্যস্ত থাকিতে পারে না, সে অল্প-সংখ্যক লোক নির্বাচিত প্রতিনিধি হইলেও না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিচার করিতে হইবে সরকার শ্রমিকদের অধিকার সংকুচিত করায়, বিশেষতঃ তাঁদের কলেকটিভ বার্গেনিং নিষিদ্ধ করায়, শিল্প উৎপাদান বৃদ্ধি হইয়াছে কি না? অন্য কোনও দিকে রাষ্ট্রের এবং গোটা দেশের কোনও লাভ হইয়াছে কি না? ঘটনাসমূহে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরকার শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার হরণ করিলেও শিল্পে প্রচুর ধর্মঘট হইয়াছে। ধর্মঘট নিষিদ্ধ না করিলেও যত ধর্মঘট হইতে পারিত, তার চেয়ে বেশিই হইয়াছে। আসল কথা এই যে, ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত হইলেই ধর্মঘট হয় না, অধিকার অস্বীকৃত হইলেই তা বন্ধও থাকে না। আরও কঠোর সত্য এই যে, ধর্মঘটের অধিকার অস্বীকৃত হইলেই ধর্মঘট আরও বেশি হয়। এটা সনাতন মানবচরিত্র। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানুষের কোনও অধিকার নিষিদ্ধ করিলেই সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানব-মনে স্বাভাবিক জিদ চাপে। আমাদের বিয়ার কাবিনে তালাকের অধিকার দেওয়া থাকে। তাই বলিয়া সকলেই তালাক দেয় না। যাদের বিয়ার তালাকের অধিকার স্বীকৃত নাই, তাদের মধ্যে তালাক হয় না, এটাও ঠিক নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে প্রত্যেক অংগরাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার লেখা আছে। তাই বলিয়া সে অধিকার খাটাইবার জন্য কোনও অংগ রাজ্য ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়া যায় নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষ তার অধিকারের স্বীকৃতিটাই চায়, বিনা প্রয়োজনে সে অধিকার খাটাইতে চায় না।

শ্রমিকদের ব্যাপারটাও তাই। তাঁরাও কলেকটিভ বার্গেনিং-এর অধিকারটারই স্বীকৃতি চান, বিনা-প্রয়োজনে সে অধিকার খাটাইতে চান না। বিনা প্রয়োজনে কেন তাঁরা ধর্মঘট করিবেন? ধর্মঘট করাটা যে তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থেরই প্রতিকুল, দেশের স্বার্থের কথা ত পরের কথা। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, প্রতিকারের উপায়ান্তর থাকিলে, শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন না। ওটা ত্যাগের পথ, বিপদের রাস্তা, অনেক ঝুঁকি থাকে তাতে। বাধ্য না হলে সে ত্যাগ, বিপদ ও ঝুঁকির পথ কেউ অবলম্বন করে না। আমাদের 'ছয়দফা' দাবি পশ্চিমা ভাই-এরা মানিয়া নিলে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাইতাম না। এই ঘটনা দিয়াই সরকার ও সকলে শ্রমিকদের ব্যাপারটার বিচার করুন। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মানিয়া লইলে ধর্মঘটের প্রশ্নই উঠিবে না। কাবিনের হাজার বার তালাকের অধিকার লেখা থাকিলেও সুখী দম্পতিদের মনে তালাকের কথা উকিও মারিবে না।

ঠিক তেমনি সুখী ও সন্তুষ্ট শ্রমিকদের অধিকার সংকুচিত করিবার কথা সরকারকে চিন্তাও করিতে হইবে না। এমন শ্রমিকদের হাতে শিল্প উৎপাদন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবে। কাজেই শ্রমিকদের সুখ-সন্তোষ সাধনের ভাবনাই সরকারের করা উচিত আগে। তা করিতে পারিলে শ্রমিকদের আইনের শিকলে বাঁধিয়া তাঁদের নিকট হইতে কাজ আদায়ের চিন্তা সরকারকে করিতে হইবে না। শ্রমিকদের সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে হইলে তাঁদের 'দাবি' মানিতে হইবে। তাঁদের দাবিগুলি কি এতই অপূরণীয় যে, সে দাবি দমাইবার জন্য সরকারকে কঠোর হইতে হইবে?

পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের হাতে শ্রমিকরা কোনদিন সুবিচার পায় নাই, একথা পুঁজিবাদী দুনিয়ারও সর্বত্র সর্বজন স্বীকৃত। বেতনভাতা ও বাসগৃহ শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি স্বাভাবিক মানবিক অধিকার ত দূরের কথা, ঐসব অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ও সমবেত দাবি উত্থাপনের অধিকারটুকু পর্যন্ত বহুকালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা আদায় করিতে হইয়াছে। শ্রমিক-কৃষক-রাজ কায়েম করিবার দাবিদার হইয়াও আমরা কি শ্রমিকদের ঐ স্বীকৃত ও ভুঞ্জিত অধিকারটুকুও কাড়িয়া নিব? শ্রমিকদের ঐক্য ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প মালিকরা 'পকেট ইউনিয়ন' গঠন করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে দলাদলি ও রাজনীতি ঢুকাইয়াছেন, এসব কথা আই. এল. ও'র রিপোর্টেও স্বীকৃত হইয়াছে। শিল্প মালিকরা এইভাবে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত করিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থহানি করিয়াছেন। আমাদের জনপ্রিয় সরকারও কি তাই করিবেন? সুখী ও সন্তুষ্ট শ্রমিকরাই যে শিল্পোন্নয়নের একমাত্র গ্যারান্টি, এটা কি তাঁরা আজও বুঝিবেন না?

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৭৩

পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ভাগ্য বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়

নিজের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও খাওয়া-পরার কথা বাদে যে প্রশ্নটি আমাদের দেশের সকলের মনের সব চেয়ে উচা জায়গাটা দখল করিয়া আছে, সেটা পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের কথা। এ বিষয়ে আমাদের সরকার, সকল দলের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ সকলেই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছেন। বক্তৃতা-বিবৃতিতে সে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতেছেন। আটকা বাঙালিদের উদ্ধারের জন্য সরকারকে তাগিদ দিতেছেন।

কিন্তু সরকারের চিন্তা আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও সকলের চেয়ে বেশি। দেশের নাগরিকদের প্রতি সাধারণ কর্তব্য ত সরকারের আছেই, তাড়া আটক বাঙালিদের প্রয়োজনও রহিয়াছে আমাদের সরকারের। পাঠকগণের অনেকেই হয়ত জানেন না যে, আটক বাঙালিদের মধ্যে আটাশ হাজারের মতো সামরিক কর্মচারী ও বিশ হাজারের মতো অসামরিক সরকারি-কর্মচারী রহিয়াছেন। এঁদের প্রায় সকলেই অভিজ্ঞ ও যার-তাঁর বিভাগে ট্রেনিং প্রাপ্ত। আমাদের নয়া রাষ্ট্রের ফর্মেটিভ মুদ্দতে এঁদের সেবা দেশ গড়ার কাজে নিতান্তই অপরিহার্য। এই হাজার পঞ্চাশেক সরকারী কর্মচারী ছাড়াও বেসরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ী কয়েক লাখ লোক আছেন যারা আমাদের জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দেশের অনেক কাজে লাগিবেন। কাজেই এঁদের দেশে ফিরাইয়া আনিবার আগ্রহ ও ইচ্ছা সরকারের আমাদের কারোর চেয়ে কম থাকিবার কথা নয়। এ অবস্থায় এঁদের উদ্ধার করিবার কোন চেষ্টাতেই সরকার উদাসীন রহিয়াছেন, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে, সরকারী তৎপরতা আটক বাঙালিদের স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পরিজনের মনে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। কারণ তাঁদেরটা ভাবাবেগের ব্যাপার। প্রয়োজনের গতিবেগ কখনও ভাবাবেগের গতিবেগের সমান হইতে পারে না।

তথাপি আটক বাংগালিদের আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষভাবে এবং দেশবাসীকে সাধারণভাবে এটা বুঝিতে হইবে যে, আটক বাংগালিদের মুক্তির ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিন্ন একক ব্যাপার নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এটা পাকিস্তান বাংলাদেশের সামগ্রিক সম্বন্ধের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। আমরা যতই না-পছন্দ করি না কেন, আমাদের এই সব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের হোস্টেজ বা যামিনে পরিণত হইয়াছেন। আমরা এটাকে যতই অযৌক্তিক মনে করি না কেন, নিরপরাধ সিভিলিয়ান কর্মচারী ও নাগরিকগণকে যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধপরাধী সৈনিকদের সাথে একশামিল করাকে আমরা বর্বরতা আখ্যা দিয়া যতই নিন্দা করি না কেন, বাস্তব ব্যাপারটা ঘটিয়াছে সেইরূপই। ব্যাপারটা আরও জটিল এই জন্য যে, তেমন একশামিল যে করাই হইয়াছে, পাকিস্তানী নেতারা তেমন কথা মুখে বলিতেছে না। শুধু কাজে-কর্মে দেখাইতেছেন।

আসলে কোন কথাবার্তাই হইতেছে না। আমাদের সরকার বাংলাদেশে অবস্থানকারী আড়াই লক্ষ পাকিস্তানীকে ফিরাইয়া দিয়া তার বদলে অন্ততঃ ঐ সংখ্যক আটক বাঙালিকে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছেন। এটাকে কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কথাবার্তা বলা যায় না। কারণ আমাদের সরকার এ প্রস্তাব নাকি আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির মারফত দিয়াছেন। স্পষ্টতঃই আলোচ্য বিষয়ের মতো জটিল ব্যাপারের মীমাংসা এই পন্থায় হয় না। সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের মুখামুখি আলোচনা হওয়া দরকার। তেমন আলোচনা হইতে গেলে দুই পক্ষের একত্রে বসা দরকার। সেটা সম্ভব হইতেছে না এই জন্য যে, পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছেন না। এই স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণ হিসাবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সাহেব নানা ছেলেমানুষী অজুহাত দিতেছেন। কিন্তু আসল অজুহাত যে যুদ্ধ বন্দীর মুক্তি, সেকথা বলিতেছেন না। ও কথা বলিতেছেন তিনি ভারত সরকারের কাছে। কারণ তাঁর মতে পাক-বাহিনী ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষেরই নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং ভারত সরকারেরই বন্দী-শিবিরে আটক আছেন। ভারত সরকার জবাবে বলিতেছেন, বাংলাদেশে পাক-বাহিনী ভারত-বাংলাদেশের যুক্ত কমাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি ছাড়া ভারত সরকার একা পাক-যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে পারে না।

মুক্তি দিবার অধিকার যে সরকারেরই থাকুক, বন্দীদের জন্য চরম সত্য কথা এই যে, তাঁরা এক বছরের অধিককাল ধরিয়া বিদেশে বন্দী-জীবন-যাপন করিতেছেন। এই বন্দীরা জেনেভা কনভেনশন অনুসারে ভদ্র ব্যবহার পাইতেছেন, আন্তর্জাতিক রেডক্রস তাঁদের অবস্থা তদারক করিবার সুযোগ পাইতেছেন। এসবই সত্য কথা। কিন্তু বন্দীদের জন্য এবং পাকিস্তানে তাঁদের স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজনের জন্য এটা কোনও সান্তনার কথা নয়। কাজেই বাংলাদেশের জনগণ সাধারণভাবে এবং আটক বাঙালিদের আত্মীয়-স্বজন বিশেষভাবে, যখন পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের কথা ভাবেন, তখন মানবতাবোধ হইতেই তাঁদের মন পাকিস্তানের জনগণের কথাও সাধারণভাবে এবং যুদ্ধবন্দীদের স্ত্রী-পুত্রদের কথাও স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া পড়ে। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আমাদের রাগ ও আক্রোশ যতই থাকুক না কেন, তাঁদের নিরপরাধ স্ত্রী-পুত্রের দুঃখে সমবেদনা বোধ না করা ত সম্ভব নয়। আটক বাঙালিদের প্রিয়জনেরা সে সমবেদনায় যত বেশি ভুগিবেন, আর কে ততখানি বুঝিবে? 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?'

তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা বাংলাদেশের লোকেরা আমাদের সরকারকে আটক বাঙালিদের উদ্ধারের জন্য যেমন চাপ দিতেছি, পাকিস্তানের লোকেরাও তেমনি তাঁদের দেশের যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধারের জন্য ততখানি চাপ দিতেছেন। অথচ ভারতে আটক পাক যুদ্ধবন্দী ও পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের আদান-প্রদানের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনও সম্বন্ধ নাই। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গত বছরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শিমলা চুক্তি হইয়াছে, সেই চুক্তি পূরণের শেষ পর্যায়ে যুদ্ধবন্দীদেরে ফেরত দিবার বিষয় আলোচনা হইবার কথা। শিমলা চুক্তির প্রথম পর্যায় কার্যকর করা হইয়াছে। পাক-ভারত সীমার কন্ট্রোল লাইন নির্ধারিত হইয়াছে। উভয় পক্ষই অপর রাষ্ট্রের দখলিত জমি ছাড়িয়া

আসিয়াছেন। এমনকি পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধবন্দীদেরও প্রায় সবাইকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধবন্দীদেরে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। শিমলা চুক্তিতে বাংলাদেশের কোনও কথা নাই। কিন্তু 'উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির' কথা আছে। উপমহাদেশ মানে বর্তমানে তিনটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র : পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ। এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী না হওয়া পর্যন্ত এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি হইতে পারে না, এটা সহজেই বোঝা যায়। শিমলা চুক্তিতে পাক-ভারত কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, উভয় দেশের মধ্যে বিমান, ডাক, তার ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা আছে। কিন্তু এসব করার আগে যুদ্ধবন্দী ফেরত দেওয়া দরকার। ভারতে পাকিস্তানের প্রায় এক লাখ যুদ্ধবন্দী থাকিবে, আর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক-বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, এটা হইতে পারে না। তাছাড়া ভারত সরকারও নিজের দেশে এক লাখ যুদ্ধবন্দী পোষিয়া বড় আনন্দে দিন কাটাইতেছেন না। যুদ্ধবন্দী পোষণে ভারত সরকার দীর্ঘ এক বছর ধরিয়া প্রতিদিন তিন লাখ টাকা খরচ করিতেছেন। এত দীর্ঘদিন বন্দী থাকায় এবং পাক-সরকার তাঁদের মুক্তির কোনও কার্যকর ব্যবস্থা না করায় বন্দীদের কেউ কেউ বেপরোয়া হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন তাতে প্রহরীদের বন্দুকের গুলি খাইয়া মরিতেছেন। এই ভাবে বেশ কিছুসংখ্যক বন্দী নিহত হইয়াছেন। ভারত সরকার বা কোনও সরকারের পক্ষেই এমন কাজ প্রীতিকর হইতে পারে না। তাই বাংলাদেশের সাথে একটা মিটমাট করিয়া যুদ্ধবন্দী ফিরাইয়া নিবার অনুরোধ ভারত সরকারের পক্ষ হইতে পাকিস্তান সরকারকে করা হইয়াছে। এই সুপরামর্শের কদর্থ করিয়া পাক-সরকার ও তাঁদের বন্ধুরাষ্ট্রের কেউ কেউ বলিতেছেন যে, ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকেই যুদ্ধবন্দী মুক্তির শর্ত করিয়াছেন। কথাটা সত্য নয়। ভারত সরকার কখনও একথা বলেন নাই যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত পাক-যুদ্ধবন্দী ছাড়িবেন না। তাঁরা শুধু বলিয়াছেন যে, ভারত বাংলাদেশ যুক্ত-কম্যাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করায় বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধবন্দীদের তাঁরা ছাড়িতে পারেন না।

অতএব পাক-যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি হাসিল করিতে হইলে পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলাপে বসিতে হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপের ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এমন আলাপে বসিতে পারেন না। কোনও কোনও বিদেশী রাষ্ট্র ও সংবাদপত্র এটাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় জিদ বলিয়াছেন। তাঁরা চীন-মার্কিনের নজিরও দিয়াছেন। তাঁদের এ নজির ভুল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অন্যায় জিদ করেন নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের সাথে সমানে-সমানে কথা বলিতে পারেন না। কারণ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর দেশের সংবিধান বাংলাদেশকে পাকিস্তানের প্রদেশ বলেন। সত্য বটে পাকিস্তানের খসড়া সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে বাদ দিয়াই পাকিস্তানের এলাকা নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ওটা এখনও পাক গণ-পরিষদের আলোচ্য বিল মাত্র। এটা পাস হইলেই বাংলাদেশ-পাকিস্তান আলাপ-আলোচনার পথ খোলা হইবে।

ইতিমধ্যে গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জাতিসংঘের জেনারেল এসেমব্লিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে পাস হইয়াছে। প্রথমটিতে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ঘোষণা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির জন্য পাকিস্তানে আটক বাঙালি ও ভারতে আটক যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটা এই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক প্রশ্ন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইভাবে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের দাবি আন্তর্জাতিক স্যাংশান পাইয়াছে। ফলে বাংলাদেশ সরকারের দাবি জোরদার হইয়াছে। এইভাবে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি, পাকিস্তানে আটক বাঙালি উদ্ধার এবং ভারতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। আবার এই তিনটি বিষয়ের মীমাংসার উপরই এই উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি নির্ভর করিতেছে।

অতএব এটা অতি সুস্পষ্ট যে, এখন শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রকেই বাস্তববাদী হইতে হইবে। এ কাজে শিমলা চুক্তি ও জেনারেল এসেমব্লির নভেম্বর প্রস্তাবদ্বয় হইবে সকলের পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ শিমলা চুক্তি শুধু পাক-ভারত চুক্তি নয়। গোটা উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির বুনিয়াদ হিসাবে এটি একটি সুরচিত দূরদর্শী দলিল। তিন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের বুনিয়াদী চার্টার। ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যমান দুই মহান মানবগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সৃজনশীল সেকিউলার গণতান্ত্রিক সহ অবস্থানের যে সুমহান উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বাঁটোয়ারা হইয়াছিল, শিমলা চুক্তিতে সেই ফর্মূলার অন্তর্নিহিত মহাবাণীটিই সুন্দররূপে বিধৃত। শিমলা চুক্তিতে স্পিরিট-অব-পার্টিশনের সেই মহাবাণীর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব সে স্পিরিট বিশ্বস্ততার সাথে পালন করিলেও পাকিস্তানের মুসলিম লীগ-নেতৃত্ব তা পালন করেন নাই। পাকিস্তানী নেতৃত্বের ভুলের দরুন পঁচিশ বছরেও উপমহাদেশের বাঞ্ছিত শান্তি আসে নাই। গণজীবনের উন্নয়নের টাকা যুদ্ধ-সরঞ্জামে অপব্যয়িত হইয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় মুসলিম নেতৃত্বের সে ভুল আজ সংশোধিত হইয়াছে। ভারত বাঁটোয়ারা আজ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক হইয়াছে। আমাদের সে ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিহিংসা প্রতিশোধের বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। উন্মুক্ত শান্তির পথ ধরিতে হইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যুদ্ধের শেষ শান্তিতে, বিবাদের শেষ আপোষে, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় নয়। তাই মানুষ পচা অতীতকে ভুলিয়া নয়া ভবিষ্যৎ গড়িবার চেষ্টা করে। আমরা ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত-বাঁটোয়ারা করাইয়া তাঁদের মনে পীড়া ও দেহে কষ্ট দিয়াছি। তবু তাঁরা অতীত ভুলিয়া শান্তি ভবিষ্যৎ গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। আজও কংগ্রেস-নেতৃত্ব ভারত বাঁটোয়ারা অক্ষুণ্ন রাখিয়া তারই ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান সহ-অবস্থানের জন্য আকুল আবেদন করিতেছেন। এটাই শান্তির পথ। এই জন্যই নাগাসাকি-হিরোসিমার নৃশংসতার প্রতিশোধের কথা ভুলিয়া জাপান মার্কিনীদের সাথে বন্ধুত্ব করিতেছে। ইহুদীরা জার্মানদের সাথে, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনামীরা দক্ষিণীদের সাথে আপোষ করিতেছে।

উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির জন্য আমাদেরও তাই করিতে হইবে। বাংলাদেশে-ভারতে, ভারতে-পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানে-বাংলাদেশে মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে। অতীত ভুলিতে হইবে। প্রতিহিংসা প্রতিশোধ পরিহার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, প্রতিশোধ প্রতিশোধ টানে, আর উদারতা উদারতা টানে। এক পক্ষের রাজনৈতিক 'অপরাধের' 'বিচার' অপর পক্ষের রাজনৈতিক 'অপরাধ' বানায়। তেমনি, এক পক্ষ একটা ক্ষমা করিলে অপর পক্ষ দুইটা ক্ষমা করে। এটাই মানব চরিত্র। প্রথম পথ ছাড়িয়া আমাদের দ্বিতীয় পথ ধরিতে হইবে। ভারত দ্বিতীয় পথ ধরিয়াছে, এখন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকেও ঐ পথ ধরিতে হইবে। ভারত যেমন বুঝিয়াছে, বাঁটোয়ারা বাতিল হইয়া অখণ্ড ভারত হইবার সম্ভাবনা নাই, পাকিস্তানকেও তেমনি বুঝিতে হইবে বাংলাদেশের পুনর্মিলনে অখণ্ড পাকিস্তান হইবার সম্ভাবনাও আর নাই। ভারতীয় নেতৃত্ব যেমন বুঝিয়াছেন, বাঁটোয়ারা সত্ত্বেও উপমহাদেশের শান্তি ও মৈত্রী আবশ্যক ও সম্ভব, পাকিস্তান বাংলাদেশেকেও তেমনি বুঝিতে হইবে, পৃথক হইয়াও তাদের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী আবশ্যক ও সম্ভব। ভারতীয় নেতৃত্ব যেমন বুঝিয়াছেন উপমহাদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্যই পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী অপরিহার্য, পাকিস্তান বাংলাদেশের নেতৃত্বদ্বয়কেও তেমনি বুঝিতে হইবে, তাঁদের নিজ নিজ দেশের ও গোটা উপমহাদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্যই পাকিস্তান-বাংলাদেশের মৈত্রী অপরিহার্য। এটা বুঝা মাত্র তাঁরা অতীতের হিংসা-দ্বেষ-অবিচার-অত্যাচারের অভিযোগও ভুলিতে পারিবেন। তখন তাঁরা বুঝিবেন, পরস্পরের দোষাদুষি ও একে অন্যের 'বিচার' করিয়া নয়, পরস্পরকে 'ফরগিভ' করিয়া এবং অতীতের নৃশংসতা 'ফরগেট' করিয়া নয়া জিন্দিগির তালাশে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে।

কাজেই আমাদের সরকারকে এ ব্যাপারে বাস্তববাদী হইতে হইবে। ব্যাপরটা আন্তর্জাতিক, সুতরাং কূটনৈতিক। কূটনৈতিক ব্যাপারে ভাবাবেগের স্থান নাই। আমাদের সরকারও ভাবাবেগের দ্বারা বিভ্রান্ত হইবেন না। বিক্ষুব্ধ জনমতের মধ্যেও শান্তির পরিবেশে সৃষ্টি করা সরকারের কর্তব্য এবং সে কর্তব্য সাধনের মতো ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা আমাদের সরকারের আছে। আটক বাঙালিদের উদ্ধারের জন্য, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, হিতৈষী বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের মনোভাবের বিচারে আমাদের সরকার যে বাস্তববাদী পন্থা গ্রহণ করিবেন, জনগণের ভাবাবেগ যেন তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, দল-মত নির্বিশেষে জন-নেতারা সেদিকে নজর রাখিবেন, এটাই আমি আশা করিতেছি। কারো ভুলা উচিত নয় যে, এ পথে যত বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে আটক বাঙালিদের উদ্ধার ও উপমহাদেশের শান্তি তত বিলম্বিত হইবে। মনে রাখিতে হইবে, যাঁরা মারা গিয়াছেন তাঁদের প্রতি আমার কর্তব্য আছে বটে, কিন্তু যাঁরা বাঁচিয়া আছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আরও বড়। যে যাই বলুক, পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের সরকার আজও কোনও ঘোরতর ভুল করেন নাই। আটক বাঙালিদের উদ্ধারের এবং উপমহাদেশের শান্তি-স্থাপনের ব্যাপারেও আমাদের সরকার কোনও ভুল করিবেন না, এটা দেশবাসী আশা করিতে পারে।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৭৩

সংবাদপত্রকে সাংবিধানিক অধিকার ফিরাইয়া দাও

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে 'ইত্তেফাকে' ইতিপূর্বেই যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সম্পাদকীয়তেও করা হইয়াছে। আমিও দুই-একবার করিয়াছি। তবু আজ সেই আলোচনাই আবার করিতেছি। তার কারণ আছে। আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ৩৯ অনুচ্ছেদের (খ) দফায় সুস্পষ্ট ভাষায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে। সংবিধান প্রবর্তনের আগে কোনও আইন-আদেশের দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হইয়া থাকিলেও সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদবলে সংবিধান প্রবর্তনের দিন হইতে সে আইন-আদেশ বাতিল হইয়াছে। এই অবস্থায় নীতিগতভাবে ও কাগজ-পত্রে আমাদের দেশে সংবাদপত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। কার্যতঃও এখানে সংবাদপত্র মোটামুটি স্বাধীন। 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউড'ও বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে 'অন দি হৌল', মানে মোটের উপর স্বাধীন বলিয়াছেন। যদিও ইংরেজি ভাষার উপর দখলের অসম্পূর্ণতার দরুন 'অন দি হৌল'কে কেউ কেউ 'হৌল্‌লি' অর্থে 'সম্পূর্ণ স্বাধীন' বর্ণনা করিয়াছেন, তবু আসল অবস্থা বুঝিতে কারও অসুবিধা হইবার কথা নয়। আই পি আই আমাদের সংবাদপত্রের অবস্থাটাকে 'মোটামুটি স্বাধীন' কেন বলিলেন তা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন, এই প্রচারের দ্বারা আমাদের সরকারের বদনাম হোক, এটা আমি চাই না। তাই এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে সরকারকে তাগিদ দেওয়া সকলেরই উচিত। সংবাদপত্রসমূহের আরও বেশি উচিত। তা না করিয়া সরকার সমর্থক কোনও কোনও ব্যক্তি ও দল সরকারকে এ বিষয়ে ভুল পরামর্শ দিতেছেন বলিয়া আমার মনে হয়। কতিপয় সংবাদপত্রকে এঁরা 'সরকার পরিচালিত সংবাদপত্র' বলিতেছেন বোধ হয় সরকারের সম্মতিক্রমেই।

সকলেই জানেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সাবেক প্রেস ট্রাষ্টের দুইটি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার তিনটি সংবাদপত্রের পরিচালনভার সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে করা হইয়াছিল, এটা সাময়িক ব্যাপার। যথাসময়ে সরকার এসব সংবাদপত্র ব্যক্তিগত মালিকানায় পুনর্বহাল করিবেন। সাবেক প্রেস ট্রাষ্টের কোনও বাঙালি শেয়ার হোল্ডার থাকিয়া থাকিলে ট্রাষ্টের সংবাদপত্র দুইটি তাঁহাদের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং দরকারমত অংশীদারত্ব প্রসারিত করিবার নির্দেশ দিবেন। আর যদি সাবেক প্রেস ট্রাষ্টে কোনও বাঙালি শেয়ারহোলডার না থাকিয়া থাকেন, তবে তার শেয়ারগুলি বাঙালি খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করিবেন। ব্যক্তিগত মালিকানার তিনটি দৈনিকের মধ্যে একটি

সম্পর্কে বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের সামনে মামলা দায়ের আছে। অপর দুইটি সংবাদপত্র সম্বন্ধে আশা করা গিয়াছিল সরকার আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সে দুইটিও ব্যক্তিগত মালিকানায় পুনর্বহাল করিবেন। একটা বছর কাটিয়া গেল। সরকার এসব কিছুই করেন নাই। চারটি খবরের কাগজই সরকারী সংবাদপত্ররূপে আজও চলিতেছে। সরকারী ব্যবস্থাপনা দিন-দিন আরও টাইট হইতেছে। এতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া কোনও কোনও সরকার সমর্থক ব্যক্তি ও দল বলিতেছেন, বাকি সংবাদপত্রগুলিও সরকারের হাতে নেওয়া উচিত। সংবাদপত্রের ব্যাপারে এপথ কল্যাণের পথ নয়। কাজেই এমন উপদেশও সদুপদেশ নয়। এ পথে সরকার জনপ্রিয়তা হারাইবেন। সংবাদপত্র স্বাধীনতা হারাইবে। গণতন্ত্র ব্যাহত ও বিপন্ন হইবে। দেশ ও জাতির সার্বিক অনিষ্ট হইবে। কাজেই সরকারকে যথাসময়ে হুশিয়ার হইতে হইবে। সংবাপত্রের স্বাধীনতাকে নিরংকুশ করিতে হইবে। গণতন্ত্রকে বিপদমুক্ত করিতে হইবে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের অবস্থা আলোচনা করিতে হইলে দুইদিক হইতে তার বিচার করিতে হয়। এক. যা হইয়াছে, দুই. যা হওয়া উচিত। 'যা হইয়াছে' অবস্থাটার আবার দুইটা রূপ। এক. সাংবিধানিক ও আইনগত রূপ; দুই. বাস্তব রূপ। আগেই বলিয়াছি, সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট ভাষায় 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানেই সংবাদপত্রের নিশ্চয়তা' বিধান করা হইয়াছে। যদিও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানেই সংবাদপত্রের মালিকানারও স্বাধীনতা, তথাপি তর্কচ্ছলে ধরা যাইতে পারে, এটা সংবাদপত্রের মতামতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। এ ছাড়াও সংবাদপত্রের মালিকানা সম্পর্কে সংবিধানের অন্যত্র সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। সংবিধান অনুসারে সংবাদপত্র জাতীয়করণ করা যায় না। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, 'উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার' উপরই সরকারী মালিকানা থাকিতে পারে। ৪২ অনুচ্ছেদে সকল প্রকার সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া যাক, ৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'সম্পত্তি' উৎপাদন-যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থা' ছাড়া অন্য সম্পত্তি। সংবাদপত্র উৎপাদন যন্ত্র নয়, প্রচার যন্ত্র। যদিও আধুনিক জগতে সংবাদপত্র একটা বড় ইণ্ডাষ্ট্রি, যদিও সংবাদপত্র পরিচালনে আজকাল বিপুল পরিমাণে পুঁজি লাগে, তবু কোনও সংজ্ঞা অনুসারেই এই ইণ্ডাষ্ট্রিকে উৎপাদন যন্ত্র বা উৎপাদন ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। এই কারণে আমাদের সংবিধান অনুসারে সংবাদপত্র জাতীয়করণের দ্বারা তার মালিকানা সরকারী করা যায় না। তাছাড়া সংবিধান অনুসারে যেসব শিল্প জাতীয়করণ করা যায় এবং করা গিয়াছিল, সেগুলির ব্যাপারেও সরকার দশ বছরের 'মরেটরিয়ম' ঘোষণা করিয়াছেন। এ অবস্থায় সংবাদপত্রের উপর সরকারী মালিকানা স্থাপনের কোনও অধিকার সরকারের নাই। এমন কোনও ইচ্ছা-অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা সরকারের আছে বলিয়াও আমার জানা নাই। সরকার যদি ইচ্ছা করেন, তবে ইনফর্মেশন দফতরের পরিচালনাধীনে অথবা রেডিও-টেলিভিশনের মতো কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে নিজস্ব

সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারেন। সংবিধানে এ ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ নাই। কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের কথা। বর্তমানে এবং ইতিমধ্যে প্রচলিত কোনও সংবাদপত্রের মালিকানা সরকার নিজের অধীনে নিতে পারেন না। এ অবস্থায় কথিত চারটি সংবাদপত্র সরকার কোন্ আইনের বলে পরিচালনা করিতেছেন, এ সম্পর্কে সরকারের নিজেদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে, এবং জনসাধারণকে তা অবগত করাইতে হইবে। সংবিধান প্রবর্তনের আগে যে সব অর্ডারবলে সংবাদপত্রগুলির পরিচালনা সরকার নিয়াছিলেন, সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদবলে সে সব অর্ডার বাতিল হইয়া গিয়াছে, এটাও সরকারের মনে রাখিতে হইবে। সরকার নিজেই সংবিধান বিরোধী ও বেআইনী কাজ করিতেছেন। এমন বদনাম সরকারের হইলে সে বদনাম পরিণামে দেশবাসীর উপরই বর্তাইবে।

এরপর নযর দিন বাস্তব রূপের দিকে। এই রূপেরও তিনটি রং। এই তিনটা রং-এর কোনটাই এমন নয় যাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বর্তমান সরকারের স্বার্থ-বিরোধী হইতে পারে এবং সে কারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করা আবশ্যক হইতে পারে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলেরা সাধারণতঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন দেশ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া। আসল কারণটা কিন্তু বরাবরই নিজেদের গদির নিরাপত্তা। বর্তমান সরকারের তেমন কোনও প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ বর্তমান সরকার বা আওয়ামী নেতৃত্ব আজও মেজরিটি দেশবাসীর আস্তা হারান নাই। দ্বিতীয়তঃ যতই 'স্বাধীন' হোক, সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন ও নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি একাধিক কারণে সরকারী প্রভাবাধীন হইতে বাধ্য হয়। বিশেষত: ন্যাশনালাইয্ড্ ইণ্ডাষ্ট্রির সমাজবাদী রাষ্ট্রে বিজ্ঞাপনের প্রায় সবটুকুই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। দশ বছরের মরেটরিয়মও এ ব্যাপারে শিল্প-মালিকদের সম্পূর্ণ সরকারী প্রভাবমুক্ত করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ স্বাধীনতার পরে বেশ কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা সংবাদপত্রের মালিক হইয়াছেন। এঁদের বেলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানেই আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা। এঁদের স্বাধীনতা কোন অবস্থাতেই সরকারের বিপদের কারণ হইতে পারে না।

এ অবস্থায় বর্তমান সরকারের পক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। জান বাঁচাইবার জন্য পাপ করিবার একটা যুক্তি আছে। সে যুক্তির নৈতিক সমর্থন না থাকিলেও বাস্তব সমর্থন রহিয়াছে। গণদুশমন ডিক্টটররা অথবা অজনপ্রিয় সরকারেরা যখন নিজেদের গদির নিরাপত্তার জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন, তখন তাঁদের পক্ষে বলিবার একটা কথা থাকে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের মতো গণসমর্থনপুষ্ট সরকারের পক্ষে তেমন কোনও আবশ্যকতার যুক্তি নাই। বিনা কারণে অনাবশ্যক পাপ করার মতই এটা ক্ষমার অযোগ্য।

এইবার আসুন, 'কি হওয়া উচিত' কথাটার আলোচনা করা যাক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করার দরকার নাই। বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছে

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর বক্তৃতা দেওয়া মার কাছে মামার বাড়ির কথা বলারই শামিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সহ অধিকাংশ মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন এবং সে স্বাধীনতার অভাবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সাধারণভাবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিশেষভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই ছিল আওয়ামী লীগের প্রাণবায়ু। এই প্রাণবায়ুর জন্য গত পঁচিশটা বছর আওয়ামী লীগ কতই না সংগ্রাম পরিচালন এবং উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন। বলিতে গেলে আওয়ামী লীগের পরিনাম বিজয় এই বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতারই জয়। সেই আওয়ামী লীগের হাতেই সংবাদপত্রের ও বাক-স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ হইবে, এটা হইতে পারে না। হইতে দেওয়া উচিত নয়।

আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সে গণতন্ত্রও কোনও বিশেষণ-মুক্ত নয় গণতন্ত্র নয়। নির্ভেজাল নিরংকুশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে যেমন অপযিশন পার্টি সরকাররের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, স্বাধীন সংবাদপত্রও তেমনি রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মতই একটি অপরিহার্য বিভাগ। রাষ্ট্রে ঐ তিনটি খুঁটির মতই স্বাধীন সংবাদপত্র তার চার নম্বর খুঁটি। ঐ তিনটি খুঁটির একটির অভাবেও যেমন রাষ্ট্র চলিতে পারে না, সংবাদপত্র ছাড়াও তেমনি রাষ্ট্র চলিতে পারে না। আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেমন অপরিহার্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও ঠিক সেই পরিমাণে ততখানি অপরিহার্য। এটা কোনও নীতিকথা বা ধর্ম বাক্য নয়। বাস্তব কঠোর সত্য। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীনতা আমাদের দেহ রক্ষার জন্য যেমন অত্যাবশ্যক, রাষ্ট্র-দেহ রক্ষার জন্যও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঠিক ততখানি অত্যাবশ্যক। নাগরিকের স্বাধীনতাই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা। নাগরিকের স্বাধীনতা নির্ভর করে সত্য ও নির্ভুল সংবাদ সরবরাহের উপর। কারণ, নাগরিকের নির্ভুল মতামতের উপর নির্ভর করে সরকারী পলিসি ও প্রোগামের নির্ভুলতা। গণতান্ত্রিক সরকার শুধু এইভাবেই ঠিক পথে চলিতে পারেন। এখন বুনিয়াদী প্রয়োজন যে সত্য ও নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন, সেটা করিতে পারে একমাত্র স্বাধীন সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের এ স্বাধীনতার মানে শুধু স্বাধীনভাবে সংবাদ সরবরাহ নয়, পাঠকের কাছে সে সংবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাও সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংবাদপত্র শুধু সংবাদ প্রচারই করে না সংবাদ আবিষ্কারও করে। সংবাদপত্র শুধু জনমত প্রচারই করে না, জনমত তৈয়ারও করে। এতবড় মহান দায়িত্ব পালন করিতে হইলে সংবাদপত্রকে জনগণের আস্থাভাজন হইতে হয়। এ জন্য সংবাদপত্র শুধু সত্য সংবাদ প্রকাশ করিলেই হয় না, সংবাদপত্র যে সত্য সংবাদই প্রকাশ করিয়াছে, পাঠক ও জনসাধারণের সেটা বিশ্বাসও করিতে হয়। সংবাদপত্রের প্রতি পাঠক ও জনসাধারণ একবার আস্থা হারাইয়া ফেলিলে, তার দ্বারা দেশের বা সরকারের কোনও কাজ হয় না। জনগণ ও সংবাদপত্রের মধ্যে এই অনাস্থার দূরত্ব, 'ক্রেডিবিলিটি গ্যাপ' সৃষ্টি হইয়া গেলে তেমন সংবাদপত্র থাকা-না-থাকা সমান হইয়া যায়।

এটা ডিক্টেটররা মোটেই এবং ক্ষমতাসীন দলের কেউ কেউ বুঝেন না। তাই তাঁরা বিশেষ শক্তি প্রয়োগে সংবাদপত্রগুলিকে নিজেদের বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিয়া ফেলেন। এমন সংবাদপত্র ডিক্টেটর ও তাঁর মন্ত্রীদের ছবি ও বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু ছাপে না। আর প্রতিকাজে সরকারকে বাহ্ বাহ্ 'মারহাবা মারহাবা' দিতে থাকে। সংবাদপত্রসমূহের এইরূপ কোরাস ও ঐকতানে শাসকরা ভক্তবৃন্দের স্তব-স্তুতিতে মুগ্ধ হইয়া ঝিমাইতে থাকেন। ভক্তেরা বলেন, শাসকরা বিশ্বাসও করেন, গোটাদেশ তাঁদের পিছনে আছে। আগের আগের রাজা বাদশারা মনে করিতেন, পরিষদরা সবাই টাকার কাংগাল, তাঁদেরে যেমন টাকা দেওয়া হইবে, তাঁরা তেমনি স্তব-স্তুতি গাইবেন। আজ কালের ডিক্টেটররাও মনে করেন, সাংবাদিকরা টাকার কাংগাল। তাঁদের টাকা দিয়া যা-ইচ্ছা বলান ও লেখান যায়। ডিক্টেটররা এখানেই ভুল করেন। তাঁরা জানে না যে সাংবাদিকদেরে তাঁরা যতটা নির্বোধ স্তাবক মনে করেন, সাংবাদিকদের মেজরিটি আসলে তা নন। তাঁরা বোকা স্তাবকের অভিনয় করেন মাত্র। বুদ্ধিমান বলিয়াই একটু বেশি করিয়াই করেন। এরা ডিক্টেটরদের সাথে ফ্রন্টাল লড়াইটাকে জ্ঞানীর কাজ মনে করেন না। কেন এমন করেন, তার একটি টিপিক্যাল নযির দিতেছি। আইউবী আমলে একবার আইউবের জনপ্রিয়তা বর্ণনার প্রতিযোগিতায় একটি সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছিল; 'তাঁকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আস্ত ঢাকা নগরীটি সশরীরে বিমানবন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল।' সম্পাদক বন্ধুকে আমি এই বলিয়া তিরষ্কার করিয়াছিলাম যে, অমন ডাহা মিথ্যা রিপোর্টটা দিতে মার্শাল ল' ত তাঁকে বাধ্য করে নাই। উত্তরে বন্ধুবর বহু যুক্তিতর্ক দিয়া আমাকে বুঝাইয়াছিলেন; 'জনসাধারণ ঐ রিপোর্টে বিভ্রান্ত হইবে না। কিন্তু আইউব হইবেন। ডিকটেটর মারার ওটাই ফন্দি।" আমি যখন সংবাদপত্রের 'ক্রেডিবিলিটি গ্যাপের' দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম তখন তিনি জবাব দিলেন; 'ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ওটা আমাদের স্যাক্রিফাইস।'

ঐ বুদ্ধিমান বন্ধুবরের শাগরিদান অনেকেই আজও সাংবাদিক জগতে আছেন। কাজেই ডিক্টেটর আইউব-এহিয়া সাংবাদিকদেরে যা মনে করিতেন, আশা করি, রাজনৈতিক নেতারা, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ নেতারা তেমন ভুল করিবেন না। আওয়ামী নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাই এমন ভুলের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। তাছাড়া আওয়ামী লীগের মধ্যেই অনেক যোগ্য সাংবাদিক রহিয়াছে।

অতএব, বর্তমান সরকারের কাছে, বিশেষতঃ আওয়ামী নেতৃত্বের কাছে আমার এই স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা অবিলম্বে সংবাদপত্রের সার্বিক ও নিরংকুশ স্বাধীনতা পুনর্বহাল করুন এবং আসন্ন নির্বাচনের আগেই করুন। নির্বাচনে এ কারণে তাঁদের কোনও ক্ষতি হইবে না।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

এবারের খাদ্য-সংকট এড়াইতে সামগ্রিক প্রয়াস লাগিবে

গত প্রবন্ধে আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম, এ সপ্তাহে খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয়তেই 'খাদ্যসংকটের' উপর এক সারগর্ভ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আমি এ সম্পর্কে যেসব কথা বলিব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, তার মধ্যে ভাল ভাল সব কথাই সম্পাদকীয়তে বলা হইয়া গিয়াছে। কাজেই মুশকিলে পড়িয়াছি। পাঠকদের কাছে যে ওয়াদা করিয়াছি, তাও খেলাফ করিতে পারি না। একই বিষয়ে লিখিতে গেলে পুনরাবৃত্তি হইতে বাধ্য, সে আশংকাও আছে। পুনরাবৃত্তির রিস্ক নিতে পারি, কিন্তু ওয়াদা খেলাফের গুণাহ করিতে পারি না। তাছাড়া ভাল কথার পুনরাবৃত্তিতে দোষ নাই। তার উপর আমাদের দেশের খাদ্যসংকটটা এমন আসন্ন ও জটিল যে, এ ব্যাপারে পুনরাবৃত্তিতে বোধ হয় লাভই হইবে।

বাংলাদেশের খাদ্য-সঙ্কট গতবারের চেয়ে এবার অনেক বেশি জটিল, একথা আমাদের সরকার, বিভিন্ন সাহায্যদাতা দেশ, বিশেষতঃ জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল ডাঃ কুর্ট ওয়াল্ডহেইম, সবাই স্বীকার করিয়াছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সেক্রেটারি জেনারেল বেশ কিছুদিন আগেই এই সংকট এড়াইবার জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন জানাইয়াছিলেন।

আমাদের খাদ্য সংকট যে গুরুতর, নানা কারণে তা সুস্পষ্ট। গতবার আমাদের খাদ্যঘাটতি ছিল ২৫ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ টনের মতো। সে স্থলে এবারের ঘাটতি ৩০ লক্ষ টন আন্দাজ করা হইয়াছে। আমাদের খাদ্য দফতর ও জাতিসংঘের রিলিফ প্রতিষ্ঠানের হিসাবমত এবার আমাদের খাদ্য উৎপাদন আশা করা যায় এইরূপ ; আসন্ন ৬০ লক্ষ টন, আউশ ৪০ লক্ষ টন ও বোরো ১০ লক্ষ টন। একুনে উৎপাদন আশা করা যায় ১১০ লক্ষ টন। এই এক কোটি দশ লক্ষ টন হইতে বীজ ধান ও ক্ষয়-ক্ষতি ধরা হয় ১০ লক্ষ টন। তাতে নিট খাদ্যের পরিমাণ থাকে এক কোটি টন। বিশেষজ্ঞদের হিসাব মত খাদ্যের প্রয়োজন আমাদের এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টন। কাজেই ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে ত্রিশ লক্ষ টন। এই ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য আমাদের বিদেশ হইতে পাইতে হইবে। এবার এটাই এক রূপ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গতবারের ২৭ লক্ষ টনের ঘাটতি মেটান হইয়াছিল ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ হইতে আমদানি করিয়া। এই সব দেশের মধ্যে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় দেশ বহুল পরিমাণে খাদ্য দান হিসাবে দিয়াছিল। অন্যান্য দেশ হইতে নগদ ও বাকি মূল্যে খাদ্যশস্য কেনা হইয়াছিল।

দানেই হউক আর খরিদেই হউক, এবার আমাদের প্রয়োজনমত খাদ্য-শস্য পাওয়া খুব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গতবার আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত সংকটের গোড়াতেই সাহায্যের হাত বাড়াইয়াছিল এবং সর্বমোট নয় লক্ষ টন, তার মানে মোট ঘাটতির এক তৃতীয়াংশ; একাই সাহায্য দিয়া ছিল। সাহায্যের পরিমাণের দিক দিয়া ভারত আমেরিকার পরেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরিমাণে দ্বিতীয় স্থান হইলেও সরবরাহ তৎপরতার দিক হইতে ভারতের সাহায্যের স্থান ছিল সকলের উপরে। একে ত নিকট প্রতিবেশী তাতে সাহায্য তাড়াতাড়ি পৌছাইবার সুবিধা ছিল। তার উপর ভারত সরকার খাদ্য সরবরাহের জন্য নিজস্ব জাহাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সরবরাহের ধারাবাহিকতার সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করিয়াছিলেন। তার ফলে দুর্ভিক্ষের আশংকার প্রাথমিক ধাক্কা আমরা সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলাম এবং তাতে দূরবর্তী দেশসমূহ হইতে সাহায্য আসিবার মতো অবসর হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এবার ভারতের সাহায্য আমরা পাইব না। ভারত নিজেই এবার খাদ্য সংকটের সম্মুখীন। বস্তুতঃ খাদ্য-সংকটের আশংকা ভারতের গত বছরই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সেটা আসন্ন ছিল না বলিয়া ভারত সরকার নিজেদের বিপদ উপেক্ষা করিয়া গতবার বাংলাদেশকে চাউল সাহায্য দিয়াছিলেন। কিন্তু এবার ত সম্ভব নয়। এবার ভারতের নিজেরই ৪২ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি। কারও মতে এই ঘাটতি ৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াইতে পারে। এতবড় বিপুল ঘাটতির মধ্যে ভারত সরকার ইতিমধ্যে বিশ্বের বাজারে মাত্র ২০ লক্ষ টন খাদ্য কিনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখনও ২৫/৩০ লক্ষ টন খাদ্যের ব্যবস্থা বাকি আছে। এটা কোথা হইতে যোগাড় করিবেন তাই এখন ভারত সরকারের মাথার বিষ। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দুইটি সমাজবাদী বৃহৎ রাষ্ট্র চীন ও রাশিয়া খরিদ্দাররূপে খাদ্যের বাজারে নামিয়াছে। এ খবর ইত্তেফাকের পাঠকরা ইতিপূর্বেই 'খাদ্যসংকট' শীর্ষক সম্পাদকীয়তেই পাইয়াছেন। বড় লোক খরিদ্দার বাজারে নামিলে জিনিস-পত্রের দাম কোন্ আসমানে উঠে পাঠকগণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই তা জানেন। ঐ দুইটি বড়লোক খরিদ্দার খাদ্যের বাজারে নামায় খাদ্যের বিশ্ববাজারেও আগুন লাগিয়াছে। এমতাবস্থায় ভারতের পক্ষেও তার ঘাটতি পূরণে দমাদমি লাগিয়া যাইবে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের নিকট হইতে এবার খাদ্য-সাহায্য, আশা করা আমাদের অন্যায় হইবে।

ভারত বাদ গেলে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গতবার মার্কিন মুল্লুক কম বেশি চোদ্দ-পনর লাখ টন খাদ্য আমাদের দান করিয়াছে। এবার রুশিয়া আমেরিকার ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য খরিদ করায় মার্কিন সরকার বাংলাদেশকে কি পরিমাণ সাহায্য দিতে পারিবেন, তা বুঝা যাইতেছে না। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের আপিলের জবাবে মার্কিন সরকার আড়াই লাখ টন খাদ্য সাহায্য ঘোষণা করিয়াছেন। বাংলাদেশের তিশ লাখ টনের মোকাবিলা এই আড়াই লাখ নগণ্যত বটেই, খোদ আমেরিকার জন্যও

এই পরিমাণ অতি অল্প। মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড ক্যানেডি মার্কিন সরকারের এই ঘোষণাকে কৃপণতা আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: 'বাংলাদেশের খাদ্য-ঘাটতি যেখানে মারাত্মক, সেখানে সাহায্য দিতে মার্কিন সরকার পা হেঁচড়াইয়া চলিতেছেন। মার্কিন সরকারের এই 'কৃপণতা' ও 'পা হেঁচড়াইয়া' চলিবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। রাশিয়ার খরিদ তার একমাত্র কারণ নয়, এটা বুঝা যায়। অন্যকারণ রাজনৈতিক হইতে পারে। আমাদের দেশের অতি-বিপ্লবীরাত বটেই, সরকারী দলের তরুণদেরও কেউ কেউ বাংলাদেশে 'মার্কিনী ষড়যন্ত্র' আবিষ্কারে লাগিয়াছেন। তাতে মার্কিন জাতির বিশেষতঃ মার্কিন সরকারের, উত্যক্ত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। আমি বহুবার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি, খাদ্য-সংকটের অবসানে রাজনীতি আমদানি করা উচতি নয়। এটা অমানুষিক। এটা আভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্য যেমন সত্য, আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্যও তেমনি সত্য। দেশের অভ্যন্তরে আমাদের বর্তমান খাদ্য-সংকটকে সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রবণতা রহিয়াছে। আমি একাধিকবার বলিয়াছি খাদ্য সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যা। এতে দলাদলির স্থান নাই। তথাপি সে প্রবণতা দূর হয় নাই। সরকারবিরোধী কেউ কেউ এমন কথাও বলিতেছেন, ভোটাররা যেখানে অনাহারে মৃত্যুর মুখামুখি হইয়াছেন, সরকার সেখানে নির্বাচন প্রচারণার বিলাসিতায় মাতিয়াছেন।

এঁদের বক্তব্য কি বোঝা যায় না। এরা কি বলতে চান, খাদ্য সংকট দূর না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা উচিত? সরকার যদি এঁদের উপদেশমত খাদ্য-সংকটের অবসান না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখেন, তবে এঁরাই কি বলিতে শুরু করিবেন না যে, খাদ্য-সংকট একটা ছুতামাত্র; নির্বাচনে হারিয়া যাইবার ভয়ে অথবা বিনা নির্বাচনে স্বৈরতন্ত্র চালাইবার মতলবে খাদ্য-সংকটের দোহাই দিয়া সরকার নির্বাচন এড়াইয়া গেলেন? সরকার এটা করিলেও দোষ, ওটা করিলেও দোষ, সেই প্রবাদ বাক্যের দুলহান মতো। দুলহা কথা বলিলে সে বাচাল; আর কথা না বলিলে বোবা।

তাছাড়া খাদ্য-সংকটের অজুহাতে নির্বাচন স্থগিত রাখিতে হইবে কেন? খাদ্য-সংকট কি আমাদের সাময়িক ব্যাপার? এটা ত আমাদের ক্রনিক রোগ। পানি-সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ঝড়ঝঞ্ঝার পুরাপুরি প্রতিরোধ না করা পর্যন্ত এ দুর্ভাগ্য আমাদের শেষ হইবে না। তার উপর মনে রাখিতে হইবে, নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য মানব দেহের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই অনিবার্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারী বোমাবর্ষণের বৃষ্টি মাথায় লইয়াও ইংরাজরা নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়াছিল। নির্বাচন অনুষ্ঠান সরকারের খাদ্য-সংকট সমাধানে বিঘ্ন হইবে কেন? যে বধূ রাধেন, তিনি কি চুল বাঁধেন না? কাজেই খাদ্য সংকটের দোহাই দিয়া নির্বাচন বন্ধ করার দাবির মধ্যেও রাজনীতি আছে। দেশপ্রেমিক মাত্রেরই এই প্রবণতা হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যা, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তাই। বাংলাদেশের শুধু বাংলাদেশের কেন, কোন দেশেরই, খাদ্য সমস্যার সমাধানে রাজনীতির আমদানি করা উচিত নয়। খাদ্যাভাবে কেউ মরিলে মরিবেন দরিদ্র জনসাধারণ। অতিবিপ্লবী বা বিপ্লব বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের কেউ মরিবেন না। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ভূমি সংস্কারে, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে যত ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাজবাদী নীতির কথা বলুন, আপত্তি নাই। খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষের মুখামুখি দাঁড়াইয়া মার্কিনী খাদ্যের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বীজাণু দেখিবেন না।

এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, আমাদের দেশের অর্বাচীন অতি বিপ্লবীদের মার্কিন-বিরোধী শ্লোগানে মার্কিন সরকার বিভ্রান্ত হন নাই? এটা ঘটিয়াছে প্রধানতঃ মার্কিন সিনেটের প্রভাবে, বিশেষতঃ জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেলের আন্তরিক চেষ্টায়। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় আনরডের রিলিফ কাজের মেয়াদ প্রায় এক বছর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নতুন করিয়া চাউল ও গমের আন্তর্জাতিক ওয়াদা পাওয়া শুরু হইয়াছে।

কিন্তু স্পষ্টতঃই আমাদের খাদ্য সংকটের ব্যাপকতা ও গভীরতার মোকাবিলায় এটা যথেষ্ট নয়। বাহির হইতে প্রয়োজন মতো খাদ্য যাতে আসে, তার যেমন অবিরাম চেষ্টা করিতে হইবে, আগত সাহায্যের যাতে পুরাপুরি সদ্ব্যবহার হয় তারও চেষ্টা তেমনি জোরে-সোরে করিতে হইবে। চেষ্টাটা করিবেন প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ সরকারই। সাধারণভাবে জনগণের এবং বিশেষভাবে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটার দরকার হইবে পরে। বিশ্বের বাজার হইতে চাউল-গম নির্বিশেষে খাদ্য সংগ্রহ করা, সে সংগ্রহ দানের বদলে খরিদের মাধ্যমে হইলে তা যথাসম্ভব সস্তা দরে করা, বিদেশ হইতে আমদানির সুব্যবস্থা করা, আমাদের বন্দরে খাদ্য পৌঁছামাত্র তা খালাসের ও মফস্বলে চালান দেওয়ার যানবাহনের নির্ভরযোগ্য বিধি ব্যবস্থা এ সবই সরকারকেই করিতে হইবে। মন্ত্রীরা নির্বাচন প্রচারণায় ব্যস্ত থাকিলেও সেই কারণে সরকারী কাজ-কাম বন্ধ থাকে নাই। আর মন্ত্রীরা অফিস কামাই করিলেই সরকারী কাজ অচল হইবেই বা কেন? মন্ত্রীরা ত শুধু নীতি নির্ধারণ করিবেন। বাকি কাজ ত করিবেন অফিসাররাই। সে সব কর্তব্য সাধনে অফিসাররা ত সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবার কথা। স্বাধীন ও দায়িত্বশীল পার্লামেন্ট অফিসিয়েলই ত পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। সত্য বটে, পাকিস্তানী আমলের গত চৌদ্দটি বছর আমাদের দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। এই মুদ্দতে অফিসাররা রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাঁরা নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রীরা অফিসারের কাজ করেন আর অফিসাররা রাজনীতি করেন বলিয়াই এটা ঘটিয়া থাকে। আমরা এখন পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক সরকার পাইয়াছি। এখন অফিসারদের আগের দিনের আভ্যাস বদলাইতে হইবে। একদিকে রাজনীতি হইতে বিরত থাকিবার, অপরদিকে অফিসারের ডিউটিতে মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপে আপত্তি জানাইবার, নৈতিক সাহস অফিসারদের থাকিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে এটা তাঁদের সরকারী কর্তব্য।

এবারকার খাদ্য-সংকট এতই গুরুতর যে, সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া দুর্নিবার দুর্ভিক্ষ হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইতে হইবে। জনগণের এবং সকল দলের নেতৃবর্গের একাজে সক্রিয় সহযোগিতা করিতে হইবে। এবারকার খাদ্য সংকট এড়াইতে হইলে শুধু চাউল সংগ্রহের চেষ্টায় থাকিলে চলিবে না। চাউল-গমে কোন পার্থক্য না করিয়া যেখানে যা পাওয়া যায় তাই আনিতে হইবে। খাদ্য সংগ্রহের চেয়ে খাদ্য বিতরণ এবার আরও কঠিন হইবে। উত্তর বাংলায় খাদ্য সরবরাহে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উত্তর বাংলায় সবটুকু খাদ্য বিতরণের কাজ গতবার ভারত সরকারই করিয়াছিলেন। চাটগাঁ বন্দর হইতে অথবা ঢাকা অফিস হইতে এটা সম্ভব হইত না। গতবার ভারত আমাদের বড় খাদ্য সরবরাহকারী ছিল বলিয়াই এটা সম্ভব ছিল। এবার ভারত হইতে আমরা খাদ্য পাইব না। এ অবস্থায় উত্তর বাংলাকে দুর্ভিক্ষ হইতে বাঁচাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ সরকার ইতিমধ্যে একটা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড করিয়াছেন। এটা একটা কাজের মতো কাজ হইয়াছে। কিন্তু এতে উত্তর বাংলায় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হইবে কি না সরকার আশা করি আগে হইতে এ বিষয়ে সাবধান হইবেন। চালনা বন্দর খাদ্য সরবরাহ কাজে ব্যবহার করা যায় কি না, অথবা ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে কলিকাতা বন্দর এ কাজে লাগান যায় কি না, আশা করি সে চেষ্টারও ত্রুটি হইবে না।

আমাদের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দুইটা দিক; খাট মেয়াদী ও লম্বা মেয়াদী। খাট মেয়াদী কাজে এবার সরকারের সকল শক্তি ও উদ্যম আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণে নিযুক্ত হইবে বলিয়া আমরা যেন লম্বা মেয়াদী কর্তব্যে অবহেলা না করি। আগেই বলিয়াছি, খাদ্য-সমস্যা আমাদের ক্রনিক রোগ। এ রোগ না সারাইলে আমাদের খাদ্য-সংকট দূর হইবে না। প্রতিবছর দুর্ভিক্ষ নিবারণেই আমাদের সকল শক্তি ও বিদেশী মুদ্রার অপচয় হইবে। খাদ্যে স্বয়ং নির্ভর হওয়াই আমাদের একমাত্র পন্থা এ বিষয়ে সকলেই একমত। স্বয়ংনির্ভর হওয়ার উপায় সম্বন্ধেও কোন মতভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক কৃষি, পানি সেচ, বন্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। এবার কাজ চাই। অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণায় বলা হইয়াছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইবে। এই পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংনির্ভর করিবার 'ফুল্ প্রুফ' স্কিম অবশ্যই থাকিতে হইবে। এ ব্যাপারে ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট কতটুকু কাজে লাগান যায়, ভারত সরকারের সহিত আগে হইতে পরামর্শ করিয়া তা ঠিক করিতে হইবে।

এ প্রসংগে পাম্পিং মেশিন সরবরাহের কথাটা না তুলিয়া পারিতেছি না। বেশ কিছুদিন আগে সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন, মোট ৩৫ হাজার পাম্পিং মেশিনের মধ্যে ২৮ হাজার পাওয়া গিয়াছে। সাত হাজার মাত্র বাকি আছে। হাতের ২৮ হাজারকে ঠিকমত বিতরণ করিবার এবং বাকি সাত হাজার তাড়াতাড়ি আনিবার ব্যবস্থা করিয়া লম্বা মেয়াদী কাজের এই দিকটা আশা করি সরকার এই মুহূর্তে সমাধা করিবেন। পাম্প চালাইবার মতো তেলের ও মেশিনগুলি চালু রাখিবার স্পেয়ার পার্টস ও মিস্ত্রি-কারিগরের অভাব না হয়, সেদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হইবে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

পাট বাঁচিলে আমরা বাঁচিব
এ কথা আজো সত্য

গিরস্ত বাড়িতে খোরাকি ও টাকার যে সম্পর্ক, বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ধান ও পাটের সম্পর্ক ঠিক তাই। খোরাকির টান পড়িলে গিরস্ত টাকা দিয়া চাউল কিনে আনেন। বাংলাদেশেরও পাট দিয়া চাউল কিনিতে হয়। বাংলাদেশের সৌভাগ্য এই যে, এই দুইটাতেই, সে উর্বর। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য এই যে, সবটাই হইয়া যায় লুটপাট। তাদের ধান লুটপাট করে প্রকৃতি। আর লুটপাট করে মানুষে। ঝড়ঝঞ্ঝা ও খরা-বন্যায় ধান লুট হয়। আর মুনাফাখোরি, চোরাচালানিতে পাট লুট হয়। এই কারণে বাংলাদেশের গণজীবনে স্বাচ্ছন্দ আসে নাই বহুযুগ ধরিয়া। কায়-ক্লেশে কোন প্রকারে এতদিন তারা দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু এবার দুইটাতেই বিপদ দেখা যাইতেছে। উভয় দিকেই আমাদের সরকারের তৎপর হওয়া অত্যাবশ্যক। অতীতের অবহেলাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু বেশি পরিমাণেই তৎপর হওয়া উচিত। পাটের দিকের বিপদটা মানুষের তৈয়ারী বলিয়া এটা আগে আজই আলোচনা করিতেছি। ধানের ব্যাপারটা প্রকৃতির সৃষ্ট; কাজেই অধিকতর জটিল ও গুরুতর। সেজন্য তার আলোচনা আগামীতে করিব।

পাটের আলোচনা করিতে গেলে সর্বশেষ সংবাদটির ভিত্তিতেই শুরু করা ভাল। একটি সংবাদ এজেন্সি মজুত পাট সম্পর্কে একটি সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। মাত্র সেদিন এই সংবাদটি প্রায় সব কাগজেই ছাপা হইয়াছে। তাতে বলা হইয়াছে যে, পাট রফতানী কর্পোরেশন ও তার এজেন্টদের মধ্যে মতভেদের দরুণ বহু পাট গুদামে জমা হইয়াছে। উহা রফতানীর কোনও ব্যবস্থা করা হইতেছে না। প্রকাশিত সংবাদটিতে শুধু এজেন্টদের পক্ষে কথাই বলা হইয়াছে। রফতানী কর্পোরেশনের তরফের বক্তব্য বলা হয় নাই। এজেন্টদের তরফের বক্তব্য এই যে, কর্পোরেশন ছোট ও বড় এজেন্টদের মধ্যে পক্ষপাতমূলক অন্যায় আচরণ করিতেছেন। শুল্ক পরিশোধের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক নির্দেশ দিয়াছেন। পাট সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে পাট সরবরাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন। এসব অভিযোগের জবাবে কর্পোরেশনের বক্তব্য কি, আমরা তা জানি না। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও কর্পোরেশন সংবাদপত্রে কোনও প্রতিবাদ প্রকাশ করেন নাই।

এসব অভিযোগের বা তাদের প্রতিবাদের সত্যাসত্য বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আজকার আলোচনার বিষয়ও তা নয়। আমাদের বিচার্য শুধু এই যে, যার দোষেই হউক, রফতানীযোগ্য বিপুল পরিমাণ পাট বিভিন্ন গুদামে পড়িয়া রহিয়াছে। এতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যে ব্যাঘাত হইতেছে তার ফলে আমাদের বৈদেশিক

বাণিজ্য যে মার খাইতেছে, এ ধরণের লোকসানের দিক ছাড়াও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা উদঘাটিত হইতেছে এই ব্যাপার হইতে। শুধু ব্যবসায়ীদের ভুলে অথবা কারচুপিতে যদি এটা ঘটিত, তবে এই লোকসানও আমাদের তত দুশ্চিন্তার কারণ হইত না। এটা শুধু সাময়িক লোকসানের কথা নয়। সে লোকসান শুধু ছোট ছোট নয়া ব্যবসায়ীর লোকসান বা সরকারের নিজস্ব লোকসানও নয়। ব্যাপারটা আসলে একটা অচল অবস্থা। মনে হইবে, এ অচল অবস্থার জন্য কর্পোরেশন দায়ী। কর্পোরেশন ন্যাশনালাইযড জুট ট্রেডের একমাত্র প্রতীক ও মুখপাত্র। কর্পোরেশনের ত্রুটি মানেই ট্রেড ন্যাশনালিযেশনের ত্রুটি। কর্পোরেশনের অসাফল্য ও ব্যর্থতার মানে পাট-ব্যবসায় জাতীয়-করণনীতির অসাফল্য ও ব্যর্থতা। ব্যাপারটা এমন সুদূর প্রসারী হওয়া সত্ত্বেও কেমন করিয়া এমনটা ঘটিতেছে, সরকারইবা কর্পোরেশনের এই অব্যবস্থার কি প্রতিকার করিতেছেন, তা জানা দরকার। মন্ত্রীরা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সব সময়ে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করিতেছেন যে, সমাজবাদের দুশমন পুঁজিপতিদের এজেন্টরা আমাদের সরকারের সমাজবাদী নীতি ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য ভিতর-বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে; দেশবাসী যেন তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। দেশবাসীকে এমন সতর্ক করিবার সময় নেতারা নিজেরা নিশ্চয় সতর্ক থাকেন। ট্রেডিং কর্পোরেশন কাপড়, সুতা ও নারিকেল তৈল আমদানীর ব্যাপারে ইতিমধ্যে যেসব কেলেংকারী করিয়াছে সেগুলির সবই আমলাদের ভুল-ভ্রান্তি, দুর্নীতি, না আমদানি জাতীয়করণের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র, তা কি সরকার তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে পাট রফতানী কর্পোরেশন সম্পর্কে যথোপযুক্ত সতর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই কেন? আর যদি টি. সি. বি. কেলেংকারি সম্বন্ধে তদন্ত না করিয়া থাকেন, তবে কেন করেন নাই, তাও দেশবাসীকে জানাইতে হইবে। অথচ এ সব গুরুতর ব্যাপারে সরকার দেশবাসীকে কনফিডেন্সে নিতেছেন না, মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন না। এটা সরকারের মস্ত বড় ভুল। বহু যুগের প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি হইতে সমাজবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণ করিতে হইলে মনের দিক দিয়া সকলেরই প্রস্তুতি নিতে হইবে। একদিকে শাসন কর্তৃপক্ষ ও আমলা-ফয়লারা যেমন মনের দিকে তৈয়ার হইবেন, অপরদিকে জনসাধারণকেও তৈয়ার করিতে হইবে। পাঠকরা জানেন, আমিও বহুবার বলিয়াছি যে, গণতন্ত্রটা যেমন একটা রাজনৈতিক জীবনধারা, সমাজবাদও তেমনি একটা অর্থনৈতিক জীবনধারা। উভয় ক্ষেত্রেই অভ্যাসের গুরুত্ব অনেকখানি। সেই জন্যই রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উত্তরণ যতখানি কঠিন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি হইতে সমাজবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণ ততখানি কঠিন। বরঞ্চ কিছু বেশি কঠিন। কাজেই এই উত্তরণ ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু পাট আমাদের জন্য এমন এক বস্তু যাকে লইয়া ভুল-ভ্রান্তির এক্সপেরিমেন্ট করিতে পারি না। পাট আমাদের কৃষক ভাইদের জন্য যেমন একমাত্র ক্যাশ-ক্রপ, আমাদের রাষ্ট্রের জন্যও তেমনি একমাত্র বিদেশী মুদ্রা। বিদেশী মুদ্রা। বিদেশী মুদ্রা সব জাতির জন্যই প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের জন্য অপরিহার্য। অন্য জাতির বেলা দরকার উন্নতির জন্য, আমাদের বেলা দরকার বাঁচিবার জন্য। বিদেশী মুদ্রা দিয়া আমাদের খাদ্য আমদানি করিতে হয়। এটা যতই দুর্ভাগ্যের বিষয় হউক, এ অবস্থা আমাদের উন্নয়নের যতই প্রতিবন্ধক হউক, যতদিন আমরা খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভর না হইতে পারিব, ততদিন শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই আমাদের বিদেশী মুদ্রার দরকার।

এমনিতেই আমাদের রফতানী আয়ে উঠানামা অত্যন্ত বেশি শুধু আমাদের দেশই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশ সম্বন্ধেই এটা সত্য। জাতিসংঘের 'ইকাফে' (ইকনমিক কমিশন ফর এশিয়া এণ্ড ফার-ইষ্ট) প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে বিস্তারিত জরিপ কাজ চালান হইয়াছে, তার রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত দুনিয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির রফতানী আয়ের উঠানামাই সর্বাপেক্ষা বেশি ও বিপজ্জনক। এই উঠতি-পড়তির অস্থিরতার অবসান ঘটাইয়া এইসব দেশের রফতানী আয়ে একটা স্থায়িত্ব আনিতে না পারা পর্যন্ত তাদের উন্নয়ন কাজ বাঞ্ছনীয় গতিতে অগ্রসর হইবে না। সেজন্য ঐ রিপোর্টে আমাদের রফতানি আয়ের উঠতি-পড়তির কারণ বর্ণনা ও তার প্রতিকারের উপায়ও নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রধান কারণ বলা হইয়াছে, আমাদের রফতানী দ্রব্য মূলতঃ কাঁচামাল এবং সে কাঁচামালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে শিল্পোন্নত দেশসমূহ। প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, আমাদের কাঁচামালের যথাসম্ভব শিল্পজাত দ্রব্য রূপান্তরকরণ ও বাজার বিস্তারকরণ। তাছাড়া আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ কারণও আছে। বন্যা-খরা ইত্যাদি কারণে উৎপাদনের উঠতি-পড়তি আছে। বিক্রয় ও রফতানির অব্যবস্থা আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাট সম্পর্কে যা-কিছু করণীয় সবই সরকারী কর্তব্য। অথচ গত পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী আমলে এ সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট তৎপর ছিলেন না। মোটেই কিছু করেন নাই, তা নয়। পাট পাকিস্তানী আমলেও রাষ্ট্রের প্রধান বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী দ্রব্য ছিল। কিন্তু পাটের আজকার গুরুত্বে ও আগেকার গুরুত্বে প্রচুর পার্থক্য আছে। পশ্চিম পাকিস্তান খাদ্য স্বয়ং-নির্ভর ছিল বলিয়া খাদ্য ক্রয়ে তাদের বিদেশী মুদ্রার দরকার ছিল না। পাটের অর্জিত বিদেশী মুদ্রায় তাঁরা শিল্প সরঞ্জাম খরিদ করিতেন এবং বিদেশী দেনার সুদ পরিশোধ করিতেন। এ সব কাজে পাটের আবশ্যকতা ছিল যতটুকু, শুধু তারই মাপকাঠিতে তাঁরা পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতেন। পাট উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণভার দিতেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের উপর। কিন্তু তার মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারটা রাখিতেন করাচী-পিণ্ডির কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ দুই হাতে থাকার যে অর্থনৈতিক অসঙ্গতি, সেটা আমরা পূর্ব

পাকিস্তানীরা পঁচিশ বছর চিল্লাইয়াও পাকিস্তান সরকারকে বুঝাইতে পারি নাই। বিদেশী ক্রেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পাট সম্মিলনী ডাকা হইয়াছিল নারায়ণগঞ্জে। এটা স্পষ্টতঃই ছিল পাট রফতানীকারক পুঁজিবাদীদের স্বার্থবিরোধী। তাঁদের অনিচ্ছা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বাণিজ্য দফতর এই সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর মাত্র কয়েকদিন আগে সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন হয়। পরবর্তী মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেন যে, আসন্ন পাট সম্মিলনীর সাথে পাকিস্তান সরকারের কোনও সম্পর্ক নাই। অতঃপর সম্মিলনীটি বেসরকারী বৈঠকে পর্যবসিত হয়। কাজেই তার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। পাট-ব্যবসাকে ফর্মালি জাতীয়করণ না করিয়াও পাট রফতানীটাকে একক সরকারী হাতে আনিবার ব্যবস্থায়ই ছিল বিদেশের বাজারে পাটের মূল্যে স্থায়িত্ব আনিবার একমাত্র পন্থা। ১৯৫৭ সালের ঐ সম্মিলনী ছিল ঐব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ। পুঁজিবাদী মনোপোলিস্টরা তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁরা ঐ সম্মিলনীর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ছাড়া আর সব পাকিস্তানী মন্ত্রিসভাই ছিলেন পুঁজিবাদীদের তাবেদার সরকার।

সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এবং সম্ভবতঃ ভিন্ন উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী আমলে আরেকটি পাট সম্মিলনী হইয়াছিল ঢাকাতে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে। ঐ সম্মিলনী সম্পর্কে আমি 'ইত্তেফাকে' ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। নিবন্ধটির নাম ছিল; 'সোনালী আঁশের অযত্নের অবসান হইবে কবে?' যাঁদের কাছে 'ইত্তেফাকের' ঐ সংখ্যাটি আছে, তাঁরা পুনরায় পড়িয়া দেখিতে পারেন, অথবা যাঁরা প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁরা স্মরণ করিতে পারেন, ঐ প্রবন্ধে আমি মোটামুটি দুইটি কথা বলিয়াছিলাম, প্রথমতঃ, পাট সম্পদের প্রতি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক অবহেলার উল্লেখ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে তার আমূল সংশোধনের আশা করিয়াছিলাম।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় ঐ সব অভিযোগের কারণ সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। পাট উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ এক হাতে আসিয়াছে। পাট ব্যবসায় ও রফতানী জাতীয়করণের পদক্ষেপ হিসাবে রফতানী কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পাট-সম্পদ সম্পর্কে আমাদের চিন্তার আর কোন কারণ থাকিবার কথা নয়।

কিন্তু কার্যতঃ দেখিতেছি, চিন্তার কারণ আগের মতোই আছে, বরঞ্চ কিছু বাড়িয়াছে। রফতানী কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আলোচ্য অভিযোগ তার প্রথম ও দৃষ্টিগোচর কারণ। আরও কারণ আছে। এই সেদিন মাত্র ঢাকাতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা হইয়া গেল। পাট সম্পর্কে সে সভায় নাকি সুদূরপ্রসারী এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কি সিদ্ধান্ত, তা দেশবাসী আজও জানিতে পারে নাই। কারণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ

আলোচনা সভাতেও সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেন এমন সভায় সংবাদপত্রের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই, বাংলাদেশ সরকার বা সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে তার কোনও কারণ দেখান হয় নাই। এটা কোনও সামরিক বা রাজনৈতিক সরকারী স্তরের গোপন পরামর্শ সভা ছিল না। এটা ছিল দুনিয়ার খ্যাতনামা কতিপয় অর্থ-বিজ্ঞানীর সেমিনার। এইসব অর্থবিজ্ঞানী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এইসব বিশেষজ্ঞের সারবান রচনা ও বক্তৃতা হইতে সংবাদপত্র পাঠকরা অনেক কিছু শিখিতে পারিতেন। তবু এমন সভায় সংবাদপত্রের প্রবেশাধিকার না থাকা খুবই বিস্ময় ও দুঃখের বিষয়।

এই বিস্ময় ও দুঃখ দুশ্চিন্তায় পরিণত হইয়াছিল যখন জানা গিয়াছে যে, এই সভায় পাট সম্পর্কে কতিপয় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সভাশেষে সমবেত বিশেষজ্ঞদের তরফ হইতে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে যা বলিয়াছেন, তাতে ধরিয়া লওয়া যায় ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক পাট গবেষণা কেন্দ্র, কলিকাতায় একটি আন্তর্জাতিক পাট বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এমন সিদ্ধান্তের সাথে আমাদের সরকারের সম্পর্ক আছে কিনা, আজও তা জানা যায় নাই। পাট গবেষণাকেন্দ্র পাট উৎপাদক যে কোনও দেশে হইতে পারে। কিন্তু পাট-বিক্রয় কেন্দ্র এক দেশে থাকিবে কেন, এবং থাকিলেও সে বিক্রয়কেন্দ্র বাংলাদেশের বাহিরে থাকিবে কেন, তার কারণ জানা দরকার। একটিমাত্র দেশে সব পাট উৎপাদক দেশের বিক্রয় কেন্দ্র থাকিতে হইলে সে কেন্দ্র বাংলাদেশেই থাকিতে হইবে। কারণ বাংলাদেশেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পাট-উৎপাদক দেশ। মাত্র কয়েক বছর আগের আন্তর্জাতিক হিসাবেও দেখা যায়, বাংলাদেশ বিশ্বে পাট-চাহিদার শতকরা আশি ভাগ সরবরাহ করে। এই হিসাব মনগড়া বা কোনও ব্যক্তির হিসাব নয়। 'ইকাফে'র জরিপের হিসাব।

ইংলণ্ডের ডাণ্ডি বা ভারতের কলিকাতা ইংরেজ আমল হইতেই পাট-বিক্রয়ের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকারের বসিবার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানী আমলের আগাগোড়া কলিকাতাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পাটের বিক্রয় কেন্দ্র। পাটের বাজার ও ফটকাবাজার সেখানেই ছিল। বিক্রেতা-খরিদ্দারের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির স্বার্থবিরোধী প্রমাণিত হওয়ায় সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা এর পরিবর্তন করেন। সরকারের বিদেশী মুদ্রা অর্জন ও পাটচাষার ন্যায্য মূল্য পাওয়া উভয় দিক হইতেই বিদেশে বিক্রয়-কেন্দ্র থাকার ব্যবস্থা অহিতকর প্রমাণিত হইয়াছিল। দেশ বিভাগের আগে বাংলার রাজধানী হিসাবেই কলিকাতা নগরী পাট বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। বাংলা ভাগ হওয়ার পরও কলিকাতায় পাট বিক্রয় কেন্দ্র থাকিবার কোন যুক্তি ছিল না। বাংলা বাঁটোয়ারার দিন বাংলার ভাগে পাট পড়িয়াছিল ৭২ লক্ষ বেল; পশ্চিম বাংলার ভাগে পড়িয়াছিল ১৩ লক্ষ বেল। সব পাটকল কলিকাতায় পড়াতেও ভারত সরকারের পাট চাষ বৃদ্ধির কোনও

পরিকল্পনা ছিল না। পূর্ব বাংলার পাট দিয়াই কলিকাতার কল চালাইবার ইচ্ছা তাঁদের ছিল। পাকিস্তান সরকারের অন্যায় জিদের ফলেই ভারত ধানক্ষেত ভাঙ্গিয়া পাট উৎপাদন বাড়াইয়াছিল। তবু পূর্ব বাংলার উন্নতমানের পাট উৎপাদন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই বলিয়া ভারত সরকার ন্যায্য মূল্যে পাকিস্তানের পাট আবশ্যকমত খরিদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। আওয়ামী লীগ বাণিজ্যিক ও সকল ব্যাপারে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতায় ও বন্ধুত্বের পক্ষপাতী ছিল বরাবরই। সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে যে পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি হয় তা তিন বছর মেয়াদী চুক্তি ছিল এবং সে চুক্তি মোতাবেক ভারতের পূর্ব পাকিস্তান হইতে বছরে আঠার লক্ষ বেল পাট কিনিবার কথা ছিল। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ভারত হইতে ৫ লক্ষ টন কয়লা ও পঞ্চাশ হাজার টন সিমেন্ট আমদানির কথাও ছিল। সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর এসবই ভণ্ডুল হইয়া যায়।

আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় সকল ব্যাপারে ভারত বাংলাদেশে সহযোগিতা ও পারস্পরিকতার দ্বার খুলিয়াছে। পাট সম্পর্কেও ভারত-বাংলাদেশে নতুন চুক্তি হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। তাই বলিয়া পাট ক্রয়-বিক্রয়ের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র কলিকাতা বা বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনও দেশে স্থাপিত হইতে পারে না। আশা করি, আমাদের সরকার এমন কোনও ব্যবস্থায় রাজি হইবেন না।

মুদ্দাকথা এই যে, পাট সম্বন্ধে আমাদের সরকারকে আরও অনেক বেশি মনোযোগী, উৎসাহী ও সতর্ক হইতে হইবে। স্বাধীনতার এক বছরে এ ব্যাপারে সরকার যাও যতটুকু করিয়াছেন, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। পাকিস্তানী আমলে আমরা আওয়ামী লীগাররা সব সময় বলিতাম 'পাট বাঁচিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা বাঁচিব।' বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সেই কথাই সত্য আছে; 'পাট বাঁচিলেই আমরা বাঙালিরা বাঁচিব' এ সত্য সরকার কখনও ভুলিবেন না।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

খাদ্যাভাব পূরণে ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং– এ জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থান

জন্মনিয়ন্ত্রণের শ্লোগানটা আজ বিশ্বব্যাপী। কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা সবাইকে ঘাবড়াইয়া দিয়াছে। এতদিন আমরা আণবিক বিস্ফোরণ, এটমিক এক্সপ্লোশনের কথা শুনিতাম। আজকাল আমরা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পপুলেশন এক্সপ্লোশনের কথা তার চেয়ে জোরেসোরে শুনিতেছি। জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), খাদ্য-কৃষি কর্তৃপক্ষ (ফোআ) ইত্যাদি সকল বিশ্ব প্রতিষ্ঠানই সমবেত আওয়াজে জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা লোকসংখ্যা হ্রাসের আহবান জানাইতেছেন বটে, কিন্তু 'ফোআ'র কণ্ঠস্বরটাই সকলের উপরে উঠিয়াছে। সে আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে বিশ্বময়। সকল দেশের সকল রাষ্ট্রনায়কই সে ধ্বনিতে কণ্ঠ মিলাইয়াছেন। প্রায় সব দেশের সরকারই জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। আমাদের সরকারও তাই করিতেছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের একাধিক উদ্দেশ্য আছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র-নেতাদের বিচারে এটার আশু উদ্দেশ্য খাদ্যঘাটতির মোকাবেলা করা। এই সীমিত উদ্দেশ্যের দিক হইতেও সমস্যাটা সত্যই বিপদসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, দুনিয়ার লোক-সংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে, তাতে সকলের মুখে খাবার দেওয়া শীঘ্রই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের জন্য এটা এত বড় সত্য যে, ব্যাপারটা বুঝাইতে কোনও বিশেষজ্ঞের দরকার হয় না। দুনিয়ার সবচেয়ে ঘন-বসতিপূর্ণ দেশ আমাদের। বছর বছর দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। সাড়ে সাত কোটি লোকের মুখে আহার দিবার মতো ফসল আমাদের দেশে নাই। প্রতি বছর খরা-বন্যা লাগিয়াই আছে। কাজেই আমাদের মনে হইতে পারে, খাদ্য-সমস্যাটা বুঝি শুধু আমাদের দেশে এবং আমাদের মতো কয়েকটি গরিব দেশেই সীমাবদ্ধ। আসলে কিন্তু তা নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এ সমস্যা বিশ্বব্যাপী। দুনিয়ার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হারটাই এ সমস্যার একমাত্র হেতু। সংক্ষেপে ব্যাপারটা আলোচনা করিলেই সমস্যার গুরুত্ব প্রতীয়মান হইবে। উনিশ শতকে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ছিল একশ নব্বই কোটি। বিশ শতকের শেষে, এই সংখ্যা দাঁড়াইবে সাড়ে তিনশ কোটি। একুশ শতকের শেষে এই সংখ্যা উঠিবে এক হাজার কোটিতে। এটা কল্পনা বা অনুমান নয়। গণিতের কথা। অতীতের পরিসংখ্যান হইতে দেখা গিয়াছে, জনসংখ্যা শতকরা বছরে একজন করিয়া বাড়িলে সত্তর বছরে, দুইজন করিয়া বাড়িলে পঁয়ত্রিশ বছরে এবং তিনজন করিয়া বাড়িলে পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ হইয়া যায়। আহার্য দ্রব্য খাদ্য প্রাণের উন্নতির ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়নের আগে দুনিয়ার মানুষের জন্মের হার ছিল শতকরা চার; আর মৃত্যুর হার ছিল শতকরা তিন। এই স্বাভাবিক নিয়মিত মৃত্যুর সাথে যোগ হইত কলেরা-বসন্ত-ম্যালেরিয়া বান-তুফানের অপমৃত্যু। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল শতকরা একেরও কম। বিজ্ঞান

ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিতে শিশু-মৃত্যু ও বান-তুফানের আকস্মিক মৃত্যুও কমিয়াছে; কলেরা-বসন্তের মড়কও কমিয়াছে; ডাক্তার-কবিরাজ বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত চিকিৎসার প্রসার হওয়াতে বয়স্কের মৃত্যুর হারও কমিয়াছে। এর ফলে বিশ শতকের শেষার্ধে মৃত্যুর হার শতকরা দুই-এ নামিয়া আসিয়াছে। জন্মের হার আগের মতই শতকরা চার থাকায় নিট জনসংখ্যার হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা দুই। ফলে পঁয়ত্রিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যাইতেছে। এই হিসাব হইতে আমাদের নিজের কথাটা একবার ভাবুন। আমাদের বর্তমানের সাড়ে সাত কোটি এই শতকের শেষে দুই হাজার খ্রিষ্টাব্দে গিয়া দাঁড়াইবে কমসেকম বার কোটিতে। সাড়ে সাত কোটির খাদ্যই জুটে না, বার কোটির খাদ্য পাইব কোথায়? কাজেই আমাদের সরকারও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার দিকে, মানে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মনোযোগী হইয়াছেন। স্বাস্থ্য-দফতরের উদ্যোগে ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কনফারেন্স করিয়া ফেলিয়াছেন। ফ্যামিলি প্লানিং বিভাগের তৎপরতা বাড়াইয়াছেন। খবরের কাগজে রেডিও-টেলিভিশনে এবং সরকারী প্রচার দফতরের মাধ্যমে জোর প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। অতি উৎসাহী কেউ কেউ এটাকেও যথেষ্ট মনে করিতেছেন না। আরও বেশি তৎপরতার জন্য সরকারকে তাগিদ দিতেছেন। থানায়-থানায়, এমনকি গ্রামে-গ্রামে ডাক্তার প্রচারক পাঠাইয়া, পান-বিড়ির দোকানসহ সমস্ত দোকান-পাটে জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিতেছেন। নারীপুরুষ বন্ধ্যাকরণ জনপ্রিয় করিবার, এমনকি গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করিবার দাবিও উঠিয়াছে। সমস্যা যেরূপ গুরুতর, তাতে সকলের পক্ষে এমন ব্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু আমাদের বিচার করতে হইবে, বিষয়টার সঠিক মূল্যায়ন হইতেছে কি না। জন্মনিয়ন্ত্রণ খুব ভাল কাজ। কিন্তু শুধু খাদ্যাভাবের দোহাই দিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলিলে সমস্ত বিষয়টাই ভাল্‌গারাইয বা অশালীন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনার পয়লা শর্ত হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটা উচ্চ আদর্শ। জননীর স্বাস্থ্যের দিক হইতেও এটা অপরিহার্য। কিন্তু শুধু খাদ্যাভাবের দোয়াই দিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলিলে গোটা কাজটাকেই খাট করা হয়। এমনকি, জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা খাদ্যাভাব পূরণ করা যাইবে কি না, সেটাও তর্কের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে। উঠা অসংগতও নয়। লোকসংখ্যা কম হইলেই খাদ্যাভাব হয় না, এটা তেমন সত্য নয়, লোকসংখ্যা বেশি হইলেই দুর্ভিক্ষ হইবে, এটাও তেমনি ঠিক নয়। ছিয়াত্তুরের (বাংলা ১২৭৬) মন্বন্তরের সময় বাংলার লোক-সংখ্যা ছিল মাত্র তিন কোটি ৭৫ লক্ষ। বাংলার তৎকালীন জনসংখ্যা জানা যায় ১৮৭১ (বাংলা ১২৭৮) সালে অনুষ্ঠিত প্রথম আদম শুমারিতে। তারপর ধরুন সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কথা। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ১৯৭০ সালের উপকূলীয় বন্যাতুফানে আমাদের লোক মারা গেল বিশ-পঁচিশ লাখ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে মারা গেল ত্রিশ লাখ। স্বাধীনতার পরে নিজেরা খুনাখুনি করিয়াও কম মরি নাই। হাজার জন্মনিয়ন্ত্রণ করিয়াও আমরা বাংলাদেশে দুই বছরে ষাট লাখ লোক কমাইতে পারিতাম না। ভবিষ্যতেও পারিব না। এত লোক হারাইয়াও আমরা আজ দুর্ভিক্ষের মুখামুখি।

সুতরাং দেখা গেল, দুর্ভিক্ষ এরাইবার উপায় জন্মনিয়ন্ত্রণ, মানে লোকসংখ্যা কমান ত নয়ই, স্থায়ীভাবে খাদ্য-সমস্যা সমাধানেরও এটা একমাত্র উপায় নয়। 'খোদা যত মুখ দেন, তত আহার দেন' ধর্মবিশ্বাসীদের এ কথা সকলে মানিতে না পারেন। কিন্তু 'প্রত্যেক মুখের সাথে দুইটি হাত আছে' বিজ্ঞানীদের এ কথা মানিতেই হইবে। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু মানুষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যও কি বাড়ে নাই? প্রকৃতিতে, মাটির উপরে সমুদ্রের তলায়, এমনকি হাওয়ায়, আমাদের জন্য কি পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে, তার হিসাব করা কি সম্ভব হইয়াছে? বিজ্ঞান বলে একর প্রতি খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ত বাড়িতেছেই, তার উপরও বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন, মাটির উপরের গাছ-পালার মতো গাছ-পালা সমুদ্রের তলদেশেও আছে। এসব গাছ-গাছড়ার পাতা হইতে বিজ্ঞান প্রচুর খাদ্যপ্রাণবিশিষ্ট আহার তৈয়ার করিতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীর মত এই যে, আমিষে নিরামিষে মানুষের খাদ্য উপযোগী এত সম্পদ বিশ্ব জগতে ও সৌরজগতে আছে মানুষ যা অনন্তকাল খাইয়াও শেষ করিতে পারিবে না। ১৯৫৪ সালে বিজ্ঞানীরা ফটোসিনথেসিস আবিষ্কার করিয়াছেন; সেটা ব্যবসায়িক পরিমাণে প্রস্তুত হইলে যে কোনো কোটি কোটি সংখ্যক লোকের আহার চলিতে পারে। তাছাড়া ইরানের বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন এটম হইতেও খাদ্য প্রস্তুতির পরিকল্পনা করিতেছেন। এক কথায় খাটিয়া খাইলে মানুষের খাদ্যের অভাব কোনও দিন হইবে না। কিন্তু খাটিতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে, ধন নয়, শ্রমই ক্যাপিটাল। সোনা নয় মানুষই পুঁজি। এ পুঁজির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। মানুষের শ্রম ব্যবহারের উপযোগী ও যথেষ্ট ক্ষেত্রেরও অভাব হইবে না। সমুদ্র বাদ দিয়াই পৃথিবীর মাঠের মোট আয়তন ছাপ্পান্ন কোটি বর্গমাইল। এই মাটির আয়তন মাত্র এগার ভাগের একভাগ মাটি বর্তমানে আবাদযোগ্য। এইটুকু জমিরও তিন ভাগের এক ভাগ শহর-নগর, বাড়ি-ঘর ও রাস্তাঘাট পূর্ণ। বাকি উননব্বই ভাগ জমি নদী-নালা, জলা-বিল, হ্রদ-খাল, পাহাড় ও মরুভূমিতে আবদ্ধ রহিয়াছে। মানুষের হাত পড়িলে কালক্রমে এ সবই আবাদ হইতে পারে। এক-এক রাষ্ট্রের এক-এক দেশ; সে দেশের আকার যত বড় এবং লোক-সংখ্যা যত কম হউক না কেন? এক দিকে বাংলাদেশের ঘন-বসতি, অপরদিকে অষ্ট্রেলিয়া-কানাডা-সাইবেরিয়ার মতো জনশূন্য বিশাল এলাকা। গোটা বিশ্বকে এক রাষ্ট্র ও গোটা মানব জাতিকে এক পরিবার ধরিয়া ভাগ-বন্টন করিলে আগামী একশ বছরের মধ্যে দুনিয়ার সব জমি আবাদ হইয়া যাইবে।

কিন্তু তাতেও জায়গার অকুলান হইবে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, যদি ভূপৃষ্ঠের হ্রদ-নদী ও পাহাড় মরুভূমির সবটুকু আবাদযোগ্য ও বাসোপযোগী করা হয়, তবু তাতে মানুষের শুধু দাঁড়াইবার জায়গা হইবে, শুইবার জায়গা হইবে না। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, যদি বছরে শতকরা একজন করিয়াও মানুষ বাড়িতে থাকে, তবে এক হাজার একশ বার বছর পরে সমস্ত দুনিয়ার মাটি জনপ্রতি মাত্র এক বর্গ গজ করিয়া পড়িবে।

তখন মানুষ আর একতল বাড়ি বানাইতে পারিবে না। উপরের দিকে উঠতে হইবে। দু'চার শ তলা নয় পাঁচ-দশ হাজার তলা বাড়ি বানাইতে হইবে। মানুষ তাও পারিবে এবং করিবে। বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছু নাই। এতেও যদি স্থান সংকুলান না হয়, তবে চাঁদ মংগল ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহ ত আছেই।

পাঠকগণ, এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধু খোরাকির সমস্যাই সৃষ্টি করিতেছে না, বসতি সমস্যারও সৃষ্টি করিতেছে। এটাও পাঠকরা দেখিলেন, উভয় সমস্যার সমাধানও আছে বস্তুতঃ, যত সমস্যা, তত সমাধান। যত মুশকিল, তত আসান। 'নেসেসিটি ইজ দি মাদার অব ইনভেনশন।' মানুষ বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে এবং তা করিয়াছে সমস্যা সমাধানের জন্যই। জন্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া, মানে লোকসংখ্যা কমাইয়া খাদ্য ও বসতি-সমস্যা সমাধান কোনও সমাধান নয়। ওটা মাথার বিষ নিবারণের জন্য মাথা কাটিয়া ফেলার সমতুল্য। লোক কমাইয়া খাদ্য সমস্যার সমাধান যদি যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়-সংগত হইত, তবে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়া উচিত হইত। বাংলাদেশের খাদ্যসমস্যার সবচেয়ে কার্যকরী সমাধায়ক হিসাবে পাক-বাহিনীকে আমাদের পুরষ্কার দেওয়া উচিত হইত।

পাঠকগণ মনে করিবেন না, আমি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিতেছি। না, আমি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী নই। রবঞ্চ ভীষণ সমর্থক। জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করিয়া আমি অতীতে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছি। একখানি বেশ বড় আকারের বইও লিখিয়াছি। তার নাম পরিবার পরিকল্পনা। আমি সত্যই বিশ্বাস করি, পরিকল্পিত পরিবারই সুখী পরিবার। সুখী পরিবার গড়ার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সুখী দম্পতি, সুস্থ জননী, গুণবান স্বাস্থ্যবান ভদ্র স্নেহময়, ভাই-বোন, এ সবের জন্যই চাই জন্মনিয়ন্ত্রণ। খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ দরকার। কিন্তু সেটা জাতির খাদ্য সমস্যা নয়, পরিবারের খাদ্য সমস্যা। পরিবারের খাদ্য সমস্যা মানেই অর্থ সমস্যা, মানে দারিদ্র। অপরিকল্পিত বড় পরিবার মানেই দারিদ্র।

পরিবারের সমষ্টিই জাতি। সুতরাং এই হিসাবে জাতির জন্যও জন্মনিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। সুস্থ, সুখী, শিক্ষিত পরিবারের সমষ্টিই সুস্থ্য, সুখী ও শিক্ষিত জাতি। এজন্য ছোট বড় সব জাতিকেই জন্মনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের সরকার ও জাতীয় নেতাগণই এটা করিবেন। এটা করিতে গেলে জনমত তৈয়ার করিতে হইবে। সরকারী নীতি হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করাইতেও জনমত গড়িতে হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সফল করিতেও জনমত দরকার হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে জনমত গঠন করিতে লাগিবে এডুকেশন ও মোটিভেশন। 'এডুকেশন' মানে এখানে লিটারেসি বা বিদ্যাশিক্ষা নয়, জ্ঞানশিক্ষা। মোটিভেশন মানে উদ্দেশ্য প্রণোদিত করা। শুধু খাদ্যাভাব এড়াইবার চেয়ে সে উদ্দেশ্য মহত্তর হইতে হইবে। 'চুরি করিলে জেল খাটিবে', এটাই চুরি বিরুদ্ধে যথেষ্ট শিক্ষা দান নয়। চুরির নৈতিক অপরাধের দিকটাও বুঝাইতে হইবে।

ঠিক তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণের আত্মিক ও নৈতিক মহত্তর দিকও লোককে বুঝাইতে হইবে। এজন্য প্রচার-প্রচারণা চাই। সাহিত্য ও সৃষ্টি চাই। কাজেই বিষয়টা দীর্ঘমেয়াদী। শুধু অর্থনীতিক নয়, ন্যায় নীতিক ও সমাজনীতিক গুরুতর প্রশ্নও এটা। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ বা খাদ্য সমস্যা সমাধানের মতো খাট মেয়াদী ব্যাপারের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো লম্বা মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করিলেও জন্মনিয়ন্ত্রণও হইবে না, খাদ্য-সমস্যার সমাধানও হইবে না।

হয় যে না, তার প্রমাণ আমরা হাতে-হাতেই পাইয়াছি। পাকিস্তানী আমলে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৫ লাখ, দ্বিতীয় পাঁচসালায় ৩ কোটি ৫০ লাখ ও তৃতীয় পাঁচসালায় ১৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা গোটা পাকিস্তানের পরিবার পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ভারতে করা হইয়াছিল প্রথম পাঁচসালায় ৬৫ লাখ, দ্বিতীয় পাঁচসালায় ৫ কোটি, তৃতীয় পাঁচসালায় ২৭ কোটি ও চতুর্থ পাঁচসালায় ৯৫ কোটি। ভারতের প্রথম পরিকল্পনার সময় পাকিস্তানে পাঁচসালা শুরুই হয় নাই। কাজেই ভারতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাঁচসালা পাকিস্তানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁচসালার সমসাময়িক। দুই সরকারের অর্থ বরাদ্দ হইতে দেখা যাইবে যে, লোকসংখ্যানুপাতে উভয় রাষ্ট্রের নেতাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের উৎসাহ প্রায় সমান ছিল। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ও পন্থা যে ভুল ছিল, এটাও তারা বুঝিয়াছিলেন একই সময়ে। পাকিস্তানের তৃতীয় ও ভারতের চতুর্থ পরিকল্পনা রচনার সময়েই আগের পাঁচসালা পরিকল্পণায় জন্মনিয়ন্ত্রণের সকল প্রয়াসে নৈরাশ্য প্রকাশ করা হয়। উভয় দেশের পরিকল্পনা-রচয়িতা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রায় একই অভিমত প্রকাশ করেন। সে অভিমতের মূলকথা দুইটি; এক. জনগণের মানসিক প্রস্তুতির আগে দরকার; দুই. পশ্চিমা যন্ত্রপাতির চেয়ে সহজ পন্থা আবশ্যক।

বিশেষজ্ঞেরা ঠিকই বুঝিয়াছেন। আমরা উম্মি জনসাধারণও চোখে দেখিয়াছি। এক দিকে, পশ্চিমা জটিল যন্ত্রপাতি আনাড়ি হাতে পড়িয়া কত জননীর ও দম্পতির জীবন বিষময় করিয়াছে এবং দুর্নীতির বাজার বসাইয়াছে। অপরদিকে, শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর স্বেচ্ছাকৃত বন্ধ্যাকরণ কত সফল হইয়াছে। শিক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতির দ্বারা এই অত্যাবশ্যক দীর্ঘমেয়াদী কাজটি ধীরে ধীরেই হইবে। জ্ঞানলাভ করিলে যন্ত্রপাতি ও পিল ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

তাই আমার আরজ, আমাদের চিন্তাবিদ ও প্ল্যানাররা জন্মনিয়ন্ত্রণকেও দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও খাদ্য দূরীকরণের সাথে গোল পাকাইবেন না। কেউ কেউ যেন মনে করেন, দুর্ভিক্ষে ও খাদ্য সমস্যায় আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফায়ার ব্রিগেড আনিলেই সে আগুন নিভিয়া যাইবে। ব্যাপারটা তা নয়। আশা করি, সরকার এঁদের ব্যস্ততায় বিপথগামী হইবেন না।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

প্রথম নির্বাচনেই সংবিধানকে সফল করিতে হইবে

আসন্ন নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা বলিতেছেন সবাই। সে গুরুত্ব ও যে-সে গুরুত্ব নয়। আমাদের জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যতের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কথাটা সবাই বলিতেছেন। প্রায় সবাই বুঝিয়াছেনও। 'প্রায়' বলিবার কারণ আছে। নির্বাচন প্রার্থীদের কোনও কোনও দলের নেতাদের কেউ কেউ বলিতেছেন, নির্বাচনটাকে তাঁরা তাঁদের মতবাদ-প্রচারের সুযোগ মনে করিতেছেন। কথাটার তাৎপর্য এই যে, আসন্ন নির্বাচনটাকে তাঁরা সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠনের পন্থা মনে করেন না। তার মানে এরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের আস্থাভাজন নন। তাঁদের এই মত ঠিক কি অঠিক, সে কথা বলিতেছি না। আজকার আলোচনায় তাঁদের মতামত ধর্তব্যের মধ্যে নয়, এটা বুঝাইবার জন্যই কথাটা তুলিলাম। যাঁরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁরাই আসন্ন নির্বাচনকে আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকনির্দেশক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করেন। কেন করেন, এ কথাটাই আলোচনা হওয়া দরকার। সব দলের নেতাদের, প্রার্থীদেরও ভোটারদের কথাটা বুঝা দরকার। আমার বিশ্বাস, আওয়ামী লীগসহ সব দলের নেতারাই কথাটা বুঝেন। কিন্তু বলেন না। না বলার কারণও আছে। কারণটা স্বাভাবিক। নিজেরা নির্বাচনে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই যাঁর-তাঁর জয়কে স্বভাবতই বড় করিয়া দেখিতেছেন। নির্বাচনের নিজস্ব গুরুত্বটা, নির্বাচনের ফলাফলের তাৎপর্যটা বুঝা তাদের পক্ষে কঠিন। বলা আরও কঠিন। নিজে নির্বাচন প্রার্থী নন, অথচ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন লোকের পক্ষেই কথাটার নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব। তাঁর অভিমতটাও নির্ভুল হইতে পারে। তাই এমন লোকের কথা বলা এখন দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

আমি যদি বলি, আমি নিজেই এই শ্রেণীর একজন, তবে পাঠকরা আশা করি বেআদবি ধরিবেন না, এটাকে আমার অহংকারও মনে করিবেন না। অহংকারের অভিযোগ হইতে রেহাই দিবেন এই জন্য যে, 'আমি একমাত্র ব্যক্তি' বলি নাই, 'এই শ্রেণীর একজন' বলিয়াছি। আর বেআদবির অভিযোগ হইতে রেহাই পাইব এইজন্য যে, এটা আমার কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। 'ইত্তেফাকের' মতো বহুল-প্রচারিত জনপ্রিয় দৈনিকে আমি লিখিতে পারি। এমন সুযোগ এই শ্রেণীর সকলের নাই। যাঁদের আছে, তাঁরাও আমার দেখাদেখি এ ব্যাপারে কথা বলিতে পারেন। এই কারণেই আমার কর্তব্য সকলের আগে। আরেক কারণে এই কর্তব্য সম্বন্ধে আমি অতিশয় সচেতন। গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশ শাসন করিয়া আওয়ামী লীগ অন্ততঃ পঁচিশ বছর গদিতে থাকুক, এই দোওয়া আমি আগেই করিয়া ফেলিয়াছি। এই দিক হইতে বিচার করিলে এ কাজে আমার বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ইলেকশনের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। আজই কথাটা না বলিলে

ইলেকশনের আগে আর আমার কথাটা বলাই হইবে না। ফলে বেআদবির অভিযোগের স্থলে কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগটাই বেশি জোরদার। তবু কথাটা বলিতে গিয়া এত লম্বা ভূমিকা করিতেছি এইজন্য যে, কথাটা শুনিতে উপদেশের মতো শুনাইবে। উপদেশ দেওয়াটা আজকাল অপ্রিয় কাজ। অযাচিত হইলে সেটা আরও অপ্রিয় এবং বিরক্তিকর। এত ভূমিকা যখন করিলাম তখন কথাটা বলিয়াই ফেলি।

আসন্ন নির্বাচনটা আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, 'এ ধরণের নির্বাচন আমাদের জীবনে এই প্রথম।' 'এ ধরণের' কথাটার উপর আমি জোর দিতেছি। নির্বাচন আমরা এর আগেও করিয়াছি। বেশ কয়েক বারই করিয়াছি। সার্বজনীন ভোটাধিকারের নির্বাচনও করিয়াছি। ইংরেজ আমলেও করিয়াছি। পাকিস্তানী আমলেও করিয়াছি। কিন্তু আজ যে নির্বাচন করিতে যাইতেছি এমন নির্বাচন আর করি নাই। আগেকার সব নির্বাচন হইতেই এটা পৃথক, ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এমনকি এই সেদিন ১৯৭০ সালের যে নির্বাচন করিয়াছি, সে নির্বাচন হইতেও, '৭৩ সালের আসন্ন নির্বাচনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুধু ভিন্ন ধরনের নয়, একেবারে নতুন ধরনের। কেন 'ভিন্ন' কেন 'নতুন' এটা সকলের বুঝিতে হইবে। শুধু বুঝিলেই চলিবে না, সেমত কাজও করিতে হইবে। এই জন্য বুঝাটাও একটু বেশি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমেই ধরুন, এই নির্বাচনে আমাদের একটা পার্লামেন্ট গঠন করিতে হইবে। পার্লামেন্ট মানে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টারি পদ্ধতির রাষ্ট্র পরিচালনার ও সরকার গঠনের জন্য একটা সার্বভৌম পার্লামেন্ট। আমাদের সদ্য-রচিত সংবিধানে স্পষ্টই বিধান করা হইয়াছে, আমাদের সরকার হইবেন পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার। এই সংবিধান রচনা ও প্রবর্তনের পর এটাই আমাদের দেশে প্রথম নির্বাচন। আগের-আগের কোনও নির্বাচনী অভিজ্ঞতা ও আচার-আচরণ এই নির্বাচনে আমাদের কাজে লাগিবে না। বরঞ্চ বিপদগামী করিতে হইবে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী অভিজ্ঞতাটাই আমাদের সর্বাধুনিক, সুতরাং সবচেয়ে তাজা অভিজ্ঞতা। কাজেই তার সাথে তুলনাটাই সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ হইবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যে আমাদের দিক হইতে দুইটা তাৎপর্য ছিল। এক. গোটা পাকিস্তানের জন্য একটা ফেডারেল সংবিধান রচনা করা; দুই. সে সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সর্বাধিক অটনমির নিশ্চিত বিধান করা। পূর্ব পাকিস্তানের এই সর্বাধিক অটনমির রূপরেখা ছিল আওয়ামী লীগের ছয়দফা। পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের বিপুল মেজরিটি ঐ দাবির সমর্থক ছিলেন বলিয়া তাঁরা একযোগে সবভোট আওয়ামী লীগকে দিয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব সীট আওয়ামী লীগের ভাগে পড়াতেও পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি সরকার গঠনে এবং পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংবিধান রচনায় কোনও বিঘ্ন ঘটিবার আশংকা দেখা দেয় নাই।

এবারকার নির্বাচন সংবিধান রচনার নির্বাচন নয়। পার্লামেন্ট ও সরকার গঠনের নির্বাচন এটা। এ নির্বাচনে যে পার্লামেন্ট গঠিত হইবে তাতে মেজরিটি-মাইনরিটি থাকিতে হইবে। মেজরিটি দল সরকার গঠন করিবেন। মাইনরিটিরা অপজিশন গঠন করিবেন। পার্লামেন্টের এই দুই দল একই দেহ বা বস্তুর অপরিহার্য অংগ। দেহের দুই পা। বিজলির নেগেটিভ-পজিটিভ। ডালকলাইর দুইটি দানা। দুই না হইলে চলিবেই না। দেহের হাত চোখ কান না বলিয়া শুধু পা বলিলাম। কারণ এক হাত, এক চোখ, এক কান লইয়াও মানুষের চলে। কিন্তু পা দুইটি না হইলে চলে না। একটির অভাব হইলে তা কাঠ বা প্লাষ্টিক দিয়া বানাইয়া লইতে হয়। মোট কথা, পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে পার্লামেন্টের পজিশন-অপজিশন দুইটি অংগ এতই অপরিহার্য যে, দুনিয়ার পার্লামেন্টারি সিস্টেমের জননী বৃটিশ পার্লামেন্টের দুই দলকেই 'ক্রাউনস পার্টি' বা 'রাজার দল' বলা হয়। অপজিশনের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর সমান মর্যাদা ও বেতন দেওয়া হয়। অনেক অভিজ্ঞতার ফলেই এই পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। পার্লামেন্টারি ও প্রেসিডেনসিয়াল উভয় পদ্ধতির পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। কাজেই এই দুই পদ্ধতির যে কোনও একটা বাছিয়া লইবার অধিকার আমাদের ছিল। কিন্তু আমরা যখন পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাছিয়া লইয়াছি, তখন এই পজিশন-অপজিশন প্রথা মানিয়া লওয়া বাধ্যকর হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে রাজনীতিকে 'স্পোর্টস' বা ক্রীড়া হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'ক্রীড়াকে' এখানে তাচ্ছিল্যের অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। শত্রুতাহীন সংঘর্ষ হিসাবেই নেওয়া হইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব খেলাতেই দুই পক্ষ লাগে। এক পক্ষে খেলা হয় না। দুই পক্ষে প্রবল প্রতিযোগিতা হয়। হারজিত হয়। কিন্তু শত্রুতা হয় না। এরই নাম 'স্পোর্টস ম্যানস স্পিরিট' খেলোয়াড়ী মনোভাব। রাজনীতির মতো গুরুতর ব্যাপার এই 'স্পোর্টস ম্যানস স্পিরিট' আমদানি করা বৃটিশ পদ্ধতির একটা অমূল্য অবদান। আমরা এই কারণেই দুনিয়ার সব রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতিকেই বেশি পছন্দ করি। আমাদের রাষ্ট্রনায়করা বিশেষতঃ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আওয়ামী লীগ এই কারণেই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সমর্থক। এই কারণেই তাঁরা গণপরিষদের কার্যতঃ একক দল হইয়াও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংবিধান রচনা করিয়াছেন। কাজেই বিরোধী দলের যাঁরা বলেন, আওয়ামী লীগ একদলীয় ফ্যাশিযম বা সিযারিযম প্রবর্তন করিতে চান, তাঁদের সাথে আমি একমত নই। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দেশে সত্যি সত্যি পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসন কায়েম করিতে চান এটা আমি বিশ্বাস করি। সাবেক পরিষদে তাঁরা একমাত্র দল ছিলেন। একদলীয় শাসন চাহিলে সেটা ভাংগিয়া দিতেন না।

কিন্তু একাজে তাঁরা ভুলভ্রান্তি করিতেছেন, তাও আমি স্পষ্টই দেখিতেছি। আমার মতে, সে ভুলভ্রান্তি ঘটিতেছে সাধু উদ্দেশ্যের অভাবে নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে। কিন্তু ভুল ভুলই। সে ভুল বিপজ্জনক হইতে পারে ইচ্ছায় ঘটুক আর অনিচ্ছায় ঘটুক। সে ভুল দেখাইয়া দেওয়া সকলের উচিত।

কিন্তু বর্তমান পরিবেশে এটা সম্ভব হইতেছে না। কারণ কেউ কারও কথা শুনিতেছেন না। কেউ কারও কথা শুনিতেছে না এই জন্য যে, শুনিবার মতো নিরপেক্ষতা কারও মধ্যে নাই। আমার মতে, সরকারী দলের উদারতার অভাবে এটা ঘটে নাই; অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণের অভাবেই এটা ঘটিয়াছে। আওয়ামী লীগের বিপুল জনপ্রিয়তা, সে পরিমাণের বিরাট দায়িত্ব কোনটাই তারা আন্দায করিতে পারেন নাই। এককথায় তাঁরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আত্মবিশ্বাস হারাইবার তাঁদের যথেষ্ট কারণও ছিল। সে সবের আলোচনা 'ইত্তেফাকের' পৃষ্ঠাতেই আমি অনেক করিয়াছি। পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। ঐসব ভুলভ্রান্তির ফলে গণমনে এমন বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল যে, আমি নিজেও তাঁদের প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলাম। আমার আশঙ্কা এমন হইয়াছিল যে, আওয়ামী লীগ বুঝি আগামী নির্বাচনে যথেষ্ট মেজরিটি পাইল না। কিন্তু সে পরিস্থিতি ছিল সাময়িক। সেটা কাটিয়া গিয়া এখন আমার মনে উল্টা আশংকা দেখা দিয়াছে, পার্লামেন্টে বুঝি প্রয়োজনীয় অপজিশন গড়িয়া উঠিল না। দুইটাই যে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির জন্য এবং সে কারণে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এটা বুঝিতেছেন না। এটাই তাঁদের চতুর্থ ভুল। এ ভুল গোড়াতেও হওয়ার কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু তা যথাসময়ে কাটিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পজিশন-অপজিশনে দেশে বর্তমানে যে ডজনখানেক পার্টি আছে। আওয়ামী লীগের অনুকূল অবস্থা এই যে, তারাই সংঘবদ্ধ পার্টি, আর সবাই বিচ্ছিন্ন। আওয়ামী লীগের প্রতিকূল অবস্থা এই যে, তারা সরকারী দল। সরকারের অসংখ্য ভুলভ্রান্তির জন্য জনগণ আওয়ামী লীগের উপর বিক্ষুব্ধ। অপর সব দল ঐক্যবদ্ধ হইয়া গণমনের এই বিক্ষোভকে কাজে লাগাইতে পারিলে তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারাইয়া দিতে পারিতেন। এটাই হইত নয়া রাষ্ট্রের পক্ষে-বিপদের কথা। যুদ্ধবিধ্বস্ত নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশের পুনর্নির্মাণের জন্য একটি স্ট্যাবল গভর্নমেন্ট অপরিহার্য। একমাত্র আওয়ামী লীগই দেশকে এই স্ট্যাবল গভর্নমেন্ট দিতে পারেন। অপজিশন পার্টি সমূহের যুক্তফ্রন্ট তা দিতে পারেন না। সৌভাগ্যবশতঃ অপজিশন দলসমূহের অন্ততঃ দুইজন প্রবীন নেতা মাওলানা ভাসানী ও মাওলানা আতাউর রহমান খাঁ গোড়া হইতেই এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বোধ হয় এই করণেই মাওলানা ভাসানী বরাবর গদি দখলের উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধী ছিলেন। আর আতাউর রহমান সাহেব আগাগোড়া সুষ্ঠু অপজিশন গড়ার কথাই বলিয়াছেন। তবু অপজিশন পার্টি সমূহের যুক্তফ্রন্ট গড়ার চেষ্টা হইয়াছে। অনেকের আন্তরিক ইচ্ছা তা ছিলও। এটাই ছিল বিপদের দিক। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক,

অপজিশন পার্টি সমূহের ঐক্য চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এই বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তা বুঝিতে পারেন নাই। এটাই তাঁদের পঞ্চম ভুল।

বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগ নেতারা জানেন, পার্লামেন্টারি পদ্ধতি ফেল করাইতে ইচ্ছুক কিছু বিপ্লবী নেতা আমাদের দেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আওয়ামী নেতাদের কোন কোন আচরণ তাঁদেরই সহায়তা করিতেছে মাত্র। এদিকে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 'ইত্তেফাকে' অনেক কথা বলিয়াছি। কিন্তু ফল হয় নাই। তাই দুর্ভাবনায় কাল কাটাইতেছিলাম। এমন সময় আমার এক প্রবীণ বন্ধু আসিয়া আমার মনে উৎসাহ ও আশা সৃষ্টি করিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, আমার দুশ্চিন্তা অমূলক। নৌকাকে নির্বাচনী প্রতীক করিয়া বঙ্গবন্ধু ভোটারদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি নিজে নৌকার কাণ্ডারী ঠিকই, কিন্তু সে নৌকা চালাইতে পজিশন-অপজিশন, ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকের দাঁড়ি লাগিবে। বন্ধুবর উপসংহারে বলিলেন, নৌকা মানেই পার্লামেন্টারি শাসন বঙ্গবন্ধুর এই সোজা ইশারাটা বুঝিলেন না?

বন্ধুবর আমারই মতো বৃদ্ধ প্রবীণ ও ঘরেবসা নিরপেক্ষ রাজনীতিক। তাঁর কথায় উৎসাহে চমৎকৃত হইয়াও বলিলাম, 'কিন্তু গত নির্বাচনেও তাঁর প্রতীক ছিল নৌকাই।'

বন্ধুবর সমান উৎসাহে বলিলেন : সেটা ছিল নৌকায় উঠার পালা। এবারেরটা নৌকা চালাইবার পালা। পার্থক্যটা বুঝিলেন ত?

বন্ধুবরের এই রংগীন উপমা কি সত্য হইবে।

২রা মার্চ, ১৯৭৩

উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির জন্য সবাইকে 'বাস্তবতা' মানিতে হইবে

পাঁচ-পাঁচটা মাস পরে ইত্তেফাকের পাঠকদের খেদমতে হাজির হইতেছি। দীর্ঘদিন অসুখে ভুগিয়া কিছুটা সারিয়া উঠিয়াছি। এতদিন পরে কি কথা লইয়া পাঠকদের সামনে হাজির হইবে, তা নিয়া অনেক ভাবিয়াছি। সব চেয়ে জরুরী কথাটাই আগে বলা দরকার, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই।

বর্তমানের সবচেয়ে জরুরী বিষয়টা কি? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাই আজিকার সবচেয়ে জরুরী ও আশু কর্তব্য। একটু ধীরভাবে বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, আমাদের রাজনৈতিক ও শাসনযান্ত্রিক সমস্ত বিশৃংখলা ও অস্থিরতার মূল কারণ গোটা উপমহাদেশের সামগ্রিক অশান্তি ও স্থিতিহীনতা। আমাদের ব্যক্তিজীবনের ভাত-কাপড়ের অভাব হইতে সমাজ-জীবনের অশান্তি বিশৃংখলা পর্যন্ত যতগুলি সমস্যা দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, এ সবের জন্য আমরা প্রায় সকলেই সরকারী অব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতাকেই দায়ী করিতেছি। ঠিকই করিতেছি। কিন্তু আমাদের সরকারকে কি কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে, কোন্ কোন্ বৃহত্তর ও গুরুতর পরিস্থিতি আমাদের শাসকগোষ্ঠীকে দিশাহারা করিতেছে তা আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতেছি না। দেখিলেও বুঝিতেছি না। বুঝিলেও বলিতেছি না। স্বাধীন সংবাদপত্র ও পার্লামেন্ট স্বীকৃত অপজিশন দল না থাকার দরুনই এটা ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু এটাই এ ব্যাপারে শেষ কথা নয়। কথাটা আরও বড়। সমস্যাটা আরও ব্যাপক, আরও জটিল।

ব্যাপারটার বিচার এইভাবে করা যায়। খুন-খারাবি, ডাকাতি, হাইজাক, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি যেসব দুঃসহ যন্ত্রণায় আমরা ভুগিতেছি তার একটাও একা আমাদের দেশের দুর্দশা নয়, প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানও এই রোগে ভুগিতেছে। এক কথায়, সারা উপমহাদেশটাই প্রায় অরাজকতার শিকার হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অনভিজ্ঞতা ও অযোগ্যতাকে এসব অবস্থার জন্য দায়ী করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের শাসনকর্তাদের এ দোষে দোষী করা যায় না। সুগঠিত ঐতিহ্যবান রাজনৈতিক পার্টি, সংগ্রামী আদর্শবাদী নেতৃত্ব, অভিজ্ঞ বুরোক্র্যাসি, সুসংবদ্ধ শাসনযন্ত্র, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ উপদেষ্টা, ত আছেন ভারতের। তবু সেখানে আমাদের নয়া রাষ্ট্রের মতই রাহাজানি খুন-খারাবি, রাজনৈতিক হানাহানি, মুদ্রাস্ফীতি, ভোগ্য দ্রব্যের দুর্লভতা ইত্যাদি হাজার রকমের পাপ জনগণের অপরিসীম দুর্দশা ঘটাইতেছে কেন?

যত চিন্তা করিবেন, অবস্থার যত নিপুণ বিশ্লেষণ করিবেন, ততই উপলব্ধি করিবেন, এ সবের মূল কারণ একটাই। সে কারণ উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক স্থিতিহীনতা। ১৯৭১ সালে এই উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক ওলট-পালট ঘটিয়াছে, এবং তার ফলে গোটা পরিবেশে যে অস্থিরতা আসিয়াছে, তার অবসান আজও হয় নাই। এটাকে একটা রাজনৈতিক ভূমিকম্প বলা যায়। সে ভূমিকম্পের কম্পন আজও থামে নাই। এটা ছিল মানুষের সৃষ্ট ভূমিকম্প। মানুষই এটা থামাইতে পারিত। আমাদের নেতারা তা পারেন নাই। রাজনৈতিক ভূমিকম্প, বিপ্লব বা ওলট-পালট একটা শক্ত কঠোর বাস্তব সত্য। এ বাস্তবতা মানিয়া না নেওয়া পর্যন্ত স্থিরতা ও স্থিতিশীলতা আসিবে না। কম্পন থামিবে না। এটা সকল রাষ্ট্রনায়কই বুঝিয়াছেন। তাই সকলেই পরস্পরকে 'বাস্তবতা' মানিয়া লইবার উপদেশ দিতেছেন। 'বাস্তবতা' মানিয়া না লওয়ার জন্য একে অপরকে দোষ দিতেছেন। তার মানে আসল বাস্তবতা যে কি, সে সম্বন্ধে সকল পক্ষ একমত হইতে পারিতেছেন না।

অথচ উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি সবাই চাহিতেছেন। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের নেতারা ত চাহিতেছেনই, আমাদের হিতৈষী ও বিশ্বশান্তিকামী বিদেশী রাষ্ট্রনায়করাও চাহিতেছেন। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের শিমলা চুক্তি ও ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণা এই শান্তি-কামনার উজ্জ্বল নির্দশন। শিমলাচুক্তি এই উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির মূলনীতি নির্ধারক একটা ঐতিহাসিক মূল্যবান দলিল। যুক্তঘোষণা উপমহাদেশের মানবিক প্রশ্ন মীমাংসায় ভারত-বাংলাদেশ নেতাদের প্রবল আগ্রহের প্রমাণ। কিন্তু কোনটায়ই কিছু কাজ হইল না। এক পা আগান গেল ত দুই পা পিছাইতে হইল।

এর কারণ কি? একমাত্র কারণ ঐ 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধির অভাব। এই উপলব্ধির অভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, যেখানে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও মীমাংসা দরকার, সেখানে আমরা দ্বি-পক্ষীয় আলোচনা করিতেছি। উপমহাদেশের প্রথম বাস্তবতা এই যে, ১৯৭১ সালের আগে উপমহাদেশে রাষ্ট্র ছিল দুইটি; এখন সেখানে হইয়াছে তিনটি। এই তিন রাষ্ট্রের সামগ্রিক গণকল্যাণের জন্যেই সারা উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তিন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও প্রতিরক্ষার নিরাপত্তা বিধানের নির্ভরযোগ্য বিধান না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে না। এটা করিতে গেলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে তিন রাষ্ট্রের নায়কদের মধ্যে আলোচনা ও মীমাংসা হইতেই হইবে। তিনটির মধ্যে মৈত্রী ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে।

শিমলাতেই এটা হওয়া উচিত ছিল। সে চেষ্টাও নিশ্চয়ই হইয়াছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে, বাংলাদেশ শিমলা বৈঠকে যোগ দেয় নাই। যোগ দেয় নাই এই জন্য যে, পাকিস্তান বাংলাদশকে মান্যতা দেয় নাই। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র

হিসাবে বাংলাদেশকে যতিদিন পাকিস্তান স্বীকৃতি না দিবে, ততদিন বাংলাদেশ-নেতৃত্ব পাকিস্তানের সাথে কোনও আলোচনায় বসিবেন না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ভাষায় তা বলিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণে অনেকেই বাংলাদেশ-নেতৃত্বের সমালোচনা করিয়াছেন। অনেকে বলিয়াছেন, বিনা স্বীকৃতিতে গণচীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপে বসিল, বাংলাদেশ পারিবে না কেন? কেউ কেউ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতির জন্য জিদ করিয়া বাংলাদেশ সরকার নিজেদের হীনমন্যতারই পরিচয় দিতেছেন।

এই ধরনের সমালোচকদের কেউই 'বাস্তবতা' বুঝিতে পারেন নাই। পাকিস্তান-বাংলাদেশের পরিস্থিতিটার সঙ্গে চীন-মার্কিন সম্পর্কের কোনও তুলনাই চলে না। প্রশ্নটা এখানে সার্বভৌম সমতার প্রশ্ন। চীনকে স্বীকৃতি না দিলেও মার্কিন সরকার চীন দেশকে মার্কিন রাষ্ট্রের অঙ্গ দাবি করিতেন না। আর বাংলাদেশ সরকার যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তার জন্য পাকিস্তানের স্বীকৃতি দাবি করেন নাই তার প্রমাণ এই যে, স্বীকৃতির আগেই তাঁরা ইরাক-মিসর ও আলজিরিয়ার সাথে শুধু আলাপই করেন নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও বলিয়াছেন। পাকিস্তান-বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্কটার কথা যাঁরা বুঝেন না, তাঁদের শিয়ান নির্বোধ না বলিয়া উপায় নাই।

এই স্বীকৃতি ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ত দূরের কথা, মানবিকতার ব্যাপারটাও আলোচনা ও মীমাংসা হইতে পারে না। তার প্রমাণ পিণ্ডি আলোচনা। ভারত ও পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ মাথাগুলি পিণ্ডিতে একত্রিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ সাত-সাতটা দিন সেখানে এইসব বড়বড় মাথা একত্রে ঠুকাঠুকি করিয়াছেন ফল কি হইয়াছে? 'পিণ্ডি বৈঠকের আগে যে ব্যাপারটা যতখানি পরিষ্কার ছিল পিণ্ডি চটকাইবার পরও সেটা ঠিক ততখানি পরিষ্কারই রহিয়াছে। একবিন্দু বেশি পরিষ্কার হয় নাই। পরিষ্কার করিবার মতো কোনও ময়লা আবর্জনা, মানে অস্পষ্টতা ওতে ছিলই না। অত দক্ষ হাতের মাজা ঘষার, কাজেই, কোনও দরকারই ছিল না।

'পিণ্ডি বৈঠক বসিয়াছিল এপ্রিলের 'যুক্তঘোষণা' সফল করিবার উদ্দেশ্যে। পাকিস্তানের বাংলাদেশ স্বীকৃতির প্রশ্ন বাদ দিয়া শুধু ব্যাপারটার 'মানবিকতার' দিক মীমাংসার কথাই যুক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছিল। আশা করা হইয়াছিল, 'স্বীকৃতির' রাজনৈতিক ব্যাপারটা যখন বাদ দেওয়া হইল, তখন মানবিকতার প্রশ্ন মীমাংসাটা নিশ্চয় সহজ হইয়া গেল। তদনুসারে বিশ্ব-জনমত গড়িবার চেষ্টাও হইয়াছে যথেষ্ট। যুক্ত ঘোষণার উদ্দেশ্যটা মহৎ। কাজেই বিশ্ব সমর্থন পাওয়াও গেল প্রচুর। কিন্তু কোনও কাজ হইল না। এ ধরনের কাজে বিশ্ব-জনমতে কাজ হয় না। ইসরাইলের আরব ভূমি কব্জা ও ফ্রান্সের এটম বিস্ফোরণই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া বিশ্ব-জনমত এখানে প্রায় অবান্তর। মূলতঃ এটা তিন রাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যাপার। অতএব 'পিণ্ডি বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে অন্য কারণে। সে কারণ প্রস্তাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

প্রথমতঃ এখানে রাজনৈতিক ও মানবিক ব্যাপার দুইটা আলাদা করিয়া দেখা যায় না। যুদ্ধবন্দী ও আদম-এওয়াজটা যদি কোনও দূরবর্তী দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার ব্যাপার হইত, তবে এটাকে রাজনৈতিক প্রশ্ন হইতে আলাদা করিয়া দেখা সম্ভব হইত। কিন্তু পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশের যুদ্ধবন্দী ও লোক বিনিময়ের ব্যাপারটা শুধু অমন আদান-প্রদানের ব্যাপার নয়। এটা এই উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠারও প্রশ্ন। এই কারণে এটায় ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও মীমাংসা হইতেই হইবে।

দ্বিতীয়তঃ 'যুক্ত ঘোষনা'র সীমিত বিষয়গুলিও বাংলাদেশের অবর্তমানে মীমাংসা সম্ভব ছিল না।

তৃতীয়তঃ ১৯৫ জন 'যুদ্ধাপরাধীর' বিচারের ব্যাপারটাও বাংলাদেশের অবর্তমানে মীমাংসা সম্ভব ছিল না।

দুই পক্ষের আলোচনাতেই তিন পক্ষের সকল বিষয় চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা দিয়া বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে যদি সাধারণ আম-মোক্তারনামা না দিয়া থাকেন তবে 'পিণ্ডি বৈঠকের কোন প্রয়োজনই ছিল না। উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির জন্য বাংলাদেশ পাকিস্তানের ঐ সব ব্যাপার ছাড়াও ভারত-পাকিস্তানের কতকগুলি নিজস্ব ব্যাপারও আছে। এগুলিও আলোচনা ও মীমাংসা অত্যাবশ্যক। 'পিণ্ডির সাত দিনের আঠার ঘন্টার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে যদি ওসব ব্যাপারেও কিছু সমঝোতা হইয়া থাকে তবে অবশ্য 'পিণ্ডি আলোচনাকে সময়ের অপচয় বলা চলিবে না। তবে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যেকার ব্যাপার আলোচনা ও মীমাংসার দিক হইতে 'পিণ্ডির সপ্তাহব্যাপী বৈঠক কিম্বা অবশেষে দিল্লীতে তার স্থান পরিবর্তন, কিছুই দরকার ছিল না।

১৯৫ জন 'যুদ্ধাপরাধীর' আলোচনা যে বাংলাদেশ সরকারের অবর্তমানে হইতে পারে না, এটা সুস্পষ্ট। তবু সে কথাটার আলোচনা করিতেছি একটু পরে। আগে যুদ্ধবন্দী ও লোক বিনিময়ের কথাটাই আলোচনা করিয়া লই।

৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ১৯৫ বাদে আর সব লোককে ভারত-বাংলাদেশ ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছে। পাকিস্তানেরও তাদেরে গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি বা অসুবিধা নাই।

পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালিদেরে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারেও কোন তর্ক নাই। অসুবিধাও নাই। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা লইয়া তর্ক আছে। কেউ বলিয়াছেন পাঁচ লক্ষ। চার লক্ষ বলিয়াছেন অনেকেই। বেলগ্রেড হইতে তিন লাখ বলা হইয়াছে। সংখ্যাগুলি আনুমানিক। এটা নির্ধারণ করিতে হইবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করিয়াই।

বাংলাদেশের বাসেন্দা উর্দুভাষী বা বিহারীদের লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। পাকিস্তান এঁদের সকলকে গ্রহণ করিতে রাজি না। বাংলাদেশ সরকার বলিয়াছেন, দুই লক্ষ ষাট হাজার 'বিহারী' পাকিস্তান যাইবার অপশন দিয়াছেন। পাকিস্তান এই সংখ্যা মানিতে রাজি হয় নাই। তাঁরা নিজেরা সন্তোষজনকভাবে সংখ্যা তসদিক করিতে চান।

পাকিস্তানের এ দাবী অসংগত নয়। পাকিস্তান পাঁচ লাখ লোককে 'বাঙ্গালি' বলিয়া বাংলাদেশে ঢুকাইয়া দিতে চাহিলেই বাংলাদেশ সরকারও বিনা তসদিকে তা মানিয়া লইবেন না। ওঁদের মধ্যে ৪০ হাজার সামরিক ও ৩০ হাজারের মতো অসামরিক সরকারী কর্মচারী আছেন। তাদের শনাখ্ত করিতে অসুবিধা নাই। কিন্তু বাকি তিন-চার লাখকে বাংলাদেশ সরকার বিনা শনাখ্তিতে গ্রহণ করিবেন না। অতএব, সিভিলিয়ান পপুলেশন আদান-প্রদানে দুই সরকারের অবস্থা দুই পক্ষেরই মোকাবিলা হওয়া দরকার।

অতএব, যাকে মানবিকতার প্রশ্ন বলিয়া বিনা রিকগনিশনে মীমাংসা করার চেষ্টা হইতেছে, এর একটাও বাংলাদেশ সরকারের অনুপস্থিতিতে মীমাংসা হইতে পারে না।

তার পরে আসুন ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের প্রশ্নে। পাকিস্তান বলিয়াছে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এঁদের বিচার তারা মানিতে পারেন না। কারণ তাতে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। তবু যদি বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেন তবে পাকিস্তান সরকারও আটক বাঙ্গালিদের বিচার করিয়া তার প্রতিশোধ নিবেন। এ তর্কের মীমাংসা করিতে গেলেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাক্ষাৎ আলোচনা অপরিহার্য। ভারত বা অন্যকোনও বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় এটা হইতে পারে না। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত এ সাক্ষাৎও ঘটিতে পারে না। কারণ সেটা সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে হইবে না।

অতএব, দেখা গেল বাংলাদেশ যে গোড়াতেই বলিয়াছিল বিনা রিকগনিশনে, সে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে পারে না, সকল দিক হইতেই সে কথা নির্ভুল ছিল। এটা কঠোর সত্য। উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির জন্য এ অঞ্চলে সত্তুর কোটি মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য, এ বাস্তব সত্যকে মানিয়া লইতে হইবে। যে কোন মূল্যে এ স্বীকৃতি হাসিল করিতে হইবে। কোনও ন্যায়-নীতি, কোনও আইন-কানুন সত্তুর কোটি মানুষের কল্যাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান হইতে পারে না।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবীটাই এই স্বীকৃতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা বর্তমানে ১৯৫-এ নামিয়া আসিয়াছে। কেউ কেউ বলেন, বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা এত কমাইয়া বাংলাদেশ কূটনৈতিক চালে ভুল করিয়াছে। দর কষাকষির সুবিধার জন্য বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা অনেক বেশি রাখা উচিত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মত সমর্থন করি না। নব্বই হাজার বন্দীর সবাইকে বিচারাধীন রাখিলেও আমাদের পাঁচ লাখের মোকাবিলা সেটা হইত নিতান্ত নগন্য।

বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা যাই হউক, পাঁচ লাখ আটক বাঙ্গালিকে আমরা তাদের জামিনে পর্যবসিত করিয়াছি। আমরা বলিতেছি, এরা নিরপরাধ। নিরপরাধ এরা নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা আমাদের বিচারে। বড়জোর বিশ্বের আরও অনেকের বিচারে। পাকিস্তানের বিচারে তাঁরা অপরাধী হইতেও পারেন। দালাল আইনের বিচার করিয়া আমরাই পাকিস্তানকে সে পথ দেখাইয়াছি। আমাদের বিচারে যেটা পাপ, পাকিস্তানের

বিচারে সেটাই পুণ্য। আমাদের বিচারে যেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তানের বিচারে সেটাই রাষ্ট্রানুগত্য। আমাদের বিচারে যেটা বাংলাদেশের আনুগত্য, পাকিস্তানের বিচারে সেটাই পাকিস্তানদ্রোহিতা। ১৯৭১ সালের আগে আমরা সবাই পাকিস্তানের নাগরিক ছিলাম: পাকিস্তানের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত আটক বাঙ্গালিরা পাকিস্তানের নাগরিকই আছেন। তাঁদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচারের জন্য পাকিস্তানকে দালাল আইনের রচনা করিতে হইবে না। বর্তমান ফৌজদারি আইনই যথেষ্ট।

আমি একাধিকবার বলিয়াছি, যুদ্ধাপরাধীর বিচারটা আমাদের কর্তব্য ন্যায়-নীতি ও মৃত ব্যক্তিদের প্রতি। আর আটক বাঙ্গালি উদ্ধারটা আমাদের রাষ্ট্রীয় ও মানবিক কর্তব্য। পাঁচ লাখ জেন্দা মানুষ ও তাদের বহু লাখ পরিবার-পরিজনের প্রতি। এর কোন্‌টা বড় কর্তব্য? কোন্‌টা আসল মানবতা?

পাকিস্তানের হুমকিকে আমরা ব্ল্যাকমেইল বলিতেছি। ক্ষমতা থাকিলেই লোকে ব্ল্যাকমেইল করে। ব্ল্যাকমেইলও একটা বাস্তবতা। আমরা নিউরেমবার্গ-টোকিও বিচারের কথা বলি। কিন্তু ভুলিয়া যাই, তখন মিত্র শক্তির কোন প্রতিপক্ষ ছিল না। সে প্রতিপক্ষের হাতে মিত্র পক্ষের কোন লোকও আটক ছিল না। থাকিলে এমনি ব্ল্যাকমেইল হইত। নিউরেমবার্গ-টোকিও হইতে পারিত না। আর মাইলাই? মাইলাই হত্যার বিচার ভিয়েতনামে হয় নাই–হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রে।

প্রতিপক্ষের বন্দীর বিচার করা সোজা। কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছে আটক নিজের লোক উদ্ধার করা কঠিন। বিশ্ব-জনমতের আশায় থাকিলে আটকদের অনেকেরই হায়াতে কুলাইবে না। তাই আটক বাঙ্গালিদের আত্মীয়-স্বজনরা দাবী করিতেছেন, 'বিচারের আগে আটকদের ফেরত চাই।' এটা বিকল্প হিসাবে মন্দ নয়। সেজন্য অনেক হিতৈষী রাষ্ট্র উপদেশ দিতেছেন বিচার আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া স্বীকৃতিসহ আর সব কাজ হইয়া যাক। যাই করা হউক বাংলাদেশ পাকিস্তানের একমত হইয়াই করিতে হইবে। এটাই কঠোর বাস্তবতা। শুধু পাকিস্তারকে বাস্তবতা মানিতে বলিলে চলিবে না। সবাইকে বাস্তবতা মানিতে হইবে।

৩রা আগষ্ট, ১৯৭৩

উপমহাদেশের বাস্তবতা আমরা সত্যই বুঝিয়াছি কি?

গত সপ্তাহে আমি 'শান্তি' ও 'বাস্তবতার' কথা বলিয়াছিলাম। কহিয়াছিলাম, সবাইকে 'বাস্তবতা' মানিতে হইবে। কথাটা আসলে আবশ্যক। 'বাস্তবতা' কারও মানিতে হয় না। 'বাস্তবতা' নিজেই তাকে মানায়। সবাইকে বাধ্য করে তাকে মানিতে। এই জন্যই তার নাম বাস্তবতা। এটা না মানিয়া পারা যায় না। মানাটা বিলম্বিত করা যায় মাত্র। যে কিছুতেই 'বাস্তবতা' মানে না, সে মরে। বাস্তবতা মানায় বিলম্ব করিলে তাতে বাস্তবতার কোনও লোকসান হয় না। যে বিলম্ব করে লোকসানটা হয় তারই।

যুদ্ধ জয়-পরাজয়ের বেলা এটা আরও সত্য। এ ব্যাপার সবচেয়ে বড় বাস্তবতা এই যে, আমরা শান্তি চাই। তার চেয়েও বড় বাস্তবতা এই যে, আমরা বাঁচিতে চাই। বাঁচিবার জন্যই শান্তি চাই। যুদ্ধ যে আমরা করি তাও শান্তির জন্যই। যুদ্ধের জন্য শান্তি চাই না। যুদ্ধের পরেই শান্তি। শান্তি উভয় পক্ষেরই কাম্য বটে, কিন্তু বিজয়ী পক্ষ তার জয়কে কনসলিডেট বা পোখ্‌তা করিতে চায়। সে জন্য শান্তির দরকার। যুদ্ধে জিতিয়াও যে পক্ষ অশান্তি বা যুদ্ধ জিয়াইয়া রাখিতে চায়, তাকে কেউ বুদ্ধিমান বলে না। বরঞ্চ মানবচরিত্রের ধারা এই যে, বিজিত পক্ষই কোনও প্রকারে অশান্তি জিয়াইয়া রাখিতে চায়। আশা এই যে, সে অশান্তির সুযোগে যুদ্ধের ফলটা উল্টান যায় কি না।

এই সত্যটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাউক। ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করিয়াছি। ১৯৭২ সাল হইতেই শান্তি চাহিতেছি। আমরা যুদ্ধে জিতিয়াছি বলিয়াই শান্তিটা আমাদের বেশি কাম্য। পাকিস্তান যুদ্ধে হারিয়াছে। তাই টাল-বাহানা করিয়া অশান্তি জিয়াইয়া রাখাই তার স্বার্থ। সে চেষ্টা পাকিস্তান করিতে পারিত, কিন্তু পারে নাই। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করিয়াছে। ভারতের বিপুল ও শ্রেষ্ঠতর সামরিক শক্তির সাহায্যেই আমরা চৌদ্দ বছরের স্বাধীনতা যুদ্ধ চৌদ্দদিনে শেষ করিতে পারিয়াছি। আমরা স্বাধীন হইয়াছি। রাজনৈতিক দিক হইতে জয় হইয়াছে আমাদের, কিন্তু সামরিক দিক হইতে জয় হইয়াছে ভারতের। আমাদের তুলনায় ভারত শুধু সামরিক শক্তিতেই বড় নয়, রাজনৈতিক বিচক্ষণতায়ও শ্রেষ্ঠ। তাই যুদ্ধে জিতিবার পর একদিনও দেরি না করিয়া ভারত একতরফাভাবেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়াছে। আপোস ও বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়াছে পরাজিত পাকিস্তানের দিকে। শিমলা চুক্তি করিয়াছে। যুদ্ধকালীন দখলী ভূমি ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধবন্দী ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের জয়কে উদারতার পোশাক পরাইয়াছে। মানে, ভারত তার জয়কে পোখ্‌তা করিয়াছে। এসব করিয়াছে ভারত এত দ্রুতগতিতে যে, পাকিস্তান একেবারে স্তম্ভিত আহ্‌মক বনিয়া

গিয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানী-করা অস্ত্রের ঝন-ঝনানিতে যুদ্ধের ফলটা পরিবর্তনের চেষ্টা করিবার ফুরসতই পায় নাই পাকিস্তান।

আমরা কিন্তু ভারতের এই সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও কূটনৈতিক দক্ষতার কোনও সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, তা আমাদের শাসকরা যেমন জানেন, আমি তেমন জানি না। যুদ্ধজয় এত বড় সাহায্য করিয়াও শান্তি স্থাপনে ভারত তার অসাধারণ বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা দিয়া আমাদের সহায়তা করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই? তারা অনিচ্ছুক এ কথাও বলা যায় না। তবু শান্তি আসে নাই কেন? কেন পাকিস্তান ভারতের জয় মানিয়া লইয়া শিমলা চুক্তি করে, অথচ আমাদের জয় স্বীকার করে না? কেন দুই বিজয়ী পক্ষের মধ্যে পাকিস্তান একজনের জয় স্বীকার করে, অপর জনের জয় স্বীকার করে না? আমাদের জয়টা কি এতই অস্পষ্ট? পাকিস্তানীরা কি জানেন না, '৪৭ সালে আমরা বাঙালিরাই ভোট দিয়া পাকিস্তান বানাইয়াছিলাম। পশ্চিমারা কি বুঝেন না, পঁচিশ বছরেও সে পাকিস্তানে আমাদের অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় আজ আমরা নিজেরাই আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করিয়াছি? তাঁরা কি বুঝেন না, জন-যুদ্ধের মাধ্যমেই এটা ঘটিয়াছে বলিয়াই এটার পরিবর্তন হইতে পারে না, কিন্তু মৈত্রী হইতে পারে। উভয়ের স্বার্থেই সেটা দরকারও। তবু কেন পাকিস্তান আমাদের মানিতেছে না, আমাদের সাথে কথা বলিতেছে না; আমাদের কথাও ভারতকেই বলিতেছে। এ দোষ কার? ভারতের? পাকিস্তানের? না আমাদের নিজের? এটাও সুস্পষ্ট যে, আমরাই পাকিস্তানের সাথে কথা বলিতেছি না। এটাও সত্য যে, পাকিস্তান আমাদের মান্যতা দিতেছে না বলিয়াই আমরা তাদের সাথে কথা বলিতেছি না? কিন্তু কেন পাকিস্তান আমাদের মান্যতা দিতেছে না, সেটা কি আমরা বুঝিয়াছি? এ প্রসঙ্গে স্মরণ করুন, ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ বলিয়াছিলেন, আমি যদি মিঃ ভুট্টোর জায়গায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হইতাম, তবে '৭১ সালের ডিসেম্বরে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের দিনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতাম। আজ কথাটা অবাস্তব মনে হইতে পারে। কিন্তু সেদিন তেমন কঠিন বা অবাস্তব ছিল না। বিলম্বেই এটা কঠিন মনে হইতেছে যতই দিন যাইতেছে, ব্যাপারটা ততই জটিল হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করুন, '৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের জেলখানা হইতে সদ্যমুক্ত আমাদের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোহ্‌রাওয়ার্দী ময়দানের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন: 'ভুট্টো সাহেব আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলিয়া দুই দেশ মিলিয়া আবার এক পাকিস্তান হইবে, সে আশা ভুট্টো সাহেব ত্যাগ করুন। তাঁরা সুখে থাকুন, আমাদেরও তাঁরা সুখে থাকিতে দিন। তাঁদের সৈন্যবাহিনী আমাদের উপর যে বর্বরতা চালাইয়াছেন, দুনিয়াতে তার নজির নাই। তবু বাঙালি বড় উদার জাতি। তাদের কাছে আন্তরিক মাফ চান, 'তারা আপনাদের ক্ষমা করিতেও পারেন।' বিজয়ী বীর সেনাপতির উপযুক্ত উদার কথা। দূরদর্শী বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতার বাস্তববাদী ঘোষণা। দুনিয়ার সব স্বাধীনতা সংগ্রামেই

এটা ঘটিয়াছে। ঔপনিবেশিক শাসকরা দীর্ঘদিন ধরিয়া জনগণকে শাসনশোষণ করিয়াছে, স্বায়ত্ব শাসনের দাবীকে পশু-শক্তিবলে দমাইয়াছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। অবশেষে গণশক্তির হাতে পরাজিত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। ভারত, চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ইত্যাদি এশিয়া, আফ্রিকার ও ল্যাটিন আমেরিকার কথা ত আছেই। খোদ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাও কি এমনি সংগ্রামের এবং তার আনুষংগিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস নয়? স্বাধীনতা হাসিলই ত এ সব সংগ্রামের চরম ও পরম বিজয়। আবার বিচার কি? সশস্ত্র সংগ্রামে জীবন দিতেই হয়। তাই ত আমাদের নেতা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন : 'রক্ত যখন দিয়াছি,রক্ত আরও দিব।' ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের নেতা মহাত্মাজী তাই অহিংস সংগ্রাম শিখাইয়াছিলেন। তাঁরই শিক্ষায় সশস্ত্র পাঠানরা হাতের বন্দুক মাটিতে ফেলিয়া ইংরাজের বন্দুকের সমানে খালি বুক পাতিয়া দিয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদীর গুলিতে শহীদ হইয়াছে। স্বাধীনতা হাসিলের পরে সে নিষ্ঠুর হত্যার, জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যার, জেলখানার বন্দী হত্যার বিচারের কথা কেউ ভাবে নাই। স্বাধীনতা চাহিলে জান দিতে হয়। স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, জান দিয়াছি। স্বাধীনতা পাওয়াটাই আমাদের পুরস্কার। উপনিবেশটা হারানোই ওদের শাস্তি।

এর পরেও আছে যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি। উভয় পক্ষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তি। চিরকাল এটা হইয়া আসিয়াছে। একদিনের যালেম-মায্লুমের মধ্যে পরের দিন বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা হইতেছে। আজ যাদের সম্পর্ক শাসক-শাসিতের, আগামীকালে তাদের মধ্যেই সমানে সমানে বন্ধুত্বের ও ব্যবসা-বাণিজ্য ও সহযোগিতার সম্বন্ধ। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। দুনিয়ার সর্বত্র সকল যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠা এর নজিরে পূর্ণ।

নিষ্ঠুর বর্বরতা? ন্যায়-বিচারের নজির স্থাপন? হিরোসিমা নাগাসাকির চেয়ে মানবতাবিরোধী বর্বর গণহত্যার নজির আছে দুনিয়ায়? তার বিচার হইয়াছে? বিনা-বিচারেই কি জাপান-মার্কিনে মৈত্রী-বাণিজ্য চলিতেছে না? ইহুদীরা জার্মানদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে নাই? ন্যায়, বিচারের নজির স্থাপনের অজুহাতটার অর্থ কি? নিউরেমবার্গ-টোকিও বিচারের পরেও কি বাংলাদেশ, মাইলাই ও মোজাম্বিকের গণহত্যার বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয় নাই? স্মরণাতীত কাল হইতে হত্যার দায়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইতেছে না? তাতে খুনাখুনি কমিয়াছে?

তাছাড়া, আমাদের ব্যাপারটা শুধু ন্যায়বিচার বা প্রতিশোধের ব্যাপার নয়। প্রেষ্টিজের কথাও নয়। তার চেয়েও কঠোর বাস্তবতার ব্যাপার। আমরা প্রতিবেশী। আমরা পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি বাড়িতে বাস করিতে চাই। বাস করিতে বাধ্যও। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের বাঁটোয়ারায় হিন্দু-মুসলিম এত নিষ্ঠুর বর্বর খুনাখুনি করিয়াও কেউ বিচারের কথা ভাবি নাই। ভাবি নাই এই জন্য যে, ওটা বাস্তবতা নয়। আসল

বাস্তবতা সার্বিক শান্তি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কমনওয়েলথ ভাষণেও শান্তি স্থাপনে বাংলাদেশের সার্বিক সংকল্পের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন : '১৯৭১ সালের ক্ষত নিশ্চিহ্নরূপে নিরাময় করিতে হইবে।'

পক্ষান্তরে, ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সিমলা চুক্তির সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সাহেব ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বলিয়াছিলেন; তিনি শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছেন। ভুট্টো সাহেবের বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতিতে, তাঁর নিজের দল পিপলস পার্টির ও অপজিশনের বিভিন্ন পার্টির প্রস্তাবে, বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রেডিও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রোগ্রামে দিনের পর দিন বাংলাদেশ-স্বীকৃতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উপমহাদেশের বাস্তবতা সম্বন্ধে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত তিন রাষ্ট্রই সমান সচেতন ও আগ্রহী। অন্ততঃ ১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত অবস্থা তাই ছিল। সিমলা চুক্তির মুদ্দতটাই ছিল সার্বিক শান্তি স্থাপনের মাহেন্দ্রযোগ। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের হাতে ছিল তখন কূটনৈতিক 'হাতের পাঁচ'। ইংরাজিতে এটাকেই বলা হয় 'লিভারেজ'। ভারতের দখলে ছিল তখন প্রায় ১০ হাজার বর্গমাইলের মত পাকিস্তানের ভূমি। আজ সে 'হাতের পাঁচ' হাতছাড়া হইয়াছে। দর কষাকষির শক্তি কমিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভারত এটা করিয়াছিল পারস্পরিক আস্থার আবহাওয়া ফিরাইয়া আনিয়া শান্তি স্থাপনটা ত্বরান্বিত করার সাধু উদ্দেশ্যেই। তার আগে পাকিস্তানও আমাদের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়া একটা বড় 'হাতের পাঁচ' ছাড়িয়া দিয়াছিল। পাকিস্তানও এটা করিয়াছিল শান্তি ত্বরান্বিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যেই। এতে এটাই প্রমাণিত হইল যে, ১৯৭২ সালের প্রথমার্ধে কোন পক্ষই দরকষাকষির 'হাতের পাঁচে'র কথা চিন্তা করে নাই।

দরকষাকষির মনোবৃত্তি জাগিয়াছে পরে। বিলম্বে জটিলতা বাড়ে, এটা সত্য-সনাতন কথা। সংস্কৃতে তাই প্রবাদ আছে 'শুভস্য শীঘ্রম'। 'কালহরণে'র যে বিপদ আছে এটাও ঐ সারবান উক্তিরই অংশ। আমাদের বেলাও কালহরণে অনিষ্ট হইয়াছে। জটিলতা বাড়িয়াছে। শয়তান মস্তিষ্কে বাসা বাঁধিয়াছে। আমাদের বিবাদে যাদের স্বার্থ আছে, আশে-পাশের সেই মোড়লরা কাঠি ঘুরাইবার সময় পাইয়াছে। পরাজিত পক্ষের, মানে এখানে পাকিস্তানের মনে অবস্থার পরিবর্তনের আশা জাগিয়াছে। ১৯৭২ সালের গোড়ায় যে ভুট্টো সাহেব অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চাহিলেন, ১৯৭৩ সালের গোড়ায় তিনিই বলিলেন : 'বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ফলটা দেখিয়া লই।' আশাটা সুস্পষ্ট।

এটা ঘটিতে পারিল কেমন করিয়া? ঐ 'শুভস্য শীঘ্রম' না করিয়া 'কালহরণের' দরুনই ইতিমধ্যে আমরাও 'যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কথা' বলিতে লাগিলাম। পাকিস্তানও 'মুসলিম বাংলা'র কথা বলিতে লাগিল। যথানিয়মে কথায় কথা বাড়িল। অর্থাৎ উভয়

পক্ষই 'অবাস্তবতার' হাওয়ায় উড়িতে লাগিলাম। এটা আরম্ভ করিল কোন্ পক্ষ, তা লইয়া তর্ক হইতে পারে। আমরাই বিচারের কথা আগে বলিলাম? না, পাকিস্তানই 'মুসলিম বাংলা'র কথা ও 'নির্বাচন দেখিয়া লইবার কথা' আগে বলিল? ক্রনলজি বা ঘটনা পরম্পরার কথা আমার যতদূর মনে পড়ে, তাতে আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করিতে বিলম্ব ঘটানোতেই এই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষেও বলিবার কথা আছে। সেটা বাংলাদেশর স্বাধীনতার 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে ভারত ও বাংলাদেশের কোনও কোনও নেতার অবাস্তব অপব্যাখ্যা। পাঠকগণের স্মরণ আছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর-পরই ভারত ও বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর এক মহলে ও সংবাদ-পত্রে উলুধ্বনি উঠিয়াছিল, 'ধর্ম-ভিত্তিক ভারত-বাঁটোয়ারা বাতিল হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান-দাবি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।' আমরা কেউ কেউ 'ইত্তেফাকে' প্রবন্ধ লিখিয়া এবং পুস্তক প্রকাশ করিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলাম। এমন কথার রাজনৈতিক আত্মঘাতী তাৎপর্য, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে সন্দেহ অবিশ্বাস সৃষ্টির ও উপমহাদেশের সার্বিক স্থায়ী শান্তি স্থাপনের বিঘ্নের আশংকা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। আমাদের এই হুঁশিয়ারিকে কেউ-কেউ প্রগতিবিরোধী মুসলিম লীগ মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়াছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আমরা যারা লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক ভারত বাঁটোয়ারার বাস্তব রূপায়ণ বলিয়াছিলাম কেউ কেউ তাদেরেও তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ঐ সব রাজনৈতিক নাবালকদের কথায় বিচলিত হই নাই। প্রথম বিচলিত হই ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব ও বাংলাদেশের আওয়ামী নেতৃত্বের একাংশের বাস্তবতা-বোধের অভাব দেখিয়া। সিমলা চুক্তির পরে বাস্তববাদী রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অসম একটা ঐতিহাসিক দলিল অনুমোদন করিতে গিয়া নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি নিতান্ত অবান্তর, অপ্রাসংগিকভাবে অনুমোদন প্রস্তাবে বলিলেন ঃ '১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বাঁটোয়ারাটাই অবৈধ হইয়াছিল।' আর এদিকে বাংলাদেশ সরকার রাস্তাঘাট, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইত্যাদি হইতে ঐ বাঁটোয়ারার জন্য দায়ী জিন্না সাহেবের নাম মুছিয়া ফেলিলেন। এমনকি 'জিন্নাটুপির' বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে অভিযান চলিল। প্রমাণিত হইল, বাংলাদেশ সরকার নীতিতঃই ভারত-বাঁটোয়ারার বিরোধী। সেই জন্যই জিন্নার নাম ও স্মৃতি তাঁরা বাংলাদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চান। '৪৭ সালের বাঁটোয়ারা বাতিল হইলে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক কি হইবে, অখণ্ড, মানে পুনর্যুক্ত, ভারতের রাষ্ট্রীয় রূপই বা কি হইবে, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক কি দাঁড়াইবে, ইত্যাদি মীমাংসিত প্রশ্নের পুনরুন্মুক্তির মতো সুদূরপ্রসারি প্রশ্নের কথা বাদ দিয়াও শুধু পাকিস্তান সরকারের কথাটাই ধরা যাক। পাকিস্তানীদের মনে এইসব উক্তি ও কাজের কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তারই বিচার আজ করা যাক। বাংলাদেশ-ভারত হইতে যেখানে সমস্বরে ধ্বনি উঠিয়াছে: 'বালাদেশের

স্বাধীনতার মানেই '৪৭ সালের ভারত-বাঁটোয়ারা বাতিল, 'পাকিস্তান দাবি ভ্রান্ত' সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানিয়া লওয়া মানেই পাকিস্তানের অবলুপ্তি মানিয়া লওয়া। পাকিস্তান সরকার সেটা মানিতে পারেন, কোনও কাণ্ডজ্ঞানী লোক তা–ভাবিতে পারেন? কথাটা শুধু ভুল নয়, সিমলা চুক্তির ভাষা ও ভাবেরও বিরোধী। অতএব, বাংলাদেশ ও ভারতে দাঁড়াইয়া যাঁরা হুংকার দিয়াছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানেই ভারত-বাঁটোয়ারার অবসান, তাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকার না করিবার জন্যই পাকিস্তানকে উস্কানি দিয়াছিলেন, এমন মনে করা কি অসংগত হইবে? এর ফল যা হইবার তাই হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার তাঁদের সুর বদলাইয়াছেন। বাংলাদেশে 'মুসলিম বাংলা'র শ্লোগানে উৎসাহ দিয়াছেন। যে আসগর খাঁ বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি না দেওয়ায় ভুট্টো সরকারের তীব্র নিন্দা করিতেছিলেন, তিনিও এখন স্বীকৃতির বিরোধী হইয়াছেন। যে দওলাতানা স্বীকৃতির দাবি করিতেছিলেন, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ তাঁকে সভাপতিত্ব হইতে বরতরক করিয়াছেন। স্বীকৃতির বিলম্বে আমরাও যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কথা বলিয়াছি। পাকিস্তান স্বীকৃতিতে যত বেশি টালবাহানা করিতেছে, আমরা 'যুদ্ধাপরাধী বিচারে' তত জোর দিতেছি। পাকিস্তানও 'বাঙালি বিচারে' তত পাল্টা হুমকি দিতেছে। 'বিচার' ও পাল্টা ব্ল্যাকমেইলটার উদ্ভব হইয়াছে এই ভাবেই। আগের প্রবন্ধে এ সম্পর্কে কিছু বলিয়াছি আজও কিছু কওয়া দরকার মনে করিতেছি।

যুদ্ধাপরাধী বিচারের ইতিহাসটা সংক্ষেপে এই: ১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনে যুদ্ধে অরক্ষিত জনগণকে হত্যার বিচারের বিধান হয়। তদনুসারে প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে যুদ্ধাপরাধী বিচারের শর্ত ছিল। সেই শর্তানুসারে ফরাসী সরকার ৮৯৬ জন জার্মান সামরিক অফিসার ও স্বয়ং সম্রাট কাইযারের বিচার করিতে চান। পরাজিত জার্মান সম্রাট কাইযার হল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়াছিলেন। ডাচ সরকার কাইযারকে ফরাসী সরকারের হাতে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। কাজেই কাইযারের বিচার হয় নাই। পক্ষান্তরে, জার্মান রাইখের সুপ্রীমকোর্ট কতিপয় আসামীর বিচারের হুমকি দেওয়ায় ফরাসী সরকারও জার্মান অফিসারদের বিচারের সংকল্প ত্যাগ করেন। দেখা গেল, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও ব্লাকমেইলের কার্যকারিতা ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে অবশ্য বিচারের কোনও শর্ত ছিল না। কিন্তু তাতে কোনও দোষ হয় নাই। কারণ, মিত্রশক্তির ১৯৪৩ সালের মস্কো-বৈঠকেই ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, এবারকার যুদ্ধের পর নাযী বাহিনীর সমর নেতাদেরে যুদ্ধাপরাধে ও গণহত্যার অভিযোগে বিচার করা হইবে। কাজেই জার্মান সমরনেতারা আত্মসমর্পণের সময় অবগত ছিলেন যে, তাঁদের বিচার হইবে। এই কারণেই নিউরেম্বার্গ ট্রাইব্যুনালে বিনা নোটিসে তাদের বিচার করা হইতেছে, এমন প্লী আসামীরা নিতে পারেন নাই।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে আমাদের পক্ষের এমন কোনও ঘোষণা ছিল না। আত্মসমর্পণের দলিলেও বিচারের কোনও শর্ত নাই। বরঞ্চ জেনারেল সামমানিক শাহ পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণের যে আহবান করিয়াছিলেন, তাতে জেনেভা কনভেনশনের সকল সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ছিল।

তবু এটা আইনের কথা। আইনের কথার চেয়ে স্থায়ী শান্তির প্রশ্নটাই আমাদের বড় কথা। স্থায়ী শান্তির জন্য আমাদের অতীত 'ফরগিভ' ও 'ফরগেট' করিতে হইবে। তার উপর আছে আমাদের পাঁচ লাখ আটক বাঙালি উদ্ধারের কথা। এদের বিচারের হুমকিকে ব্ল্যাকমেইল ধরিয়া নিলেও সেটা মানিতেই হইবে। তাতে আমাদের প্রেষ্টিজ বা ন্যায়নীতির অমর্যাদা হইবে না। বিমান হাইজ্যাকাররা রোজ এমন ব্ল্যাকমেইল করিয়া কত দণ্ডিত কয়েদী উদ্ধার করিতেছে। সে সব ব্ল্যাকমেইল মানিয়া লওয়ায় কোনও সরকারের অমর্যাদা হইতেছে, কেউ মনে করেন না। আটক বাঙালি ত পাঁচ লাখ। আমাদের জনপ্রিয় নেতা ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি না দিয়া প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যদি তাঁর প্রাণ লইয়া আমাদের ব্ল্যাকমেইল করিতেন তবে আমরা ১৯৫ ত দূরের কথা, গোটা ৯৩ হাজার পাক সৈন্যকেই তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ ফেরত দিয়া বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষা করিতাম। তেমন ব্ল্যাকমেইল না করায় ভুট্টো সাহেব আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। বঙ্গবন্ধু নিজে ভুট্টো সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আমরাও দিতেছি। কারণ ব্ল্যাকমেইলটা আজ আর শুধু হাইজ্যাকারের হাতিয়ার নয়, ভদ্রলোক ও সভ্য জাতিরও হাতিয়ার। সমর সজ্জাই একটা ব্ল্যাকমেইল। এটম বোমা আরও বড় ব্ল্যাকমেইল।

আসল কথা, ন্যায়বিচারও নয়, ব্ল্যাকমেইলও নয়। এ সবই উঠিয়াছে, নেতারা আমাদের উপমহাদেশটার বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়া। শান্তি সবাই চাহিতেছেন। কিন্তু আমাদের এ কাণ্ডটা যে শুধু যুদ্ধ-উদ্ভূত সাময়িক সমস্যা নয়। এটা যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রশ্ন, সে কথা আমরা বুঝিতেছি না। এ স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে গেলে যে শুধু অমীমাংসিত প্রশ্নগুলিরই মীমাংসা করিতে হইবে, মীমাংসিত প্রশ্নগুলির পুনরুন্মুক্তি ঘটানো চলিবে না, এ কথাটা আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং অন্তরের সঙ্গে মানিতে হইবে শুধু তিন রাষ্ট্রের আপোস-মীমাংসার কথা মুখে বলিলেই চলিবে না। তিনটি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা, জাতীয় স্বকীয়তার বৈধতা ও সে সবের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার যৌক্তিকতা বুঝিতে হইবে। সে সম্পর্কে পরস্পরের শ্রদ্ধার নিশ্চয়তাও থাকিতে হইবে। এরই নাম সার্বভৌম সমতা।

১০ই আগস্ট, ১৯৭৩

শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা আমরা কবে দিব?

শিক্ষকদের ধর্মঘটটা আমি বরাবর না-পছন্দ করিয়া আসিয়াছি। চার মাস আগে মাধ্যমিক শিক্ষকেরা যখন ধর্মঘট ঘোষণা করেন বরাবরের অভ্যাসমতই আমি তখন ওটাও না-পছন্দ করি। তারপর মাসাধিককাল আগে যখন কলেজ শিক্ষকেরা ধর্মঘট শুরু করিলেন, আমি তখন রীতিমত উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম। ধরিয়া নিলাম, সকল 'বাদ'-বাদী ছাত্র-শ্রমিকদের অর্থহীন অথচ আত্মঘাতী ধর্মঘটী বাতিকের মতোই শিক্ষকদের ধর্মঘটটাও একটা হুজুগ মাত্র।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমার চিন্তার মোড় ফিরিয়া গেল। আমার নতুন জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইল। বুঝিলাম, ব্যাপারটা নিতান্ত হুজুগ নয়। ছাত্র-শ্রমিকদের ধর্মঘটের মতোই এটা আত্মঘাতী বটে, কিন্তু একেবারে অর্থহীন নয়। রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনের দরুনই এটা ঘটিয়াছে, এটাও বুঝিলাম। পরাধীনতার যুগের, এবং তারও পরে স্বৈরাচারী আমলের ধর্মঘটের আর বর্তমান স্বাধীনতার আমলের ধর্মঘটের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য আছে। এমন পার্থক্য সম্বন্ধে অবশ্য শাসক গোষ্ঠীও আমার সাথে একমত। কিন্তু সে ঐক্যমতের মধ্যেও গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। শাসকগোষ্ঠী বলিবেন, দেশ যখন স্বাধীন, সরকার যেখানে সমাজবাদী, তখনও সেখানে ধর্মঘট একেবারে অনাবশ্যক, অবান্তর ও আত্মঘাতী, আমার মত তা নয়। বরঞ্চ ঠিক উল্টা। আমি মনে করি, স্বাধীন দেশে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়াই আজ ধর্মঘটও সকল দিক হইতে অর্থবহ হইয়াছে। এই কারণে শিক্ষকদের ধর্ম-ঘটটাকে আগের মতো না-পছন্দ করা যায় না। পরাধীনতা ও স্বৈরাচারী আমলে ছাত্র-শ্রমিকদের ধর্মঘটটাকে আমরা রাজনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ মনে করিতাম। শিক্ষকদের ধর্মঘটটাকে তা মনে করা সম্ভব ছিল না। ছাত্র-শ্রমিকদের ধর্মঘটও শিক্ষক ধর্মঘটের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য তখনও ছিল, এখনও আছে। শিক্ষকদের ধর্মঘটে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হয় সেটা অপূরণীয়। কারণ সেটা আত্মিক। শ্রমিকদের ধর্মঘটে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হয় সেটা তেমন অপূরণীয় নয়। কারণ সেটা আর্থিক। পরাধীনতার যুগ শিক্ষকদের ধর্মঘটে তাঁদের কোনও লাভ হওয়ার আশা ও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু লোকসানটা হইত পুরাপুরি ও একতরফাভাবে দেশ ও জাতির। দেশ ও জাতির লোকসানটা তৎকালে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত করিত না। তাই শিক্ষক-ধর্মঘটকে শাসকরা উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিতে পারিতেন এবং করিতেন।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আজ সে পরিবেশের পরিবর্তন হইয়াছে। আজ স্বাধীন দেশের নির্বাচিত সরকার দেশ ও জাতির এবং জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংগ। কাজেই দেশ

ও জাতির লোকসানটা সরকারের গায়ে লাগে। অন্ততঃ লাগিবার কথা। সেই ভরসাতেই শিক্ষকরা ধর্মঘট করিয়াছেন। সরকারের গায়েও সে আঘাত লাগিয়াছে,
তারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বিদেশী স্বৈরাচারী সরকারের মতো বর্তমান সরকার শিক্ষক ধর্মঘটে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। তাঁরা শিক্ষক-প্রতিনিধিদের সাথে দেন-দরবার চালাইতেছেন। সরকার এমন কথাও বলিয়াছেন যে, শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের কোন মৌল আপত্তি নাই? নীতিত: সে দাবি সরকার মানিয়াই লইয়াছেন। শিক্ষকদের জন্য এটা প্রশংসার কথা। কারণ সরকারের স্বীকৃতিতে এটা প্রশংসার কথা। কারণ সরকারের স্বীকৃতিতে এটা প্রমাণিত হইল যে, আমাদের শিক্ষকরা- দায়িত্বজ্ঞানী। তাঁরা অসংগত দাবি করেন নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় সরকারও এ কাজের জন্য প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু আমাদের সরকারের ক্ষেত্রে এটা প্রশংসার বিষয় ত নয়ই, বরঞ্চ কঠোর নিন্দা ও তীব্র সমালোচনার যোগ্য। প্রথমতঃ শিক্ষকদের দাবি ও সরকারী নীতির মধ্যে যদি কোনও পার্থক্য ও বিরোধ না-ই থাকিবে, তবে তার জন্য শিক্ষকদের দাবি করিতে এবং সে দাবির সমর্থনে ধর্মঘট করিতে হইল কেন? দ্বিতীয়তঃ, কর্মব্যস্ত সরকারকে এ বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ধর্মঘটের দরকার ছিল, এ কথা মানিয়া লইলেও এই তিন-চার মাস ধরিয়া ধর্মঘট চালাইতেছিল কেন? শিক্ষা-বিষয়ে শিক্ষাদফতরকে সচেতন করিবার জন্য শিক্ষকদের এত দীর্ঘ দিন হাতুড়ি পিটাইতে হইল কেন? শিক্ষাদফতরের লোকদের কানের পর্দা ও গায়ের চামড়া কি এতই মোটা, তাঁদের কর্তব্যচেতনা কি এতই নিষ্পন্দ যে, দেশে শিক্ষক-ধর্মঘটের তিন-চার মাসব্যাপী বিপর্যয়ের আগে তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন না? শিক্ষক-ধর্মঘটের দরুন শিক্ষাংগনে বিপর্যয় সৃষ্টির ফলে জাতির কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, শিক্ষা-মন্ত্রীর সাম্প্রতিক প্রেস-কনফারেন্সে তার মাত্র আংশিক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেই সম্মিলনীতে তিনি আসন্ন ম্যাট্রিক পরীক্ষার তারিখ ১৬ই জুলাই হইতে পহেলা সেপ্টেম্বর পিছাইয়া দিয়াছেন। স্বভাবতঃই সে বক্তৃতায় তিনি মাত্র দুই লক্ষ পরীক্ষার্থীর অসুবিধার কথাই বলিয়াছেন। দুই লাখ ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সাথে সাথে যে একুশ লাখ বিদ্যার্থীর চার মাসের শিক্ষা জীবনের অপচয় হইয়াছে, সে কথাটা আশা করি শিক্ষা-মন্ত্রী ভুলিয়া যান নাই। এই চার মাসের অরাজকতায় এই একুশ লাখ তরলমতি তরুণের কতজনের জীবনে স্থায়ী সর্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে, তার হিসাব কি কেউ করিয়া দেখিবেন? মাসাধিক কালব্যাপী কলেজ শিক্ষকদের ধর্মঘটের দরুন আর কত জনের কোন শ্রেণীর কি পরিমাণ লোকসান হইয়াছে, কোটি জনতার সামগ্রিক দুর্গতির সামুদ্রিক ঝড়তুফানে কেউ তার খবর লইবার দম পাইবেন না।

অথচ এই চার মাসের ঝড়-তুফানের প্রবল আঘাতে সরকার কি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন? সে জ্ঞানটা এই যে, শিক্ষকদের দাবির সাথে সরকারী পলিসির কোনও নীতিগত বিরোধ নাই। শিক্ষকদের দাবী কি? কোন্ দাবি পূরণের জন্য তাঁদের এই চার মাসব্যাপী ধর্মঘট চালাইতে হইল? (১) 'শিক্ষাকে একই পদ্ধতির করিবার উদ্দেশ্যে তার জাতীয়করণ করিতে হইবে।' (২) 'সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একইরূপ বেতন ও চাকুরী

শর্ত প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রথমটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদের বিধান। আর দ্বিতীয় দাবিটি বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টের ২৮ অধ্যায়ের ২ দফার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন সুপারিশ। তাতে বলা হইয়াছে, 'আগামী জুলাই হইতে এই ব্যবস্থা কার্যকর করিতে হইবে।' আমাদের সংবিধান চালু হইয়াছে ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৭৩ সালের ১লা মে।

আর মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ১১ই মে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার দশম দিন ও সংবিধান চালু হইবার ৫ মাস পরে মাধ্যমিক শিক্ষকরা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা দফতরকে দিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও শিক্ষাকমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করাইবার দাবি ও সে দাবির সমর্থনে ধর্মঘট করিলেন। আশি হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ষাট হাজার, তার মানে বিপুল মেজরিটি, মফস্বলের লোক। সাদা-সিদা মানুষ। তাই তাঁরা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, সরকারী দলই যখন সংবিধান পাস করিয়াছেন, তখন সরকার নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁদেরই গড়া শিক্ষা কমিশন যখন বলিয়াছেন জুলাই মাসেই বেতনের হার এক করা হইবে, তখন সরকার অবশ্যই তা করিবেন। কলেজ শিক্ষকদের মেজরিটি শহর-বন্দরের লোক। কাজেই কিছুটা বেশি হুঁশিয়ার। তাই তাঁরা এক মাস সময় বেশি নিলেন আন্তরিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে। সেই বিশ্বাসে তাঁরা ধর্মঘট করিয়া বসিলেন। পরে উপলব্ধি করিলেন, তাঁরা ঠকিয়াছেন। শিক্ষক ভাই-বোনদের আমি জনগণের পক্ষ হইতে আশা দিতেছি যে, তাঁরা এ বিষয়ে একা ঠকেন নাই। আমরা জনসাধারণও ঠকিয়াছি। এমন একটা আদর্শ গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিয়া ফেলায় আমরা যারা সরকারী দলকে বিপুল করতালি-ধ্বনি দিয়া অভিনন্দন জানাইতে লাগিলাম, তাদের উদ্দেশ্য করিয়া সরকার নিজেরাই বলিলেন : হে মূর্খের দল, আন্দাযী যেখানে-সেখানে যাতে তাতে করতালি দিও না। কোন্ কোন্ ব্যাপারে কখন করতালি দিতে হইবে, আমাদের কাছে আগে জানিয়া লইও। সরকারের এমন ব্যবহারে আমাদের ছেলেবেলার এক বক্তার কথা মনে পড়িল। তিনি খুব নামকরা বাগ্মী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা এতই ওজস্বিনী হইত যে, শ্রোতৃমণ্ডলী মুহুর্মুহু করতালিধ্বনি দিয়া তাঁকে অভিনন্দন জানাইত। সে জন্য প্রায় সব বক্তৃতাতেই তাঁকে এইরূপ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিতে হইত : 'হে মূঢ়ের দল, তোমরা যেখানে-সেখানে করতালি দিও না। কোথায় করতালি দিতে হইবে তা আমিই তোমাদের বলিয়া দিব।' তাই বক্তৃতার মাঝে মাঝেই তিনি বলিতেন : 'হে মূর্খের দল, এইখানে তোমরা করতালি দাও।' বলিয়া তিনি নিজেই করতালি দিতেন। আমাদের সরকারের হইয়াছে সেই অবস্থা।

তবু শিক্ষকরা একেবারে ঠকেন নাই। শিক্ষা দফতর তাঁদের দাবি অর্থাৎ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ নীতিতঃ মানিয়া লইয়াছেন। এটার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই শিক্ষকদের। তার মানে, তাঁদের ধর্মঘটের। বাংলাদেশ সরকারের

অন্যান্য দফতর 'নীতিতঃ'ও সংবিধান মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষা দফতর একা একা কেন এ কাজ করিলেন, সে বিষয়ে শিক্ষকরা নিশ্চিত হইতে চান। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতায় প্রকাশ, শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা দাবি করিয়াছেন, শিক্ষা দফতরের ঘোষণায় স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষকদের দাবির ফলেই সরকার শিক্ষা পদ্ধতি ও বেতন সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিতেছেন। মন্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন, শিক্ষকদের এমন দাবি করা অন্যায়। কারণ সরকার আগে হইতেই এই নীতি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিক্ষকরা সত্যসত্যই এমন ঘোষণার কথা বলিয়াছেন কি-না জানি না। যদি করিয়াও থাকেন তবু শিক্ষামন্ত্রীর সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। করণ তাঁর বক্তৃতায় তিনি সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ বা শিক্ষা কমিশনের ২৮ (২) ধারার বরাত দেন নাই।

তাছাড়া সরকার শিক্ষকদের দাবি, তার মানে সংবিধান ও শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট শুধু নীতিগতভাবেই মানিয়া লইয়াছেন। মন্ত্রীরা ত সেটা করিয়াছেন শপথ নিবার দিনই। তার বেশি কি করিয়াছেন শিক্ষকরা তাই জানিতে চাহিলেন শিক্ষকদের দাবি নীতিতঃ মানিয়াও কার্যতঃ কেন মানিতেছেন না, মন্ত্রী সাহেব তার কৈফিয়ত দিয়াছেন, সরকারও অবশ্যই দিবেন: 'টাকার অভাব।' টাকার অভাব কেন? বাজেটে ব্যবস্থা করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই? বাজেটটা ত পাস হইয়াছে সংবিধান ও শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পরে।

অতীতে, মানে পরাধীনতা ও স্বৈরাচারী আমলে, এমন দাবিদাওয়া ও ধর্মঘটের জবাবে সরকার ও মালিক পক্ষ এমনি করিয়া অর্থাভাবের অজুহাতই দেখাইতেন। মুখে মুখে এক মাত্র অর্থাভাবের কথাই বলিতেন সত্য, কিন্তু আসল অজুহাত থাকিত দুইটা। একটা. টাকার প্রশ্ন। অপরটা. প্রেস্টিজের প্রশ্ন। টাকার অভাবের কথাটা সব সময় ঠিক নয়। প্রেষ্টিজের প্রশ্নটা সব সময়ই ঠিক। ধর্মঘটীদের প্রতিপক্ষ সরকারই হউন আর মালিকই হউন, অর্থাভাবের অজুহাতটা প্রায় সব সময়েই খোঁড়া। এটা আগে যেমন সত্য ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজো তেমনি সত্যই আছে। ৬৫০টি বেসরকারী কলেজের ১০,০০০ অধ্যাপক ও ৭৫০০ টি মাধ্যমিক স্কুলের ৮০ হাজার শিক্ষকের জন্য কত টাকা লাগিত? সাধারণ হিসাবমত দেখা যায়, এই দুই খাতে মোট পাঁচ-ছয় কোটি টাকার বেশি লাগিত না। যে গণতন্ত্রী সরকার প্রাইমারী শিক্ষার বাবত সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, তাঁরাই ইচ্ছা করিলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৌনে ন' কোটির স্থলে পনর কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে পারিতেন না? যে সরকার বিদেশী ডেলিগেশন-মিশনে যাতায়াত খরচার বিলাসিতায় প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতেছেন, প্রতিরক্ষা ও পুলিশবাহিনীর বাইরেও অতিরিক্ত রক্ষীবাহিনীর মতো একটা প্যারা-মিলিটারী স্ট্যাণ্ডিং আর্মি বাবত পনর কোটি টাকা খরচ করিতে পারেন, গণভবন, বংগ-ভবন, মন্ত্রিভবনের রাজসিকতায় যাঁরা ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের সাথে পাল্লা দিতেছেন, যাঁদের

বাজেটের একটি দফার 'বিবিধ' খরচের খাতে সামান্য ১০ কোটিও 'অপ্রত্যাশিত' ব্যয় বাবত ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, তাঁরা সংবিধানের নির্দেশ প্রয়োগে শিক্ষার মতো একটা জন লগ্নি (ইনভেস্টমেন্ট-অব-ম্যান) খাতে পাঁচ-ছয় কোটি টাকা খরচ সংকুলান করিতে পারেন না? কাজেই স্পষ্টতই এটা অর্থের অভাব নয়, ইচ্ছার অভাব। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনিচ্ছাটা শুভ নয়। কথাটা নিতান্ত দুঃখের সাথেই বলিতে হইতেছে। শিক্ষা খাতের মোট ব্যয় বরাদ্দের দিক হইতে বাজেটের নিন্দা করা যায় না। খাদ্য আমদানি বাবত দুই'শ সাত কোটি, পুলিশ-রক্ষীবাহিনী-প্রতিরক্ষা বাবত মোট পঁচানব্বই কোটির পরেই তৃতীয় স্থান শিক্ষাখাতের আটান্ন কোটি। শিক্ষাখাতের আটান্ন-এর মধ্যে প্রাইমারী শিক্ষাখাতের পঁচিশ কোটি প্রশংসার অধিকারী। কিন্তু মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকদের বাবত আর পাঁচ-ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করিলেই যেখানে শিক্ষা জাতীয়করণের প্রাথমিক কাজটা হইয়া যাইত, সেখানে কৃপণতার হেতু কি? শিক্ষা কমিশন বাজেট-বরাদ্দের শতকরা ২৫ টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করার সুপারিশ করিয়াছেন। এই হার আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ টাকা। সে জায়গায় সরকার এবারকার বাজেটে শিক্ষাকমিশনের সুপারিশী শতকরা ২৫ টাকার স্থলে মাত্র সাড়ে বার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকদের দাবি পূরণের জন্য যদি আরও পাঁচ-ছয় কোটি টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করিতেন তবে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকৃত শতকরা পঁচিশের স্থলে শতকরা পনর টাকাতেই এটা হইয়া যাইত। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষাখাতের প্রায় অর্ধেক টাকা বরাদ্দ করা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু সে কারণে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবহেলা করা যায় না। কারণ পেশাগত শিক্ষা, ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইত্যাদি বাস্তব জীবনভিত্তিক সব শিক্ষাই এই মাধ্যমিক শিক্ষা তহবিল হইতে খরচ করিতে হইবে।

যেটাই করুন সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় রাজনীতি ঢুকাইবেন না। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, একুশ জন সদস্যের শিক্ষা কমিশনে প্রাইমারী শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদককে মেম্বর করা হইয়াছিল, কিন্তু কলেজ শিক্ষক সমিতি ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কোন প্রতিনিধি নেওয়া হয় নাই। এতে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের তরফের কথা বলিবার লোক কমিশনে ছিলেন না, কিম্বা তাঁদের মতো শিক্ষাবিদ কমিশনে নেওয়াই হয় নাই। অথবা সে কারণে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ভাল হয় নাই, এ কথা আমি বলিতেছি না। আমার বলার কথা এই যে, যেখানে স্বীকৃত ও প্রতিনিধিত্বমূলক একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নেওয়া আর এক প্রতিষ্ঠানের না-নেওয়াটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার। এমন ফরক করাকে ইচ্ছাকৃত পক্ষপাত মনে হইতে পারে। পাবলিক কাজে পক্ষপাতটা রাজনীতিক মনে হওয়া সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ঢুকাইয়া আমরা ইতিমধ্যেই তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছি। কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গনটাও যেন তেমন কলুষিত করিয়া না তুলি। সরকারী ও

বেসরকারী স্কুল-কলেজ-শিক্ষকদের মধ্যে আমরা শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখিতে চাই কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও ক্যাডেট কলেজ ও মডেল স্কুলগুলি বজায় রাখিয়া ছাত্রদের মধ্যে যে শ্রেণী-বৈষম্য বজায় রাখিতে চাই, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এটাকে নিশ্চয়ই সমাজবাদের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ বলা যাইবে না।

শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি অবজ্ঞা, অমর্যাদা ও অসম্মান আজ যেন একটা ভ্যাণ্ডালিজমের আকারে দেখা দিয়াছে। সে ভ্যাণ্ডালিজমে যেন ছাত্র-অভিভাবক-মন্ত্রী-মেম্বর শাসক-শাসিত আমরা সবাই শরিক হইতেছি। পাকবাহিনী আমাদের শিক্ষকদের কতককে নিধন করিয়া গিয়াছে, বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেককে আমরা দালাল আইনে সাবাড় করিতেছি। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আমরা যেন একটা সর্বাত্মক জেহাদী অভিযান চালাইয়াছি। অথচ শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন, শিক্ষকগণকে বেতনে ও মর্যাদায় প্রশাসন কাঠামোর সর্বোচ্চস্তরে স্থান দিতে হইবে। আমরা সবাই মিলিয়া শুরু করিয়াছি ঠিক তার উল্টাটা। এর কুফল দেশকে কোথায় নিয়া যাইতেছে তার খবর সরকার আমার চেয়ে অনেক বেশি রাখেন। স্বৈরাচারী শাসন আমলে আমাদের দেশের যে সব ইন্টেলেকচুয়াল নিতান্ত আত্মমর্যাদার খাতিরে বিদেশে চাকুরী করিতেন, দেশ স্বাধীন হইবার পর তাঁরা দেশ গড়নের কাজে সরকারকে সাহায্য করিবার আশায় দলে দলে দেশে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী-টেকনিশিয়ান, দার্শনিক-সাংবাদিক, শিক্ষক-অধ্যাপক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি অনেক ছিলেন। অল্পদিনেই তাঁদের আসা বন্ধ হইয়াছে। যাঁরা আসিয়াছিলেন তাঁরাও ফেরৎ যাইতেছেন। যাঁরা আগে হইতে দেশেই ছিলেন, তাঁদেরও অনেকে বিদেশ রওয়ানা হইয়াছেন। কেন? সরকার কি খবর লইয়াছেন? ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে সরকার মিটমাট করিতেছেন না অংশতঃ প্রেষ্টিজের অজুহাতে। জনগণের ও তাঁদের শিক্ষকদের প্রেষ্টিজই গণতান্ত্রিক সরকারের আসল প্রেষ্টিজ্। এই সেদিন ভারতের রেল কর্মচারীদের ধর্মঘট মিটাইতে গিয়া তাঁদের দাবি দাওয়া মানিয়া লইতে ভারত সরকারের প্রেষ্টিজে বাধে নাই।

এ ব্যাপারে আমাদের সরকার ভারত সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন না?

১৭ই আগষ্ট, ১৯৯৩

গণতন্ত্রী সমাজবাদী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের সমস্যার অন্ত নাই। এসব সমস্যার একটারও সমাধান হইতেছে না। বরঞ্চ সমস্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সমাধানের চেষ্টা হইতেছে না, সততার সঙ্গে এ কথাও বলা যায় না। সরকার চেষ্টা করিতেছেন খুবই। কিন্তু চেষ্টাগুলি সফল হইতেছে না। এ অসাফল্যের জন্য দায়ী কে? পন্থার ত্রুটি? না প্রয়োগের ত্রুটি? যদি প্রয়োগের ত্রুটি হয়, তবে সে অপপ্রয়োগের জন্যইবা দায়ী কে?

বেশ জোরেসোরেই বলা হইতেছে, সব দোষ সরকারী কর্মচারীদের। সে দোষটাও শুধু অযোগ্যতা নয়; ইচ্ছাকৃত, দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত অপচেষ্টা। কর্মচারীদের এমন অসাধু অভিপ্রায়ের প্রমাণও হাতের কাছেই পাওয়া যাইতেছে। এঁরা পাকিস্তানী আমলেও সরকারী চাকরি করিতেছিলেন। সামরিক শাসনামলেও সরকারের তাঁবেদারী করিতেছিলেন। কাজেই এঁরা যে পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন, এঁরা যে স্বাধীন বাংলাদেশের সাফল্য চান না, এঁরা যে মন্ত্রীদের ডিসক্রেডিট করিয়া গণ-মনে পুনরায় পাকিস্তান-প্রীতি বহাল করিতে চান, তাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এমন ধরনের কথা মন্ত্রীরা সকলে বলিতেছেন তা নয়; তবে যাঁরা বলিতেছেন, তাঁরাও বড় ফেলিয়া দিবার পাত্র নন, তাঁদের অনেকের কথায় অনেক মন্ত্রী ওঠ-বস করেন, সরকারী কর্মচারীরা নিজ চক্ষে তা দেখিতেছেন। এঁরাই মাঠে-ময়দানে, সভা-সমিতিতে, বিবৃতি-বক্তৃতায় অহরহ সরকারী কর্মচারীদের ভয় দেখাইতেছেন, অমুক দিন হইতে এদের ঝাড়াই-বাছাই করিয়া শুদ্ধি করা হইবে। সে শুদ্ধির মাপকাঠি হইবে পাকিস্তানী আমলে তাঁদের আচার-আচরণ।

সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ সমন্ধে নির্ভুল বিচার করা খুবই কঠিন। কারণ, প্রথমতঃ, সরকারী কর্মচারীরা প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। মন্ত্রী-মেম্বর ইত্যাদি রাজনীতিক নেতারা খবরের কাগজে ও সভা-সমিতিতে প্রকাশ্য বক্তৃতা বিবৃতি দিয়া সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারেন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা সেসব অভিযোগের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিতে পারেন না। গোটা ব্যাপারটাই এখানে একতরফা।

দ্বিতীয়তঃ গণমনে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটা অনাস্থা, অবিশ্বাস, এমনকি একটা ঘৃণার ভাব, বদ্ধমূল রহিয়াছে। এটা একদিন-দুই দিনের ব্যাপার নয়। অনেক দিনের। 'বুরোক্র্যাসি' শব্দটাই গণমনে ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাবের উদ্রেক করে। ইংরাজের আমল হইতেই শিক্ষা, ট্রেনিং ও প্রথার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীরা জনগণের

সাথে শাসক-শাসিতের ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কাজে-কর্মে, চালে-চলনে এমনকি সাধারণ সামাজিক ব্যাপারের আচার-আচরণেও তাঁরা জনগণ হইতে নিজেদের পৃথক ও বিশেষ অধিকার ও মর্যাদাভোগী এক কুলীন শ্রেণী মনে করিয়া আসিয়াছেন। ইংরাজ শাসনের অবসানে দেশে যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারের শাসন চলিত তবে হয়ত কালক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী আমলের পনরটা বছরই গিয়াছে মিলিটারি শাসনে। মিলিটারী স্বৈরাচারী আমলের এই পনরটা বছরই বুরোক্র্যাসির বিপুল অংশ সামরিক স্বৈরাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ফলতঃ, সামরিক স্বৈরাচারের পুরা মুদ্দতটাই দেশবাসীর নজরে সিভিল মিলিটারি ডিক্টেটরশিপরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। মিলিটারী নেতৃত্ব ও অফিসারদের বিপুল মেজরিটি পশ্চিমা হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণের বিচারে গোটা মিলিটারী আমলটাই ছিল কার্যতঃ বিদেশী শাসন। বাংগালি সিভিলিয়ানরাও সেই দিক হইতে ছিলেন বিদেশী শাসক-শোষকদের দেশী হাতিয়ার মাত্র।

এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা-যোদ্ধারা সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগই করেন, প্রায় বিনাবিচার-বিবেচনায় জনগণ তাতেই বিশ্বাস করিবে, এতে অবাক হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু এ ব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, গোটা পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির আমূল ও মৌল পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের দেশ ঔপনিবেশিক পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতায় উত্তরণ করিয়াছে। আমাদের সংগ্রামী জননেতারা আজ শাসক রাষ্ট্রনেতা হইয়াছেন। স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের অংশ হিসাবে এতদিন যাঁদের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অশান্ত ও প্রশাসন কাঠামো বিপর্যস্ত করা, তাঁদেরই আজ কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঠিক তার উল্টা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনসৌকর্য প্রতিষ্ঠা এখন তাঁদের দায়িত্ব এবং মাথাব্যথা। গতকাল যাদের ছিল ভাঙ্গার পালা, তাঁদেরই আজ গড়ার পালা। গড়ার কাজে সকলের আগে প্রশাসনযন্ত্র ঠিক করিতে হইবে। এই কাজটাই আমরা ঠিকমত করিতেছি কি-না আমাদের রাষ্ট্রনেতারা তা ভাবিয়া দেখিবেন।

আসলে আমাদের প্রশাসনকাঠামো সম্বন্ধে আর ভাবিয়া দেখিবার কিছু নাই। আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান এটা মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। সংবিধানে আমরা পার্লামেন্টারি প্রথার ক্যাবিনেট সিস্টেমের সরকার গঠনের বিধান করিয়াছি। এটা বৃটিশ সিস্টেম। এই সিস্টেমের বুনিয়াদ স্থায়ী প্রশাসনযন্ত্র। সে যন্ত্রের প্রকৃতি দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে ও বাহিরে পার্লামেন্ট বুরোক্র্যাসি; স্থায়ী আমলাতন্ত্র। এই আমলাতন্ত্র দলীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতা এমন সম্যক, সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ যে, এ গুণ শাসনযন্ত্রকে সত্য-সত্যই যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে এবং অফিসারগণকে যন্ত্রাংশরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দলীয় রাজনীতির দিক হইতে এই সব যন্ত্রাংশের আর কোনও

পরিচয় বা ব্যক্তিত্ব নাই। এই যন্ত্রের যন্ত্রী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার। যে দল নির্বাচনে জিতিয়া যখন যেমন সরকার গঠন করিবেন এবং সে সরকার যখন যে কাজ করিতে বলিবেন, যন্ত্রটি তাই করিবেন। এই কারণেই সরকার বদল হইলেই কর্মচারী বদলাইতে হয় না। ১৯৪৫ সালে মিঃ এট্‌লির নেতৃত্বে যখন ইংলণ্ডের লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসিলেন, তখন তিনি প্রশাসন-যন্ত্রে কোনও পরিবর্তন না আনিয়াই, একজন সরকারী কর্মচারী না বদলাইয়াই বৃটিশ সরকারের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতিতে বিপুল পরিবর্তন আনিয়া ফেলিলেন। যেখানে মিঃ এট্‌লির পূর্ববর্তী মিঃ চার্চিল বলিলেন, 'বৃটিশ সাম্রাজ্য কিছুতেই ভাঙ্গিব না,' সেখানে মিঃ এট্‌লি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিলেন। শিল্প জাতীয়করণকে মিঃ চার্চিল যেখানে সোজাসুজি কমিউনিজম বলিতেন, সেখানে তাঁরই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লি ইংলণ্ডের সমস্ত শিল্প জাতীয়করণ করিয়া ফেলিলেন এবং কমিউনিস্ট রুশিয়ার অনুকরণে অনেক 'সোশিয়াল সিকিউরিটি' ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। ইংলণ্ডের জীবনে এমন বিপ্লবী পরিবর্তনেও তার প্রশাসনযন্ত্রের একটি চোখের পাতাও নড়িল না। সে প্রশাসনযন্ত্র গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দলের আমলে যেমন নির্বিবাদে সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, সাম্রাজ্য-বিরোধী শ্রমিক দলের আমলে তেমনি নির্বিবাদে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া চলিল। এটা যেন একটা তল্‌ওয়ার। আমার শত্রুর হাতে যখন সেটা ছিল তখন আমাকে যেমন তেজে আঘাত করিতেছিল, আমার হাতে পড়িয়া তেমনি তেজে আমার শত্রুকে আঘাত করিতেছে।

বৃটেনের এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা শাসনযন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার এমনি একটি আমোঘ পন্থা যে, ফরাসী সরকারও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, মার্কিন সরকার এই ব্যবস্থা অন্ততঃ আংশিক গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণেই স্বাধীনতার পরেও ভারত ও পাকিস্তান তাঁদের প্রশাসনযন্ত্র এই প্যাটার্নেই গঠন করিয়াছিলেন এবং পরে যার-তার সংবিধানে এই ব্যবস্থাই পাকা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই কারণেই আমাদের সংবিধানেও অবিকল এই ব্যবস্থাই রক্ষা করা হইয়াছে। আমাদের সরকার যে বিনা চিন্তা-ভাবনায় গতানুগতিকভাবেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, সরকার-বিরোধী রাজনীতিক বা বিশেষজ্ঞরাও এমন কথা বলিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ, স্বাধীনতার গোড়া হইতেই আমাদের সরকার বলিয়া আসিতেছিলেন, প্রশাসনযন্ত্রে তাঁরা বিপ্লবী পরিবর্তন আনিবেন। অহিংস নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়ায় বরঞ্চ জনযুদ্ধের হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ায় স্বভাবতঃই এটা ধরিয়া নেওয়া হইয়াছিল যে, প্রশাসনযন্ত্রে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইতে বাধ্য। সরকারও ঘোষণা করিয়াছিলেন, প্রশাসনযন্ত্র পুনর্গঠিত হইবে।

এতসব ঘোষণা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার যে, প্রচলিত বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাই চালু রাখিয়াছেন, আমলাতন্ত্রের চাকুরির নিরাপত্তা ও নিয়োগের ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন সম্বন্ধে শাসনতান্ত্রিক সংবিধানে সমস্ত ধারাবিধান যে ভারত ও পাকিস্তানের সাংবিধানিক প্যাটার্নেই করা হইয়াছে, তার অর্থ ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট। আমাদের সরকার ও শাসক দল আমলাতান্ত্রিক বৃটিশ প্যাটার্নকেই মোটের উপর সকল দিক হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এ সিদ্ধান্ত তাঁদের ঠিকই হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তব প্রয়োগে এটা চলিতেছে না। সরকারী কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা ও তাঁদের চাকুরির নিরাপত্তা যে বৃটিশ সিস্টেমের শ্রেষ্ঠ গুণ, আমাদের প্রশাসনে তারই অভাব দেখা যাইতেছে। সরকারী চাকুরির যে নিরাপত্তা সংবিধানে নিশ্চিত করা হইয়াছে, প্রায়শঃ প্রতিপদে সেই বিধান লংঘিত হইতেছে। ৯ নং প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডারের মতো স্পষ্টতঃ ও দৃশ্যতঃ একটি সাময়িক ও অস্থায়ী বিধানকে সংবিধানের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডারে কোনও কারণ না দর্শাইয়া যে কোনও সরকারী-আধা-সরকারী কর্মচারীকে বরতরক করিবার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। সরকারের এই অযৌক্তিক অর্ডারের বিরুদ্ধে আপিল বা অন্য কোনও প্রকারের প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। ফলে সংবিধানের চেয়ে এই প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার অনুসারেই কাজ বেশি হইতেছে।

অফুরন্ত ও অসীম ক্ষমতা অফুরন্ত ও অসীম অবিচারের জন্মদাতা। এক অবিচার অন্য অবিচার টানিয়া আনে, যেমন একটি মিথ্যা আর দশটি মিথ্যার জন্ম দেয়। মিথ্যার প্রসার ও অবিচারের এলাকা বিস্তার এইভাবেই ঘটিয়া থাকে। আমাদের প্রশাসনেও অবিচার এইভাবেই বিস্তার লাভ করিতেছে। চাকুরি খাইবার অবাধ ও অসীম ক্ষমতা চাকুরি দেওয়াতেও বিস্তৃত হইতেছে। কারণ না দেখাইয়া চাকুরি খতম করিবার ক্ষমতা যাঁর আছে, কারণ না দেখাইয়া চাকুরি দিবারও ক্ষমতা নিশ্চয়ই তাঁর আছে। তথাকথিত স্ক্রিনিং কমিটি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ সুবিধামত মানা ও না-মানা হইতেছে। প্রমোশন-ডিমোশন, নিয়োগ বিনিয়োগ সব তাতেই এমন ঘটিতেছে, অথবা ঘটিতে পারে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

ফলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা সার্বজনীন সন্ত্রাস সৃষ্টি হইয়াছে। গুণাগুণের বিচার মোটেই হইতেছে না, অথবা শুধু অবিচার, পক্ষপাতিত্ব ও আত্মীয়-প্রীতিই চলিতেছে, এমনটা ঘটিতেছে না ঠিকই; কিন্তু তেমনটা যে ঘটিবে না, তারও নিশ্চয়তা নাই। কার চাকুরি কে কখন খাইবে, কে যে প্রমোশন পাইয়া কার ঘাড়ের উপরে আসিয়া

বসিবে, কেউ কিছু জানেন না। জানিবার উপায় নাই। কারণ, কোনও নিয়মকানুন, রুলস-রেগুলেশন অনুসারে কাজ হইতেছে না।

এমন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কেউ কাজ করিতে পারেন না। ফলে গোটা প্রশাসনযন্ত্রের কাজের মান ও পরিমাণ, দক্ষতা ও বিজ্ঞতা সবই নিম্নতম স্তরে নামিয়া পড়িয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা সাহস ও মনোবল হারাইয়াছেন। প্রশাসনে নেতৃত্ব দেওয়া যে সব সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব, প্রশাসনের মোটরের চাকা যাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ড্রাইভিং পাওয়ারে ঘুরে, তাঁরাই আজ শক্তি ও সাহস, উৎসাহ উদ্যম হারাইয়া বসিয়াছেন।

আরেক কারণে সাধারণভাবে সব সরকারী কর্মচারী মনোবল ও কর্মোদ্যম হারইয়াছেন। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 'মুজিবনগরী' ও 'অমুজিবনগরী' এই দুই ক্যাটিগরির লোক আছেন, মন্ত্রীরা এ কথা মানিয়া লইয়াছেন। 'মুজিবনগরী' মানে যে সব কর্মচারী স্বাধীনতা-সংগ্রামের নয় মাস কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর যাঁরা কলিকাতায় পালাইয়া যান নাই তাঁরাই 'অমুজিবনগরী'। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যারা কলিকাতায় বা ভারতের অন্যস্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁরা সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা, কাজেই দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ। আর যাঁরা তা করেন নাই, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাঁরা সবাই ঢাকাতেই ছিলেন; নিয়মিতভাবে অফিস-আদালত করিয়া হানাদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। ঢাকা হইতে পালাইয়া বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে যেসব অফিসার লুকাইয়া ছিলেন, তাঁদেরও এই দ্বিতীয় ক্যাটিগরিতে ফেলা হইয়াছে।

ব্যক্তিগতভাবে কোন অফিসার বা রাজনীতিক মুক্তিযুদ্ধে কি ও কেমন অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তার হিসাব না লইয়াও সকলকে এজমালিভাবে মুক্তিযোদ্ধার গৌরব দিতেই হইবে। সেটাতে তাঁদের অধিকারও আছে। মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণের সে আনন্দতৃপ্তি ও গৌরববোধ হইতে কেউ তাঁদের বঞ্চিত করিতে পারেন না। কিন্তু কলিকাতা যাওয়াটাই মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার একমাত্র পন্থা ছিল। সেটাকেই দেশপ্রেমের একমাত্র মাপকাঠি মনে করা এবং সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্য, দক্ষতা ও যোগ্যতাও সেই মাপকাঠিতেই বিচার করিতে হইবে, এমন করাটাই সাংঘাতিক ও আত্মঘাতী। আমাদের সরকার তা করিতেছেন, আমি তা মনে করি না। বরঞ্চ কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'অমুজিবনগরী' কর্মচারীদেরও মর্যাদা তাঁরা দিতেছেন।

কিন্তু সরকারী পর্যায়ে 'মুজিবনগরী' অফিসারদেরে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁদেরে ঐ নামে সম্মিলনী করিতে দেওয়া এবং সে সব সম্মিলনীতে মন্ত্রীদের আতিথ্য গ্রহণ করা,

নিঃসন্দেহে প্রশাসনের দিক হইতে আত্মঘাতী। কারণ, আসলে ভিত্তিহীন হইলেও সরকারী কর্মচারীদের মনে এই ধরনের কমপ্লেক্স ও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। হইয়াছেও এক দিকে 'মুজিবনগরী'দের মনে একটা প্রেভিলেজড্ শ্রেণীচৈতন্য এবং সেই চৈতন্য হইতে কর্তব্যে অবহেলা করার অধিকারবোধ তাঁদের এফিশিয়েনসি হ্রাস করিবে। অপরদিকে 'অমুজিবনগরী'দের মনে একটা অনিশ্চয়তা ও নিগৃহবোধ তাঁদেরও এফিশিয়েনসি কমাইয়া ফেলিবে। যতদূর মনে হয়, ইতিমধ্যে উভয় শ্রেণীর মধ্যে এটা ঘটিয়াই গিয়াছে।

অথচ 'অমুজিবনগরী'দের বরাতে এটা ঘটা উচিত ছিল না। তাঁরা ইতিপূর্বেই দেশ-প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই গিয়াছিলেন। সরকারী চাকুরীর শৃংখলার মধ্যে থাকিয়া যতটা সম্ভব তাঁরা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মতো কাজ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ গোটা পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টি হইয়া রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দিন হইতেই পূর্ব পাকিস্তানের সকল বাঙ্গালি অফিসারই তাঁদের আচরণে আওয়ামী লীগকেই কার্যতঃ 'ডিফ্যাকটো' বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তা না হইলে ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ আওয়ামী লীগ যে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিয়াছিলেন, তা অমন নজিরবিহীন সাফল্য লাভ করিতে পারিত না। সে অসহযোগ হাইকোর্ট-জজকোর্ট হইতে মুনসেফ-ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পর্যন্ত সমস্ত আদালত, সেক্রেটারিয়েট হইতে কেরানিখানা পর্যন্ত সকল অফিস, স্টেটব্যাঙ্ক হইতে ডাক-তার বিভাগ পর্যন্ত সমস্ত সরকারী কর্মস্থল আওয়ামী লীগের ডাকে সাড়া দিয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর লোকজন ঘরে ঘরে ও অফিসে অফিসে ঘুরিয়াও সে হরতাল ভাংগিতে পারে নাই। সামরিক চোখ রাঙ্গানিও সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগ দেওয়াইতে পারে নাই। সকল বিভাগীয় প্রধান হইতে অধস্তন কর্মচারী সম্বন্ধে এটা সত্য। চাকুরী খোয়া হইতে শারীরিক বিপদের সকল প্রকার বিপদের ঝুঁকি লইয়াই সরকারী কর্মচারীরা আওয়ামী লীগ ঘোষিত এই অসহযোগে যোগ দিয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গভর্নরকে হলফ দিতে অস্বীকার করিয়া প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে অসহযোগের এমন নজির আর নাই। এমন সর্বাত্মক অসহযোগে অংশগ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীদের পাকিস্তানের দালাল মনে করা অথবা তাঁদের দেশপ্রেমে সন্দেহ করা অন্যায় নয়? স্বাধীনতার পর এঁদেরই আনুগত্য ও দেশপ্রেম লইয়া খোঁচা-খাঁচি ও টানা হ্যাঁচড়া করা কি অবিচার নয়?

সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সততার বিচারে তাঁদের ঝাড়াই-পোছাই করার অধিকার ও কর্তব্য সব সরকারেরই আছে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতিবাজ লোকও অনেক আছেন। তাঁদের শাস্তিবিধান করিয়া প্রশাসনিক পরিচ্ছন্নতা, দক্ষতা ও

সৌকর্য রক্ষা করা সকল সরকারেরই দায়িত্ব। কিন্তু এ সবই করিতে হইবে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত আইন ও নিয়ম অনুসারে। কারণ কারও উপর অবিচার না হয়, সেই উদ্দেশ্যে সকল আদেশের বিরুদ্ধে কৈফিয়ত দিবার ও উচ্চস্তরে আপিল করিবার বিধান থাকিতে হইবে। এই দিক হইতে ৯নং প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার অন্যায় ও অবাস্তব। সরকারী কর্মচারীদের মনে নিরাপত্তা-বোধ সৃষ্টির জন্য এই অর্ডার অবিলম্বে বাতিল হওয়া দরকার। সৎ, দক্ষ কর্তব্যপরায়ণ অফিসারদের কোনও ভয় নাই, এবং অসাধু ও কাজে-ফাঁকি দেওয়া অফিসারদের কোন ক্ষমা নাই, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন চৈতন্য ও নিশ্চয়তা সৃষ্টি করাই প্রশাসনিক দক্ষতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার একমাত্র পন্থা। বাংলাদেশ সরকার যতদিন এই মনোভাব সৃষ্টি না করিতেছেন, ততদিন প্রশাসনযন্ত্র বিকল থাকিবেই।

সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে সরকারের এ বিভ্রান্তিকর নীতির সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন তথাকথিত বিপ্লবীরা। এঁরা বলিয়া বেড়াইতেছেন, সমাজবাদী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র চলিতে পারে না। কাজেই প্রশাসনযন্ত্র আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। যাঁরা বলেন, সমাজবাদ ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলিতে পারে না, শুধু তাঁরাই প্রশাসনযন্ত্র সম্বন্ধে এমন উক্তি করিতেছেন না; সরকার সমর্থক ও সরকারী পৃষ্ঠপোষিত অনেক প্রতিষ্ঠানিক নেতাও এই ধরনের উক্তি করতেছেন। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে সমাজবাদ চলিবে কি না, আর সমাজবাদী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র চলিবে কি না, সংবিধান চালু হইবার পর এই দুইটি ব্যাপার মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। জনগণের দিক হইতে এর কোনটাই এখন আর বিতর্কের বিষয় নয়। সরকারী কর্মচারীদের মনেও সংবিধান প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাবোধ ও সাহস ও সততার সঙ্গে কর্তব্য সাধনের মনোভাব সৃষ্টি করা উচিত ছিল। সেটা যে আজও হয় নাই, তার ঐ ৯নং প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার এবং সেই সঙ্গে সরকার সমর্থক ও সরকার-সমর্থিত কিছু লোকের আচরণ। সরকারের নিজের আচরণও।

আশা করি, সরকার এ ব্যাপারে বাস্তববাদী হইবেন এবং সংবিধানের মর্যাদার উপযোগী নীতি বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্প হইবেন। একমাত্র এই উপায়েই প্রশাসনিক দক্ষতা ও পরিচ্ছন্নতা পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব হইবে।

২১ আগষ্ট, ১৯৭৩

প্রস্তাবিত জুট ইন্টারন্যাশনালের উভয় দিক দেখিতে হইবে

কারো সঙ্গে কোনও বিতর্কে নামার ইচ্ছা আমার নাই। শক্তিও নাই। সরকারের সংগে ত নয়ই। তথ্য ও মতবাদ উভয় দিক হইতেই এমন বিতর্ক অর্থহীন। মতবাদের দিক হইতে নিরর্থক। তথ্যের দিক হইতে ভিত্তিহীন। সরকারের কাছে ব্যক্তির মতবাদের কোন দাম নাই। আর তথ্যের দিক হইতে ব্যক্তির চেয়ে সরকার অনেক বেশি জ্ঞানী।

এ অবস্থায় আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, সরকারের পাট দফতরের সাথে নাহক আমার একটা বিতর্ক বাধিয়া গিয়ছে। পাট দফতর নাহক ও অনাবশ্যকভাবে এই বিতর্ক বাধাইয়াছেন, এ কথা বলিলে আরেকটা নয়া বিতর্ক আনা হয়। তাই ও কথা আমি বলিব না।

বস্তুতঃ, এই বিতর্কেই আমি থাকিতাম না যদি এতে জুট ইন্টারন্যাশনালের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ সুদূরপ্রসারী বিষয় জড়িত না থাকিত। প্রশ্নটা সত্য সত্যই এমন একটা ব্যাপার যার উপর বিশেষজ্ঞ স্তরে আলোচনা এবং রাজনৈতিক স্তরে সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। শুধু অফিসার স্তরের আলোচনায় এমন ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাইতে পারে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এ আলোচনায় যোগ দিলাম। সরকারী হ্যাণ্ড আউটের সমালোচনা করিলাম নিতান্ত প্রসংগক্রমেই।

গত ২৪শে আগষ্টের 'ইত্তেফাকে' পাট সম্পর্কে আমি যে নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম 'তার প্রতি অর্থ ও পাট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।' সরকারের তরফ হইতে বলা হইয়াছে, 'নিবন্ধে কতিপয় মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হইলেও ইহাতে কিছু তথ্যগত ভুল রহিয়াছে।'

প্রথমেই 'কতিপয় মূল্যবান পরামর্শের' স্বীকৃতির জন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এবং 'কতিপয় তথ্যগত ত্রুটির' জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইতেছি। 'কতিপয় ত্রুটির' মধ্যে সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই হইয়াছে যে, আমি হিসাবের ভুল করিয়াছি। প্রতি কুইন্টেলের দাম একশত সাতান্ন হইলে মনের দাম কত? অংকশাস্ত্রে আমি ছাত্রজীবনেই কাঁচা ছিলাম। এখন বুড়া বয়সের ত কথাই নাই। তার উপর পাটের কুইন্টেল আসলে কত মণ, তাও আমার নিখুঁতভাবে জানা ছিল না। সেই অজ্ঞতার দরুন আমি বলিয়াছিলাম 'কুইন্টেলের দাম একশ' সাতান্ন হইলে মনে হয় সত্তর টাকা। এটা সাংঘাতিক ভুল। প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক বেশি। ভাগ্যিস আমি পাট বেচি নাই, পাট দফতরও কিনেন নাই। এটা যদি ঘটিত, তবে পাট দফতর ভয়ানক ঠকিতেন। আর আমি ঠক-প্রবঞ্চক বলিয়া ধরা

পড়িতাম। কারণ সরকারী মতে যেখানে দাম মাত্র 'সাতান্ন টাকার সামান্য বেশি' আমি সেখানে দাবি করিয়াছি সত্তর টাকা। মণ-প্রতি তের টাকাই বেশি। একবারে দিনে ডাকাতি।

তথাপি সরকারি হিসাবটা যদি ঠিক হইত, তবে আমি খুশিই হইতাম। ভবিষ্যতে আমার বা আমার মতো আর কারও ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাট-বিভাগে যিনি আলোচ্য হ্যাণ্ড আউট মুসাবিদা করিয়াছেন, তিনিও পাটের হিসাবে আমার চেয়ে খুব বেশি পাকা নন। তিনি প্রতি কুইন্টেলকে দুই মণ ত্রিশ সের ধরিয়াছেন। আসলে প্রতি কুইন্টেল দুই মণ সাড়ে ছাব্বিশ সেরের সমান। দশমিক হিসাব মতে ধরা হয় দুই পয়েন্ট সাত মণ। হিসাবে মণকরা পাটের দাম হয় আটান্ন টাকা পনর পয়সার সামান্য কম। কাজেই পাট দফতরের এই অফিসারটি মণ-প্রতি এক টাকা কম ধরিয়াছেন। বাংলাদেশ ভারতের নিকট পাট বিক্রয়ের চুক্তি করিয়াছে। এ অফিসার সাহেবের হিসাবমত ভারতের নিকট হইতে দাম গ্রহণ করিলে বাংলাদেশের অনেক টাকা লোকসান হইবে। 'পাট মন্ত্রণালয়' সাবধান! আমার মতো রাস্তার মানুষের ভুলে কিছু আসে যায় না। সরকারী কর্মচারীর ভুলে অনেক আসে যায়।

আমার এই অংকশাস্ত্রের ভুল ছাড়া পাট দফতর আমার আর কি কি ভুল ধরিয়াছেন, এখন তার আলোচনা করা যাউক।

আমি আমার নিবন্ধে লিখিয়াছিলাম: 'গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরে একটি আন্তর্জাতিক গোপন সম্মিলনী হইয়াছিল।' পাট দফতরের হ্যাণ্ড আউটে এই 'গোপন' কথাটাতেই আপত্তি করিয়াছেন। 'গোপন' কথাটা কোন খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। সভাসম্মিলনীতে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের প্রবেশাধিকার না থাকিলেই তাকে 'গোপন', মানে, 'নট ওপেন টু দি প্রেস' বলা হয়। এটা কোনও অসাধারণ ব্যাপার নয়। সভা-সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের ইচ্ছামতই এটা করা হয়। তা করিবার ন্যায়সংগত অধিকারও উদ্যোক্তাদের আছে। এমন সভাসম্মিলনীকে 'গোপন' বলাই রেওয়াজ। আলোচ্য পাট সম্মিলনী যে 'গোপনে' হইয়াছিল এবং তাতে যে সংবাদপত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না, তার বড় প্রমাণ এই যে, সম্মিলনী শেষে সম্মিলনীর সভাপতি এক প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়াছিলেন এবং তাতে সম্মিলনীর সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আমার লেখায় উল্লিখিত গোপন কথাটার কদর্থ করিয়া পাট দফতর এতই গোস্বা হইয়াছেন যে, আমার নিবন্ধের আসল ভুলটার প্রতিবাদ করিতেই তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আসল ব্যাপার এই যে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় 'গোপন' বা 'প্রকাশ্য' কোন পাট সম্মিলনীই হয় নাই। আলোচ্য সম্মিলনীটা হইয়াছিল জানুয়ারি মাসে। জানুয়ারির ১৫ই হইতে ১৯শে পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরিয়া এই বৈঠক চলিয়াছিল। ১৯শে জানুয়ারি সম্মিলনী শেষে সম্মিলনীর সভাপতি একটি প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়া সম্মিলনীর

সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করেন। ২০শে জানুয়ারির খবরের কাগজসমূহে ঐ প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্ট পড়িয়াই দেশবাসী সর্বপ্রথম জানিতে পারে যে, ঐ সম্মিলনীতে একটি 'জুট ইন্টারন্যাশনাল' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং সে জুট ইন্টারন্যাশনালের হেড অফিস স্থাপিত হইবে নয়াদিল্লীতে। দেশবাসী এ সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানিতে পারে নাই।

তারপর ২৩শে ফেব্রুয়ারি ইতালির রোম শহর হইতে ঢাকা সম্মিলনীর বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এতদিন পরে সুদূর বিদেশ হইতে ঐ বিবরণী বাহির হইয়াছিল বলিয়া নিউজ এজেন্সীরা বোধ হয় তেমন বিস্তারিত রিপোর্টও প্রচার করেন নাই। করিয়া থাকিলেও আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহ স্বভাবতঃই ঐ বাসী খবর প্রচারে তেমন উৎসাহ বোধ করে নাই। ফলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাট সম্মিলনীর 'গোপন' বৈঠকের কার্য বিবরণী বাংলাদেশবাসীর কাছে 'গোপন'ই রহিয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় 'গোপন' শব্দটার ব্যবহারে আমাদের কারও উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আমি আমার আলোচ্য নিবন্ধে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক. জুট মিনিষ্ট্রি স্থাপন না করিয়া জুট ডিভিশন সৃষ্টি করা। দুই. পাটের সর্বনিম্ন মূল্য পঞ্চাশ টাকা ধার্য করা। তিন. জুট ইন্টারন্যাশনালের হেড অফিস নয়াদিল্লীতে স্থাপন করায় রাজী হওয়া। পাট দফতরের আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে: 'সরকার ইতিমধ্যেই নীতিগতভাবে এ সংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।' এটা একটা খোশখবর। বস্তুতঃ, আমার আলোচ্য নিবন্ধের আপত্তির অর্ধেক এই একটি কথাতেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আমি ঐ নিবন্ধে বলিয়াছি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করি এবং বহুদিন হইতে বলিয়াও আসিতেছি যে, পাট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জুট মিনিষ্ট্রি গঠন করিতে হইবে। সে মিনিষ্ট্রির দায়িত্ব এককভাবে একজন মন্ত্রীর হাতেই দেওয়া হইবে, কি অন্য কোনও মিনিষ্ট্রির সাথে একই মন্ত্রীর হেফাযতে দেওয়া হইবে, সেটা প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর যোগ্যতা ও দক্ষতার উপরই সেটা নির্ভর করিবে। বস্তুতঃ যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার বিচারেই একই মন্ত্রীর কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের ভার দেওয়া হইয়া থাকে। জুট মিনিষ্ট্রির দায়িত্বও সেই বিচারেই বর্তমান অর্থমন্ত্রী বা অন্য যে-কোন মন্ত্রীকে দেওয়া যাইতে পারে। আসল প্রশ্ন, এটা মিনিষ্ট্রি, না ডিভিশন? মন্ত্রণালয়, না বিভাগ? এ সম্পর্কে আমাদের সরকারের সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া মনে হইল না। আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটটিকে "অর্থ ও পাট মন্ত্রণালয়ের পাট বিভাগ হইতে প্রদত্ত হ্যাণ্ডআউট" বলা হইয়াছে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাট মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। এই হ্যাণ্ড আউটের আরও একাধিক জায়গায় 'পাট মন্ত্রণালয়ের পাট বিভাগ' কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় 'সরকার একটি পাট মন্ত্রণালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন,' এ

কথার কোনও অর্থ হয় না। সে যা-ই হউক, সরকার যদি ইতিমধ্যে একটি পাট মন্ত্রণালয় স্থাপন করিয়া ফেলিয়া থাকেন, তবে এ সংক্রান্ত আমার 'মূল্যবান পরামর্শ' গ্রহণ করিয়াই ফেলিয়াছেন। আমার আপত্তির বড় একটা কারণ দূর হইয়া গিয়াছে। একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের অভাবেই যে জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশনে অব্যবস্থা চলিতেছিল, এবং সে অবস্থার দরুনই যে রপ্তানির ব্যাপারে বিদেশী খরিদ্দারদের সাথে চুক্তিভংগ ঘটিয়াছিল, মন্ত্রণালয় স্থাপনের পর আশা করি তেমন একটিও গাফলতি আর হইবে না। তবে আলোচ্য হ্যান্ড আউটে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৭২-৭৩ সালে ৩০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানি করার কথা ছিল; কর্পোরেশন সে স্থলে ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার বেল রপ্তানি করিয়াছে। এই প্রায় দুই লক্ষ বেল কম রপ্তানি করাতেও আমাদের নাকি কোনও লোকসান হয় নাই। হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে, ৩০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানি করিয়া একশত কোটি বিদেশী মুদ্রা অর্জনের কথা ছিল। সে স্থলে কর্পোরেশন ২৮ লক্ষ বেল রপ্তানি করিয়াই এক শ' চার কোটি সত্তর লক্ষ টাকা অর্জন করিয়াছে। 'লাভ-লোকসানের' ধারণা যদি আমাদের পাট দফতরের এমন হয়, তবে ত বিপদের কথা। যাহোক, ভবিষ্যতে বিদেশী বাজারে পাটের দাম বাড়িয়া গেলে কম পাট রপ্তানি করিয়া অমন 'লাভ' যাতে আমাদের পাট রপ্তানি কর্পোরেশন আর না করেন, সেদিকে মন্ত্রনালয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

তারপর থাকিল পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটা। সরকারী হ্যাণ্ড আউটে আমার হিসাবের ভুল দেখাইতে যত শক্তি ব্যয় করা হইয়াছে, আমাদের পাট পাচারের প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিকে তত শক্তি ব্যয় করা হয় নাই। বস্তুতঃ, ভারতে পাটের দাম ৫৭/৫৮ টাকা হইলেও আমাদের টাকায় তার দাম ১১৪ কি ১১৬ টাকা। সে দাম যে আমাদের পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশি এবং তা যে স্মাগলিং-এর উস্কানি দিতে পারে, সরকার সে বিপদের বিচার করেন নাই। চোরাচালানই যে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো চুরমার করিয়া ফেলিতেছে, সম্প্রতি আমাদের স্টেট ব্যাংকের গবর্ণরও সে কথা বলিয়াছেন। আমাদের নির্ধারিত দামটা যে পাটের চোরাচালানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎসাহ যোগাইবে, সরকারী হ্যাণ্ড আউটে সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয় নাই। এ সম্পর্কে বিলাতী পাট খরিদ্দারের কলিকাতার বাজার হইতে বাংলাদেশের পাট খরিদের কথাটাকে হ্যাণ্ড আউটে ভিত্তিহীন গুজব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী ধারণাই সত্য হউক। কিন্তু বর্ডার-প্যাক্ট চালু থাকাবস্থায় চোরাচালানের সমস্ত অভিযোগকেও সরকার ভিত্তিহীন গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐসব অভিযোগের 'ভিত্তি' পাওয়া যাওয়ায় সরকার অবশেষে বর্ডার-প্যাক্ট বাতিল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বিলাতী খরিদ্দারের কলিকাতায় পাট কিনিবার 'গুজবটা'র অবস্থাও তাই না হয়, সেদিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। কলিকাতার বাজারে বাংলাদেশের পাট বিক্রির 'গুজবের' সাথে আমি চামড়া কিনার 'গুজবের' কথাও বলিয়াছিলাম! চামড়াটা পাট দফতরের এলাকায় পড়ে না

বলিয়াই বোধহয় হ্যাণ্ড আউটে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট দফতরকে দিয়া তারও একটা প্রতিবাদের ব্যবস্থা করিবেন কি?

এইবার জুট ইন্টারন্যাশনালের কথাটায় আসা যাক। আমাদের জুট বিভাগের সেক্রেটারি ও পাট সমিতির চেয়ারম্যান কোনও সভায় উপস্থিত থাকিলেই সেটা আর 'গোপন' হইতে বা থাকিতে পারে না, এটা আমি সবিনয়ে মানিয়া লইলাম। কিন্তু জিনিসটা কি হইয়াছে, দেশবাসীকে সেটা বুঝাইয়া দেওয়া তাঁদের উচিত ছিল। এ কাজটি তাঁরা করেন নাই। রোম হইতে প্রকাশিত রিপোর্টটি নিশ্চয়ই তারা পড়িয়াছেন। প্রস্তাবিত গবেষণা কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত হইবে। এটাকে লোভনীয় করিবার উদ্দেশ্যে হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে, বাজেটের প্রায় ৫০ ভাগ টাকাই গবেষণা কেন্দ্রে খরচ করা হইবে। কথাটার মধ্যে একটু কারচুপি আছে। বাজেটের শতকরা দশ টাকা হেড অফিস পরিচালনে ব্যয় হইবে। বাকি নব্বই টাকাই 'কমবেশি' 'প্রায়' আধাআধি ভাগ করিয়া ঢাকা ও দিল্লীতে ব্যায় করা হইবে। তার মানে দিল্লী পাইবে পঞ্চান্ন আর ঢাকা পাইবে পঁয়তাল্লিশ। শুধু ব্যয়ের দিক হইতেই যে দিল্লী বড় শরিক, তা নয়। এলাকা ও ক্ষমতার দিক হইতেও বড় তরফ। ঢাকা হইবে রিসার্চ সেন্টার, গবেষণা কেন্দ্র। দিল্লী হইবে প্রমোশনাল সেন্টার, প্রচার ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কার্যতঃ হইয়াছেও একটা দুই শরিকের পরিবার। নেপাল ও থাইল্যাণ্ড সেই 'দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছে।' একটু বিচার-বিমর্শ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে 'জুট ইন্টারন্যাশনাল' মোটেই ইন্টারন্যাশনাল নয়। পাট, কেনাফ ও এই জাতীয় তন্তু উৎপাদনকারী দেশ দুনিয়ায় ষোলটি। যে সব দেশ শুধু পাট অথবা পাট ও কেনাফ দুইটাই উৎপাদন করে, এমন দেশের সংখ্যা নয়টি। তার মধ্যে মাত্র চারটিকে লইয়া এই জুট ইন্টারন্যাশনাল। ব্রাজিল, বার্মা ও ফরমোজাকে না ডাকিবার বা তাদের অনুপস্থিতির কোনও কারণ নাই। আর গণ-চীনকে ডাকিলে যে আসিত না, তাও মনে হয় না। গণচীন তার টেবিল-টেনিস খেলায় ফরমোজাকে দাওয়াত দিতেছে এবং সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আগেই বা ব্যতিরেকেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের নজিরের অভাব নাই। তাছাড়া বাংলাদেশ ছাড়া জুট ইন্টারন্যাশনালের সব দেশের সাথেই তো গণ-চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। আর ব্যাপারটাও ত বাংলাদেশ গণ-চীনের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার হইত না। এটা হইত বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই এমন বহু দেশের সাথে জোটনিরপেক্ষ আলজিয়ার্স সম্মিলনীতে বাংলাদেশ যোগদান করিয়াছে। এ অবস্থায় ভারত ও বাংলাদেশের পরেই যে গণ-চীন বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ, তাকে জুট ইন্টারন্যাশনালে কেন দেওয়া হইল না, তার কোনও কারণ জানান হয় নাই।

এইভাবে নয়টি দেশের মধ্যে মাত্র চারটিকে লইয়া জুট ইন্টারন্যাশনাল করা হইয়াছে। এই চারটির মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের উৎপাদন ও রফতানি বেশি বলিয়াই বোধ হয় বোর্ড-অব-ডাইরেক্টরেও বেশি আসন দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ বছরের জন্য বোর্ড গঠনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাতে ভারত চারজন, বাংলাদেশ চারজন, নেপাল ও

কথার কোনও অর্থ হয় না। সে যা-ই হউক, সরকার যদি ইতিমধ্যে একটি পাট মন্ত্রণালয় স্থাপন করিয়া ফেলিয়া থাকেন, তবে এ সংক্রান্ত আমার 'মূল্যবান পরামর্শ' গ্রহণ করিয়াই ফেলিয়াছেন। আমার আপত্তির বড় একটা কারণ দূর হইয়া গিয়াছে। একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের অভাবেই যে জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশনে অব্যবস্থা চলিতেছিল, এবং সে অবস্থার দরুনই যে রপ্তানির ব্যাপারে বিদেশী খরিদ্দারদের সাথে চুক্তিভংগ ঘটিয়াছিল, মন্ত্রণালয় স্থাপনের পর আশা করি তেমন একটিও গাফলতি আর হইবে না। তবে আলোচ্য হ্যান্ড আউটে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৭২-৭৩ সালে ৩০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানি করার কথা ছিল; কর্পোরেশন সে স্থলে ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার বেল রপ্তানি করিয়াছে। এই প্রায় দুই লক্ষ বেল কম রপ্তানি করাতেও আমাদের নাকি কোনও লোকসান হয় নাই। হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে, ৩০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানি করিয়া একশত কোটি বিদেশী মুদ্রা অর্জনের কথা ছিল। সে স্থলে কর্পোরেশন ২৮ লক্ষ বেল রপ্তানি করিয়াই এক শ' চার কোটি সত্তর লক্ষ টাকা অর্জন করিয়াছে। 'লাভ-লোকসানের' ধারণা যদি আমাদের পাট দফতরের এমন হয়, তবে ত বিপদের কথা। যাহোক, ভবিষ্যতে বিদেশী বাজারে পাটের দাম বাড়িয়া গেলে কম পাট রপ্তানি করিয়া অমন 'লাভ' যাতে আমাদের পাট রপ্তানি কর্পোরেশন আর না করেন, সেদিকে মন্ত্রনালয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

তারপর থাকিল পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটা। সরকারী হ্যাণ্ড আউটে আমার হিসাবের ভুল দেখাইতে যত শক্তি ব্যয় করা হইয়াছে, আমাদের পাট পাচারের প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিকে তত শক্তি ব্যয় করা হয় নাই। বস্তুতঃ, ভারতে পাটের দাম ৫৭/৫৮ টাকা হইলেও আমাদের টাকায় তার দাম ১১৪ কি ১১৬ টাকা। সে দাম যে আমাদের পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশি এবং তা যে স্মাগলিং-এর উস্কানি দিতে পারে, সরকার সে বিপদের বিচার করেন নাই। চোরাচালানই যে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো চুরমার করিয়া ফেলিতেছে, সম্প্রতি আমাদের স্টেট ব্যাংকের গবর্ণরও সে কথা বলিয়াছেন। আমাদের নির্ধারিত দামটা যে পাটের চোরাচালানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎসাহ যোগাইবে, সরকারী হ্যাণ্ড আউটে সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয় নাই। এ সম্পর্কে বিলাতী পাট খরিদ্দারের কলিকাতার বাজার হইতে বাংলাদেশের পাট খরিদের কথাটাকে হ্যাণ্ড আউটে ভিত্তিহীন গুজব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী ধারণাই সত্য হউক। কিন্তু বর্ডার-প্যাক্ট চালু থাকাবস্থায় চোরাচালানের সমস্ত অভিযোগকেও সরকার ভিত্তিহীন গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐসব অভিযোগের 'ভিত্তি' পাওয়া যাওয়ায় সরকার অবশেষে বর্ডার-প্যাক্ট বাতিল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বিলাতী খরিদ্দারের কলিকাতায় পাট কিনিবার 'গুজবটা'র অবস্থাও তাই না হয়, সেদিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। কলিকাতার বাজারে বাংলাদেশের পাট বিক্রির 'গুজবের' সাথে আমি চামড়া কিনার 'গুজবের' কথাও বলিয়াছিলাম! চামড়াটা পাট দফতরের এলাকায় পড়ে না

বলিয়াই বোধহয় হ্যাণ্ড আউটে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট দফতরকে দিয়া তারও একটা প্রতিবাদের ব্যবস্থা করিবেন কি?

এইবার জুট ইন্টারন্যাশনালের কথাটায় আসা যাক। আমাদের জুট বিভাগের সেক্রেটারি ও পাট সমিতির চেয়ারম্যান কোনও সভায় উপস্থিত থাকিলেই সেটা আর 'গোপন' হইতে বা থাকিতে পারে না, এটা আমি সবিনয়ে মানিয়া লইলাম। কিন্তু জিনিসটা কি হইয়াছে, দেশবাসীকে সেটা বুঝাইয়া দেওয়া তাঁদের উচিত ছিল। এ কাজটি তাঁরা করেন নাই। রোম হইতে প্রকাশিত রিপোর্টটি নিশ্চয়ই তারা পড়িয়াছেন। প্রস্তাবিত গবেষণা কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত হইবে। এটাকে লোভনীয় করিবার উদ্দেশ্যে হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে, বাজেটের প্রায় ৫০ ভাগ টাকাই গবেষণা কেন্দ্রে খরচ করা হইবে। কথাটার মধ্যে একটু কারচুপি আছে। বাজেটের শতকরা দশ টাকা হেড অফিস পরিচালনে ব্যয় হইবে। বাকি নব্বই টাকাই 'কমবেশি' 'প্রায়' আধাআধি ভাগ করিয়া ঢাকা ও দিল্লীতে ব্যায় করা হইবে। তার মানে দিল্লী পাইবে পঞ্চান্ন আর ঢাকা পাইবে পঁয়তাল্লিশ। শুধু ব্যয়ের দিক হইতেই যে দিল্লী বড় শরিক, তা নয়। এলাকা ও ক্ষমতার দিক হইতেও বড় তরফ। ঢাকা হইবে রিসার্চ সেন্টার, গবেষণা কেন্দ্র। দিল্লী হইবে প্রমোশনাল সেন্টার, প্রচার ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কার্যতঃ হইয়াছেও একটা দুই শরিকের পরিবার। নেপাল ও থাইল্যাণ্ড সেই 'দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছে।' একটু বিচার-বিমর্শ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে 'জুট ইন্টারন্যাশনাল' মোটেই ইন্টারন্যাশনাল নয়। পাট, কেনাফ ও এই জাতীয় তন্তু উৎপাদনকারী দেশ দুনিয়ায় ষোলটি। যে সব দেশ শুধু পাট অথবা পাট ও কেনাফ দুইটাই উৎপাদন করে, এমন দেশের সংখ্যা নয়টি। তার মধ্যে মাত্র চারটিকে লইয়া এই জুট ইন্টারন্যাশনাল। ব্রাজিল, বার্মা ও ফরমোজাকে না ডাকিবার বা তাদের অনুপস্থিতির কোনও কারণ নাই। আর গণ-চীনকে ডাকিলে যে আসিত না, তাও মনে হয় না। গণচীন তার টেবিল-টেনিস খেলায় ফরমোজাকে দাওয়াত দিতেছে এবং সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আগেই বা ব্যতিরেকেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের নজিরের অভাব নাই। তাছাড়া বাংলাদেশ ছাড়া জুট ইন্টারন্যাশনালের সব দেশের সাথেই তো গণ-চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। আর ব্যাপারটাও ত বাংলাদেশ গণ-চীনের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার হইত না। এটা হইত বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই এমন বহু দেশের সাথে জোটনিরপেক্ষ আলজিয়ার্স সম্মিলনীতে বাংলাদেশ যোগদান করিয়াছে। এ অবস্থায় ভারত ও বাংলাদেশের পরেই যে গণ-চীন বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ, তাকে জুট ইন্টারন্যাশনালে কেন দেওয়া হইল না, তার কোনও কারণ জানান হয় নাই।

এইভাবে নয়টি দেশের মধ্যে মাত্র চারটিকে লইয়া জুট ইন্টারন্যাশনাল করা হইয়াছে। এই চারটির মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের উৎপাদন ও রফতানি বেশি বলিয়াই বোধ হয় বোর্ড-অব-ডাইরেক্টরেও বেশি আসন দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ বছরের জন্য বোর্ড গঠনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাতে ভারত চারজন, বাংলাদেশ চারজন, নেপাল ও

থাইল্যাণ্ড একজন করিয়া মেম্বার পাইবে। দুইটি আন্তর্জাতিক সংস্থা দুইটি আসন পাইবে।

জুট ইন্টারন্যাশনালের মোট বার্ষিক বাজেট হইবে এক কোটি ডলার। চারটি মেম্বর দেশ এর অর্ধেক মানে পঞ্চাশ লাখ ডলার বহন করিবে। চারটি দেশের চাঁদার পরিমাণ হইবে পাট-কেনার হইতে অর্জিত বিদেশী মুদ্রার শতকরা এক টাকা। ১৯৬৮-৭০ এই তিন বছরের আয়ের গড়ের উপর এই হার ধরা হইবে। এই মুদ্দতে ভারতের রফতানির গড় কম-বেশি পাঁচ লাখ টন, আর বাংলাদেশের গড় এগার লাখ টন। কাজেই বাংলাদেশের দেয় চাঁদার পরিমাণ হইবে ভারতের দ্বিগুণ। আমাদের বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের দেয় চাঁদার পরিমাণ হইবে বার্ষিক প্রায় তিন কোটি টাকা। যদি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও পাট ব্যবহারকারী দেশগুলি প্রস্তাবিত অর্ধেক বাজেট বহন না করে, তবে মেম্বর দেশসমূহের চাঁদার হার বাড়াইতে হইবে। আলোচ্য সম্মিলনীর কার্য-বিবরণীতে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ তাঁদের সাধ্যমত চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা করিলেও পাট ব্যবহারকারী দেশের প্রতিনিধিরা কোনও ওয়াদা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁদের কথা এই আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাঁদার মধ্যেই তাঁদেরও অংশ আছে। আলাদা করিয়া চাঁদা দেওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন হইবে। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পাট ব্যবহারকারী দেশসমূহ চাঁদা দিতে সম্মত না হইলে মেম্বর দেশ চারটি কিভাবে বাজেট পূরণ করিবেন সেই চিন্তা করিতে থাকুন।

যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, সম্মিলনীর প্রস্তাবমত চাঁদা পক্ষগণের সবাই দিতে রাজী হইবেন, তবে বাংলাদেশকে প্রতি বছর তিন কোটি টাকা জুট ইন্টারন্যাশনালের তহবিলে দিয়া যাইতে হইবে। তবেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, এত টাকার প্রতিদান বাংলাদেশ পাইবে কি না? ধরা যাক, এই তিন কোটির শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ গবেষণা কাজে ঢাকায় ও বাকি পঞ্চান্ন টাকা প্রপ্যাগেণ্ডা ও মার্কেটিং-এ দিল্লীতে খরচ হইবে। দিল্লী হইতে প্রচার ও বাজার সন্ধান চালাইলে বাংলাদেশের পাটের কি লাভ হইবে, সেটা আগাম গণনা করার সাধ্য আমার নাই। তবে ৪৫ ভাগ, মানে তিন কোটির সোওয়া কোটি টাকায় পাট গবেষণার কাজ কতটুকু হইবে, সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যায়।

১৯৬০ সালে যে জুট ইনকুয়ারি কমিশন রিপোর্ট দিয়াছিল, তাতেই বলা হইয়াছিল ইংলণ্ড, আমেরিকা ও বেলজিয়ামে ৫২ প্রকারের পাটজাত দ্রব্য আবিষ্কার করা হইয়াছে। সে সবের অনেকগুলিই বাংলাদেশের গবেষণাগারে হইতে পারে। তাছাড়াও বাংলাদেশের জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও সায়েন্টিফিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরির পাট বিজ্ঞানীরা পাটের শোলা, পাটের শিকড়, পাটের বীজ, পাটের পাতা এবং বরবাদী পাট (জুট-ওয়েস্ট) হইতে পেপার পাল্প, বোর্ড পাল্প, রেয়ন পাল্প, ডিসলভিং পাল্প, লং ফাইবার পাল্প, মেকানোকেমিক্যাল পাল্প, উন্নত মানের নিউজপ্রিন্ট পাল্প, পাট-তুলা ও পাটপশম (কটনিং ও উলিং অব জুট) ইত্যাদি বহু প্রকারের পাটজাত দ্রব্যও ঔষধপত্র তৈয়ারীর ল্যাবরেটরি-টেস্টেরে আবিষ্কার করিয়াছেন। এগুলি এখন ফিল্ড টেস্ট বা ক্ষেতে-খামারে টেস্ট করিবার অপেক্ষায় আছে। পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা এ বাবত

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাহিয়া কত আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন। এক কোটি-দেড় কোটি টাকা সাহায্য পাইলেই আমাদের বিজ্ঞানীরা এইসব আবিষ্কারের ফিল্ড টেস্ট করিয়া এতদিনে এর অনেকগুলিই কমার্শিয়াল ইউটিলিজেশনের, বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী বিপুল উৎপাদনে পরিনত করিতেন। এই দুই গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের মত এই যে, জুট ইন্টারন্যাশনালে বাংলাদেশ সরকার যে প্রায় তিন কোটি টাকা বার্ষিক চাঁদা দিবেন, তার পুরাটা হইলে ত কথাই নাই। অর্ধেক টাকা পাইলেও তারা তাদের আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির ফিল্ড টেস্টের কাজ সমাধা করিতে পারেন।

এ অবস্থায় এঁদেরে অর্থ সাহায্য না করিয়া জুট ইন্টারন্যাশনালকে অত টাকা চাঁদা দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? বাংলাদেশের চাঁদার অর্ধাংশ দিয়া এখানে জুট ইন্টারন্যাশনালের যে গবেষণা কেন্দ্র হইবে, তার পরিণামে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে; (১) আমাদের জাতীয় গবেষণাগারগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে; (২) আমাদের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ-দিনের সাধনা-গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক মালিকানায় চলিয়া যাইতে পারে; (৩) জাতীয় গবেষণা ও আন্তর্জাতিক গবেষণায় ওভারল্যাপিং তার মানে অপচয় হইতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেই মোটামুটি বোঝা গেল যে, জুট ইন্টারন্যাশনালের গবেষণা কেন্দ্র হইতে বাংলাদেশ আশানুরূপ সাহায্য না-ও পাইতে পারে। বরঞ্চ কোন কোন দিকে ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। আরও বোঝা গেল যে, জুট ইন্টারন্যাশনালের আকৃতি-প্রকৃতি ও প্রতিনিধিত্ব এটাকে শেষ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ ও নেপালের ত্রিদেশীয় সংস্থায় পরিণত করিতে পারে। জুট ইন্টারন্যাশনালের এলাকা শেষ পর্যন্ত যদি এই উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ হয়ও তথাপি এর দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি। এটাই আমার মত। গত নিবন্ধেই আমি সে কথা বলিয়াছি। আমি বরাবর ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মৈত্রী সহযোগিতার মাধ্যমে উপমহাদেশীয় ইকনমিক কমিউনিটির কথা বলিয়া আসিতেছি। এই আকার-প্রকারের জুট ইন্টারন্যাশনাল তার বিরোধী ত নয়ই, বরঞ্চ প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। সরকার আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করিতেছেন বলিয়াও আলোচ্য হ্যাণ্ড-আউটে বলা হইয়াছে। এটা খোশখবর। কিন্তু এটা করিতে গেলে গত নিবন্ধে আমার প্রস্তাব মতো ভারত-বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হইবে। সে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাটের প্রমোশনাল সেন্টারটি দিল্লীতে স্থাপিত হওয়ার কোনও সার্থকতা নাই। স্মরণ রাখা দরকার যে, পাকিস্তানী আমলে আমাদের জুটবোর্ডই একটি আন্তর্জাতিক প্রমোশনাল সেন্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করার দাবি ফাও-এর কাছে পেশ করিয়াছিল ১৯৬৮ সালে। বাংলাদেশের দাবি কাজেই অগ্রগণ্য।

৩রা সেপ্টেম্বর '৭৩

ইমার্জেন্সি বিধান ইমার্জেন্সি আনে
নিরাপত্তা আইন নিরাপত্তা হানে

আমাদের সরকার ইমার্জেন্সি ক্ষমতা হাতে লইয়াছেন। বিনা বিচারে বন্দী করিবার আইন প্রণয়নেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দুইটি উদ্দেশ্যে সরকার আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান সংশোধন করিয়াছেন। তার মানে, আমাদের সংবিধানে এই দুইটি ক্ষমতা আগে ছিল না। সরকার এই দুইটি ক্ষমতা গ্রহণ করায় অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে।

অথচ এই দুইটির একটিরও কোনও অসাধারণ ব্যাপার নয়। অনেক পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দেশেই ইমার্জেন্সি ঘোষণা করিবার এবং নিবর্তনমূলক আটক করিবার অধিকার সরকারের আছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র দুনিয়ার বৃহত্তম পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দেশ ভারতেও আছে। উপমহাদেশের তৃতীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানেও আছে। এই সেইদিন পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে হিসাবে ইমার্জেন্সি ও বিনা বিচারে বন্দী আইনের সহিত আমরা বহুকাল বসবাস করিয়াই আসিতেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে দেখিতেছিও। তবে আমাদের সরকার এই দুইটি ক্ষমতা হাতে নেওয়াতেই আমরা এত হৈচৈ শুরু করিয়াছি কেন?

তার কারণ আছে। আমাদের সরকারের এ কাজের একাধিক তাৎপর্য আছে। সে কারণ ও তাৎপর্য সরকারের আচরণের মধ্যেই নিহিত। সংক্ষেপে তারই আলোচনা করা যাক।

এই ক্ষমতা দুইটি আমাদের সংবিধানে ছিল না। এই সংবিধানটি রচনা করিয়াছেন বর্তমানের শাসক দল আওয়ামী লীগই। আওয়ামী লীগ গণপরিষদে প্রায় একক দল ছিলেন। এখন আওয়ামী লীগ দলই প্রায় এক বছরকাল বিচার-বিমর্শ করিয়া এই সংবিধান রচনা করিয়াছিলেন। সে বিচার-বিমর্শে তাঁরা দুনিয়ার সব পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সংবিধান কনসাল্ট, বিবেচনা ও তুলনা করিয়াছেন। সে বিচার ও তুলনা করিবার সময় স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ভারত শাসন আইন, স্বাধীনতার পরবর্তী ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধান তাঁদের সামনে ছিল। পাকিস্তানের সংবিধানের প্রতি আমাদের তেমন শ্রদ্ধা-আস্থা না থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানটি শ্রদ্ধার পাত্র ছিল।

পণ্ডিত জওয়াহের লালের মতো ফিলোসফার-ষ্টেটসম্যান ও পলিটিশিয়ানের নেতৃত্বাধীনে এই সংবিধানটি রচিত হইয়াছিল। আমাদের সংবিধান রচয়িতারা সাব-কমিটিতে ও গণপরিষদে বসিয়া নিশ্চয়ই ভারতীয় সংবিধানটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা

করিয়াছিলেন। মুসাবিদা রচনা শেষ করিয়া আমাদের তৎকালীন আইনমন্ত্রী সেটি ভারতের নেতৃবৃন্দ ও আইন বিশেষজ্ঞদের দেখাইয়াছিলেন। বিলাতের বিশেষজ্ঞদেরও আমাদের মুসাবিদাটি দেখান হইয়াছিল। সে মুসাবিদায় ইমার্জেন্সি ও প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের বিধান নাই দেখিয়া ভারতের নেতারা ও বিশেষজ্ঞরা এবং বিলাতের বিশেষজ্ঞরাও নিশ্চয়ই ইমার্জেন্সি ও প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের বিধানের প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের সংবিধান-রচয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

এখান হইতে সুস্পষ্ট কারণেই ইমার্জেন্সি ও প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ব্যাপার দুইটি পৃথক পৃথকভাবে বিচার করা দরকার। ইমার্জেন্সি বিধানটি যদি গণপরিষদ সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিত, তবে তাতে কারো আপত্তি থাকিতে পারিত না। প্রথমতঃ, ইমার্জেন্সি প্রভিশন ভারতসহ প্রায় সব পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সংবিধানেই আছে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে ইমার্জেন্সি প্রভিশন থাকা উচিত নয়, অথবা ইমার্জেন্সি বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের দেশ শাসন করা উচিত নয়, এমন কোন নির্বাচনী ওয়াদা, কমিটমেন্ট বা ঘোষিত মতবাদ আওয়ামী লীগের ছিল না। কাজেই অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টির মতই, বিশেষতঃ ভারতীয় কংগ্রেসের ন্যায় সংগ্রামী জনপ্রিয় পার্টির মতই, আওয়ামী লীগ আমাদের সংবিধানে ইমার্জেন্সি ঘোষণার বিধান করিতে পারিত। সেটাকে তখন দোষের কাজ বলা যাইত না। কিন্তু এখন বলা যায়। আওয়ামী লীগ-প্রধান গণপরিষদ যখন সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইমার্জেন্সি বিধানহীন সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করিয়াছিল, তখন নিঃসন্দেহে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, ভারতের কংগ্রেস রচিত সংবিধানে ও পাকিস্তানের আইউবী সংবিধানের ইমার্জেন্সি বিধান থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সংবিধানে ঐ বিধান রাখা যুক্তিযুক্ত বা আবশ্যক মনে করেন নাই। দুই কারণে আওয়ামী নেতৃত্ব এমন সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিতে পারেন। হয়, ইমার্জেন্সি প্রভিশনকে তাঁরা আদর্শ গণতন্ত্রের বিরোধী মনে করিয়াছিলেন অথবা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে ইমার্জেন্সির নজির থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ইমার্জেন্সি ধারাবিহীন খাঁটি ও নিরংকুশ গণতান্ত্রিক সংবিধান বলে দেশ শাসন করিয়া গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় একটা আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। পাকিস্তানী নেতাদেরে ত বটেই, ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকেও আওয়ামী লীগ-নেতৃত্ব বলিতে চাহিয়াছিলেন: 'হে কংগ্রেস, হে মুসলিম লীগ, তোমরা যা পার নাই, আমরা আওয়ামী লীগাররা তাই সাধন করিলাম। আমরা ইমার্জেন্সি পাওয়ার ছাড়া দেশ শাসন করিতে পারিতেছি।' এটা করিতে পারিলে আওয়ামী লীগ যে পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় সত্যই একটা অনুকরণীয় নয়া নজির স্থাপন করিত, তা স্বীকার করিতেই হইবে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এমন আশা দুঃসাহসিক দুরাশা হইতে পারে। অবাস্তব আদর্শবাদও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এটাই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একমাত্র দুরাশা নয়। অন্ততঃ আরেকটা ব্যাপারে আওয়ামী লীগ দুনিয়ায় নজির স্থাপন করিবার

আশা করিতেছে। সে আশা গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যাপারে তাঁরা এমন দুঃসাহস করিয়াছেন যে, গণতন্ত্র ও সমাজবাদ উভয়টাকেই তাঁরা সংবিধানেই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। অন্য দেশ ত পরের কথা, গণতন্ত্রের পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রবক্তা দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত নেহরুর ভারতেও সমাজবাদকে সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি করা হয় নাই।

এ অবস্থায় আজন্ম গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী আওয়ামী লীগ যদি বিনা-ইমার্জেন্সি-ক্ষমতায় দেশ শাসন করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে সেটা কোনমতেই অচিন্তনীয় ছিল না। বরং আওয়ামী লীগের যোগ্য কাজই ছিল। কাজেই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় যে ইমার্জেন্সি পাওয়ারের বিধান রাখা হয় নাই, এটাকে 'ভুলে বাদ পড়িয়া যাওয়ার' ব্যাপার বলা যাইতে পারে না। বরঞ্চ নিঃসন্দেহেই বলা চলে, নেতারা ভাবিয়া-চিন্তিয়া বুঝিয়া শুনিয়াই ওটা বাদ দিয়াছিলেন। সে বাদ দেওয়ার মধ্যে বিনা-ইমার্জেন্সি-পাওয়ারে দেশ শাসনের একটা দৃঢ় সংকল্প ছিল।

এক বছর না যাইতেই আওয়ামী লীগ-নেতৃত্বের সে দৃঢ় সংকল্প গেল কোথায়? কেন গেল? গেল ত গেল একেবারে সুইং করিয়া উল্টাদিকে চলিয়া গেল কেন? আমাদের ইমার্জেন্সি পাওয়ার সত্য সত্যই তিনটি ব্যাপারে ভারতের ইমার্জেন্সি পাওয়ার ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় সংবিধানে শুধু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিপন্ন হইলেই ইমার্জেন্সি বা আপৎকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যাইবে। শুধু এমন আপৎকালেই নাগরিকদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইট্‌স্ স্থগিত রাখা যাইবে। অর্থনৈতিক আপদের দরুন ইমার্জেন্সি ঘোষণার বিধান ভারতে করা হইয়াছে সংবিধানের অন্য এক ধারায় পৃথকভাবে। সে ইমার্জেন্সিতে নাগরিকদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস স্থগিতের বিধান করা হয় নাই।

অথচ আমাদের ইমার্জেন্সি ঘোষণার বিধান করা হইয়াছে একই অনুচ্ছেদে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অর্থনৈতিক আপদ এই তিন কারণের ইমার্জেন্সির জন্য একই বিধান করা হইয়াছে। একই অনুচ্ছেদে ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস স্থগিতের বিধান করা হইয়াছে। তার মানে, অর্থনৈতিক আপদের ইমার্জেন্সি মুদ্দতেও আমাদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস থাকিবে না।

ভারতের ইমার্জেন্সি আইনের সাথে আমাদের দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, ভারতের ইমার্জেন্সির মেয়াদ দুই মাস। আমাদের চার মাস।

ভারত ও আমাদের ইমার্জেন্সি আইনের তৃতীয় পার্থক্য এই যে, ইমার্জেন্সি মুদ্দতে রচিত আইনসমূহ ভারতে ঐ মুদ্দতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু বাংলাদেশে সে সব আইন স্থায়ী আইনে পরিণত হইবে। মৌলিক অধিকার বিরোধী কোনও আইন বলবৎ হইবে না বলিয়া আমাদের সংবিধানে ২৬ নম্বরের যে অনুচ্ছেদটি আছে, ইমার্জেন্সি মুদ্দতে রচিত আইন সম্বন্ধে সে অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া যে বিধান করা হইয়াছে তাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

এইবার আসুন প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের নয়া বিধানটির আলোচনা করা যাক। আমাদের মূল সংবিধানে বিনা-বিচারে বন্দী করিবার বিধান ছিল না, এটা আওয়ামী লীগের দুই দশকের ঘোষিত মূলনীতি অনুসারেই করা হইয়াছিল। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে 'ইউটোপিয়ান' অবাস্তব আদর্শবাদী পার্টি বলা যাইতে পারে না। কারণ, নিরাপত্তা আইন ছাড়া দেশ শাসন করার দাবি আওয়ামী লীগের মুখে শুধু বাত-কি-বাত ছিল না। কাজে-কর্মে আওয়ামী লীগ এটা প্রমাণ করিয়াছে। পাঠকগণের অনেকেরই স্মরণ আছে, ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পুরা দুইটা বছর আওয়ামী লীগ বিনা-নিরাপত্তা আইনে এবং বিনা-রাজবন্দীতে পূর্ব পাকিস্তান শাসন করিয়াছিল। জনাব আতাউর রহমান খাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বে এই সময় যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, তাতে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বর্তমান মন্ত্রিসভার দুই-তিনজন মন্ত্রী ছিলেন। এই মন্ত্রিসভা হলফ নিবার পর প্রথম যে সরকারি কাজটি করিয়াছিলেন তা ছিল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা এবং সমস্ত রাজবন্দীকে খালাস দেওয়া। এরপর এই মন্ত্রিসভা যে প্রায় দুই বছরকাল পূর্ব পাকিস্তান শাসন করিয়াছিলেন সে সময় নিরাপত্তা আইনে কাউকে গ্রেফতার করা হয় নাই। নিরাপত্তা আইনে এত দীর্ঘদিন কাউকে গ্রেফতার না করা সত্ত্বেও এই মুদ্দতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় নাই। তাতে এটাও প্রমাণিত হইয়াছিল যে, এই মুদ্দতে পূর্ব পাকিস্তানে 'রাষ্ট্রের দুশমন'ও কেউ ছিল না। আরেকটা ব্যাপারও এতে বোঝা গিয়াছিল যে, দেশে নিরাপত্তা আইন থাকিলেই রাষ্ট্রের দুশমনও থাকে। আইন না থাকিলে দুশমনও থাকে না। তারমানে, নিরাপত্তা আইনই রাষ্ট্রের দুশমন সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নষ্ট করে।

এই অভিজ্ঞতার বলেই আওয়ামী লীগ সংবিধানে নিরাপত্তা আইনের বিধান রাখে নাই। এই বিশ্বাসেই আওয়ামী লীগ প্রায় দুই বছরকাল নিরাপত্তা আইন ছাড়াই স্বাধীন বাংলাদেশ শাসন করিয়াছে। একক পার্টি হিসাবে প্রায় একনায়কত্বের মাধ্যমে দুই বছর দেশ শাসন করার পর যখন আওয়ামী লীগ নিজের নিন্দিত নিরাপত্তা আইনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, আওয়ামী লীগ তার বিশ বছরের মতবাদ পরিবর্তন করিয়াছে। দুই বছরের অভিজ্ঞতায় যখন বিশ বছরের মতবাদ ছাড়িতে হইয়াছে, তখন এটাও বুঝিতে হইবে যে, বিপরীত তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই আওয়ামী লীগ তার আজন্ম-পোষিত আদর্শবাদ বিশ বছর পরে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। এই তিক্ত অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতাটা এই যে, নিরাপত্তা আইন ছাড়া, অর্থাৎ বিরোধী পক্ষকে বিনা বিচারে আটক না রাখিয়া দেশ শাসন করা চলে না।

মাত্র দুই বছরের অভিজ্ঞতায় বিশ বছরের মতবাদ ছাড়িতে বাধ্য হওয়া সকলের জন্যই একটা দুঃখজনক বিরাট পরাজয়। আওয়ামী লীগের জন্য এটা আরও বেশি দুঃখজনক। কারণ, আওয়ামী লীগের বিশ বছরের মতবাদটা দুই বছরের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত ছিল।

পনর বছর আগের দুই বছরের অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগের বিশ বছরের আদর্শবাদের সমর্থক ছিল। অথচ পনর বছর পরের দুই বছরের অভিজ্ঞতা সে

আদর্শবাদের বিরোধী হইল। এটা হইতে পারিল কিরূপে? পনর বছর আগে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ছিল সীমিত। তাঁরা ছিলেন তখন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার একটা প্রাদেশিক সরকার। মাথার উপরে ছিল তাঁদের একটা স্ট্রংসেন্টার। সে স্ট্রংসেন্টারের হাতে ছিল একটা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা আইন। তেমন স্ট্রংসেন্টারও যেখানে নিরাপত্তা আইন ছাড়া দেশ শাসন করিতে সাহস পায় নাই, সেখানে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক সরকারের সীমিত ক্ষমতার জোরেই বিনা-নিরাপত্তা আইনে দেশ শাসন করিতে পারিয়াছিল। জনগণের প্রতি, প্রদেশের পুলিশ বাহিনীর প্রতি এবং সর্বোপরি প্রদেশের হাইকোর্টসহ সমস্ত আদালতের প্রতি কি অখণ্ড আস্থা থাকিলে সরকার বিনা-নিরাপত্তা আইনে দেশ শাসন করিবার সাহস পান, তা সহজেই অনুমেয়। পনর বছর আগে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বুকে সেই সাহস ছিল; কারণ, তাঁদের মনে ঐ আস্থাও ছিল। আজ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বুকের সে সাহস গেল কোথায়? নিশ্চয়ই সম্প্রতি দুই বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাঁদের সে সাহস ডুবিয়া গিয়াছে।

এটা ঘটিল কিরূপে? পনর বছর আগের দুই বছরের অভিজ্ঞতা এবং পনর বছর পরে দুই বছরের অভিজ্ঞতা দুই প্রকার হইল কেন? অথচ পনর বছর আগের অভিজ্ঞতা সীমিত ক্ষমতার অভিজ্ঞতা। আর পনর বছর পরের আজিকার অভিজ্ঞতা অবাধ ক্ষমতার অভিজ্ঞতা। এই অবাধ ক্ষমতায় গোটা দেশবাসী আওয়ামী লীগের পিছনে সংঘবদ্ধ সুশৃংখল কাতার-বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস হইতে রাস্তার মানুষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জনতার সে আনুগত্যের মধ্যে কোনও ফাটল ছিল না। তবু আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলার দুই বছরের মন্ত্রীসভায় নিরাপত্তা আইনের প্রয়োজন বোধ করিল কেন? তার মানে, সেই হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস হইতে রাস্তার মানুষের ঐক্যবদ্ধ জনতার প্রতি আস্থা হারাইল কেন?

উত্তর অতি সোজা। সাম্প্রতিক দুই বছর আওয়ামী লীগ আসলে বিনা-নিরাপত্তা আইনে দেশ শাসন করেন নাই। এই দুই বছর নামে-ঠিকানায় বাংলাদেশে নিরাপত্তা আইন ছিল না বটে, কিন্তু নিরাপত্তা আইনের বাবা-জ্যেঠা-ঠাকুরদাদা ছিল! আট আইন নিরাপত্তা আইনের বাবা। নয় আইন জ্যেঠা ও পঞ্চাশ আইন ঠাকুরদাদা। আইন ত নয়, এক একটি মুগুর।

মুগুর দিয়া দেশ শাসন করা যায় না, একথা আমি বলি না। বর্তমান বিশ্বেও বহু দেশ মুগুরে শাসিত হইতেছে এবং তা জনগণের দোহাই দিয়াই হইতেছে। কিন্তু এটা আওয়ামী লীগের পথ নয়। নিরাপত্তা আইনের বলে আর যারাই দেশ শাসন করুক, আওয়ামী লীগ পারে না।

পারে না এইজন্য যে, নিরাপত্তা আইনই পরিণামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করে। ইমার্জেন্সি ক্ষমতাই দেশে ইমার্জেন্সির জন্ম দেয়। খোদা আওয়ামী লীগকে এই বদনামের হাত হইতে রক্ষা করুন। আমিন।

৩রা অক্টোবর '৭৩

দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষণে আমরা যথা কর্তব্য করি নাই

দেশের সর্বত্রই অশান্তি। সার্বিক বিশৃংখলা। সরকারের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও আইন-শৃংখলার অবনতিই ঘটিতেছে। সরকার দৃশ্যতঃ যত কঠোর হইতেছেন, মন্ত্রীরা যতই মৌখিক দৃঢ়-সংকল্প হইতেছেন, নাগরিকরা ততই ভয়-ভীতিগ্রস্ত হইতেছেন। সরকার যতই ইমার্জেন্সি ও প্রিভেন্টিভ্ আইনে সুসজ্জিত হইতেছেন, নাগরিকরা ততই বিপর্যয়ের আশংকায় আতংকিত হইতেছেন।

সরকারের আন্তরিক চেষ্টা, উদ্যম ও অপজিশন নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার আশ্বাস সত্ত্বেও আইন-শৃংখলার পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হইতেছে কেন? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, কি সরকার, কি নেতৃবৃন্দ, কি নাগরিকগণ, আমাদের আইন-শৃংখলার অবনতির কারণ, প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন না। দিন-দুপুরে ব্যাংক লুট, দল বাঁধিয়া থানা ও খাদ্য গুমাদ লুট এবং সে লুটের খাদ্য জনগণে বিতরণ ইত্যাদি অপরাধের প্রকৃতি-নির্দেশক। ডজনে ডজনে পুলিশ ও অফিসার সাসপেণ্ড এর প্রতিকার নয়। ছাত্রে-ছাত্রে দাঙ্গা, ভার্সিটি হলের নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাই, অধ্যাপক-শিক্ষকদের সামনে সশস্ত্র ছাত্রদের অনুষ্ঠিত অপরাধও একই আইন-শৃংখলা ভঙ্গেরই অংগ। এই উভয় প্রকার অপরাধের প্রকৃতিই প্রায় অভিন্ন। উভয়ের মধ্যেই রাজনৈতিক অভিপ্রায় প্রতীয়মান। অপরাধপ্রবণ স্বভাবদুষ্টেরা হয়ত এই বিশৃংখলার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সেটা এইসব অপরাধের মুখ্য চরিত্র নয়। দেশবাসীর বিপুল মেজরিটি স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়। তার উপর গত তিন বছরে মানুষ অবিরাম অশান্তি ভুগিয়া ভুগিয়া শান্তি-শৃংখলার জন্য আকুল আগ্রহান্বিত। এই পরিবেশে পুলিশ যে 'দুষ্কৃতিকারী'দের শায়েস্তা করিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ তারাই দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা শায়েস্তা হইতেছে, সন্ধ্যা হইতেই তারা যে থানায় কারফিউ দিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, এ সবের গুরুতর ও গভীরতর কারণ আছে। বেচারা পুলিশ অফিসারদের সাসপেণ্ড করিয়া সে কারণের মূল আবিষ্কৃতি হইবে না। প্রতিকারও হইবে না। অপরের কাঁধে দোষ চাপাইয়া অন্য লোককে 'স্কেপগোট্' করিয়া আমরা নিজের দোষ ঢাকিতে পারিব না। তাতে সমস্যার সমাধানও হইবে না। অতীতের সব দুর্ভাগ্যের জন্য পাঞ্জাবীদেরে এবং বর্তমানের সকল অভাবের জন্য ভারতীয়দের দোষী করা যেমন অন্যায়, দৈনন্দিন বিশৃংখলার জন্য শুধু পুলিশের কর্তব্য-চ্যুতি ও 'দুষ্কৃতিকারী'দের দুষ্টমিকে দায়ী করিলেই চলিবে না। অথচ পরের উপর দোষ চাপানোটাই আমাদের নেতাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। পাঞ্জাবী 'দখলদার বাহিনী'টাই আমাদের শাসকদের সবচেয়ে সুবিধাজনক হ্যাণ্ডি স্কেপগোট। এটা তারা সব কাজে লাগান। সালুনেও লাগান, ব্যঞ্জনেও লাগান। অনেক সময় উদ্ভট ও হাস্যকররূপেও লাগান। নিজের দোষ অপরের কাঁধে চাপান শুধু একটা বাতিক নয়, কঠিন রোগও।

এমনি একটা বাতিকের নজির আমাদের তিন শ পোল ভাঙ্গার ব্যাপারে। নয় মাসের যুদ্ধে পাঞ্জাবী সৈন্যেরা আমাদের অনেক সর্বনাশ করিয়াছে সত্য। কিন্তু তিনশ' ভাঙ্গা পোলের সব কয়টা তারা ভাঙ্গিয়াছে, এটা ঠিক নয়। যুদ্ধের সময় নেতারা বিদেশে ছিলেন বলিয়া নিজ চক্ষে তাঁরা দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা দেখিয়াছেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' হইতে মন্ত্রীরাও নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অনেক পোল ভাঙ্গিয়া পাক-বাহিনী ও তাদের অস্ত্রবোঝাই ট্রাক-লরিকে অচল করিয়া দিয়াছিল, এটা স্বীকৃত সত্য। আমাদের গেরিলা বাহিনীর এটা কৃতিত্বের কথা। আমাদের এটা গৌরবের কথা। তবু পোল ভাঙ্গার গৌরবটা নেতারা কেন পাঞ্জাবীদের দিতেছেন? তাঁরা কি বুঝেন না, এতে একসঙ্গে তাঁরা দুইটা অন্যায় করিতেছেন? প্রথমতঃ, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের তাঁরা অপমান করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকারের তথ্যগত সত্যবাদিতা সম্পর্কে না-হক জনগণকে সন্দিহান করিতেছেন। এত বড় দুইটা সুস্পষ্ট অন্যায়ের কথা মন্ত্রীদের ভুলিয়া যাওয়ার বিষয় নয়। তবু তাঁরা যে এটা করিতেছেন, তা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য অপরকে দায়ী করিবার এ অভ্যাস হইতেই। পোল পাঞ্জাবীরাই ভাংগুক আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাই ভাংগুক, ওসব মেরামত করিতেই হইবে। তাতে পয়সা ও সময় ব্যয় হইবেই। যতদিন মেরামত শেষ না হয়, ততদিন আমাদের অসুবিধা ও কষ্ট থাকিবেই। পাঞ্জাবীদের বদলে মুক্তিফৌজ পোল ভাঙ্গিয়া থাকিলে বন্ধুরাষ্ট্ররা পোল মেরামতে আমাদেরে সাহায্য করিতেন না, তাও নয়। তবু পরের উপর দোষ চাপানোর প্রবণতা আমরা ছাড়িতে পারি না।

নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য যাঁরা পরকে দোষী করেন, নিজের অযোগ্যতার জন্যও তাঁরা পরকে দোষী করেন। অসহায় অধঃস্তন লোককে দোষী করার প্রবণতা তাদের আরও বেশি। সত্য স্বীকার ও বাস্তব উপলব্ধি তারা করিতে পারেন না। সত্য ও বাস্তবের সংগে যাঁরা চালাকি করিবেন, আইনের সাথে চালাকি করিবার প্রবণতা তাঁদের হইবেই। আমাদের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বুঝিতে হইলে তার বাস্তব দিকটাও বুঝিতে হইবে। সব ব্যর্থতার স্কেপগোট করা হইতে নিরস্ত হইতে হইবে। নিজেদের ভুল-ত্রুটি বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে। অধঃস্তন কর্মচারীদের দোষী না করিয়া নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব নিবার সাহস অর্জন করিতে হইবে। তবেই মনে, দেহে ও দেশে শান্তি আসবে। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় আইন-শৃংখলার দুইটা দিক। একটা আইন প্রয়োগের দিক, অপরটা পরিবেশের দিক। প্রথম দিকে আইন-শৃংখলার সংগঠন ও প্রশাসন। দ্বিতীয় দিকে সে সংগঠন প্রশাসনের কর্মক্ষেত্র। একদিকে পুলিশ, অপরদিকে সমাজ। আমার বিশ্বাস এই দুই দিকেই আমরা ভুল করিতেছি।

'আইন-শৃংখলার' ল' এণ্ড অর্ডারের রক্ষক ও গার্ডিয়ান পুলিশ। আমাদের দেশের পুলিশ উপমহাদেশের অন্য দুইটি রাষ্ট্রের মতই, বৃটিশ পুলিশ-সিস্টেমের হুবহু কপি। এই হিসাবে আমাদের পুলিশ বাহিনীর দোষ যতই থাকুক, গুণের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক

বেশি, এবং পরিমাণে অনেক ভারি। এর গুণের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, অপরাধী ধরার চেয়ে অপরাধ নিবারণই পুলিশের বড় কাজ। 'ডিটেকশন-অব-ক্রাইমের' চেয়ে 'প্রিভেনশন অব-ক্রাইমই' পুলিশের প্রাথমিক দায়িত্ব। এই দিক হইতে ১৮৬০ সালের পুলিশ এ্যাক্ট ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড) পুলিশ বাহিনীর সংগঠন, ক্ষমতা ও এলাকা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রায় এক শ' বছর ধরিয়া আমাদের পুলিশ বাহিনী আইন-শৃংখলা রক্ষায় দেশের একক গার্ডিয়ানের কাজ করিয়া আসিতেছে। পুলিশ বাহিনী পুলিশ রেগুলেশনের দ্বারা কড়াকড়িভাবে সুনিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম এর ব্যত্যয় দেখা যায়। আজ 'রক্ষীবাহিনী' নামে একটি ইউনিফরম পরা বাহিনীকে আমরা আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে পুলিশের শরিক দেখিতেছি। আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে রক্ষীবাহিনীর মতো একটি প্যারামিলিটারি (আধা-সামরিক) বাহিনীকে পুলিশের শরিক করা বুদ্ধিমত্তার কাজ হইয়াছে কি না, সরকার আশা করি এটা আবার বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পাকিস্তানী আমলে আমরা যে প্যারা-মিলিটারি একটি বাহিনী গঠনের দাবি করিতাম, তার কারণ ছিল সুস্পষ্ট। আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির ছয় নম্বর দাবিতে সেই প্যারা-মিলিটারি বাহিনী গঠনের সাংবিধানিক দাবি করা হইয়াছিল এবং তারও আগে যুক্তফ্রন্টের বিখ্যাত একুশ দফা দাবিতে সশস্ত্র ইউনিফর্মধারী আনসার বাহিনীর যে দাবি করা হইয়াছিল, এ দুইটাই করা হইয়াছিল পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর পূর্ব পাকিস্তানীদের কোনও হাত ছিল না বলিয়া। কি অফিসার স্তরে, কি সাংগঠনিক লেভেলে, কি রাজনৈতিক পর্যায়ে কোনও দিকেই সামরিক বাহিনীর উপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই অবস্থাগতিকে পাকিস্তানের সমর-নায়করা বলিতেন: 'ডিফেন্স অব ইষ্ট পাকিস্তান লাইয ইন ওয়েষ্ট পাকিস্তান তারা সোজাসোজি বলিতেন: পূর্ব পাকিস্তানে দাঁড়াইয়া পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করা যাইবে না। সে কাজ করিতে হইবে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে।' এসব কথার একাধিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ছিল; সেগুলির মীমাংসা ও সমাধান ছিল তর্ক ও সময় সাপেক্ষ। তাই পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা মধ্যপন্থারূপে এই প্যারা-মিলিটারি বাহিনীর দাবি তুলিয়াছিলেন। আজ আমরা স্বাধীন। আমাদের রাষ্ট্র সার্বভৌম। আমাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী আছে। এ অবস্থায় আমাদের রাষ্ট্রনায়করা কেন একটি স্বতন্ত্র প্যারা-মিলিটারি বাহিনী গঠন করিলেন, দেশবাসীকে আজো সে কথা বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। এই প্যারা-মিলিটারী বাহিনীকে সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ মতে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর এবং পুলিশ ও বি. ডি. আর বাহিনীর সমপর্যায়ের এবং সম-মর্যাদার 'শৃংখলা বাহিনীর' অন্তর্ভুক্ত করায় এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা ও আইন-শৃখলা রক্ষার কাজ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিল কি না, আশা করি সরকার বিশেষজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিবেন। সরকার আন্তরিকতার সংগে সার্বিক চেষ্টা চালাইয়াও যে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করিতে পারিতেছেন

না, দায়িত্বের দ্বৈত শাসন তার হেতু হইতে পারে বলিয়া আমার মনে পড়ায় এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

এটা অবশ্য শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলার গার্ডিয়ানদের সাংগঠনিক ব্যাপারের দিক। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ উম্মি একজন নাগরিক মাত্র। আমার এই বক্তব্যের মধ্যে একজন দেশপ্রেমিক শান্তিপ্রিয় নাগরিকের চিন্তাই প্রকট হইয়াছে; কোনও বিশেষজ্ঞের বক্তব্য প্রকাশ পায় নাই। সরকার এই রূপেই কথাগুলির বিচার করিবেন।

শান্তি রক্ষক এজেন্সির কর্মক্ষেত্রের যে অপর একটা দিক আছে। সে সম্পর্কে কিন্তু আমাদের কথা বলার অধিকার ও যোগ্যতা আর কারও চেয়েও কম নয়। সেটা পরিবেশের দিক। এখন এই ব্যাপারেই আমার বক্তব্য পেশ করিতেছি।

সকলেই জানেন, আইনের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাই আইন-শৃংখলা রক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার। জনগণের এই শ্রদ্ধাই 'ম্যাজেষ্ট্রি অব ল'র বুনিয়াদ। হিযম্যাজেষ্ট্রির সিংহাসনও বলিতে পারেন। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় রুল-অব-ল। আইনের শাসন। আইনের শাসন মানে শক্তির শাসনের বিপরীত। আইনের শাসনে শক্তির নতি স্বীকার। ইউনিফর্মপরা একজন মাত্র পুলিশের হুইসেলের আওয়াযে বিপুল জনতা যে সরিয়া যায়, এটা পুলিশের শক্তিতে বা তার গুলির ভয়ে নয়, পুলিশ 'আইনের লোক' বলিয়া। পুলিশ ত পুলিশ একজন আদালতের পিয়নের কথায় আসুন। পিয়নের হাতে কোনও লাঠি বন্দুক নাই। তার কোমরে একটি পেট্টি, অথবা কাঁধে কোমরে একটি চাপরাশ মাত্র। এই চাপরাশ সম্বল করিয়াই সে আদালতের পরওয়ানা লইয়া ডিক্রীর জমি দখল নিতে গিয়াছে। অপর পক্ষে শতকে দুই শ লোকের জমাত যে একটিমাত্র চাপরাশ-আঁটা লোকের সামনে শান্ত হইয়া আসিল, তা আইনের প্রতি জনগণের ঐ শ্রদ্ধার খাতিরে। জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আইনের শাসন রুল অব ল চলিতেছে। নিরস্ত্র ও দৈহিক শক্তিহীন মুনসেফ-জজদের রায়-ডিক্রিসমূহ বলবৎ ও প্রতিপালিত হইতেছে। আইনের প্রতি জনগণের এই ম্যাজিষ্টি-বোধ আছে বলিয়াই এক কোটি বাসেন্দার দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজ এক হাজার পুলিশের বাহিনী দিয়া চলিতেছে। আমাদের সাড়ে সাত কোটি বাসেন্দার বাংলাদেশও পচাত্তর হাজার পুলিশের বাহিনী দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আইনের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা যদি না থাকে তবে পঁচাত্তর হাজার পুলিশ দূরের কথা, সাড়ে সাত কোটি পুলিশও সাড়ে সাত কোটি নাগরিককে শায়েস্তা রাখিতে পারিবে না। এটা সকলেরই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, আইনভংগকারী একজনকে সামলাইতে অন্ততঃ দুইজন শান্ত মানুষের দরকার। এই সোজা হিসাবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে আইন-শৃংখলা স্থাপনে পনের কোটি পুলিশ দরকার হইবে। তবে যদি পুলিশও আইন ভাংগিতে পারে, তবে সাড়ে সাত কোটি পুলিশ, মানে মাথা পিছু একজন করিয়া পুলিশ হইলেই চলিতে পারে। আর দুইজনের হাতেই যদি ষ্টেনগান থাকে, তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান।

ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষার আর কোনও প্রয়োজন হইবে না। পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনী নয় মাসে যা পারে নাই, আমরা বাঙ্গালিরা নয় মিনিটে সে শুভ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিব।

দেশের নিরবচ্ছিন্ন আইন-শৃংখলার বুনিয়াদ আইনের প্রতি জনগণের এই শ্রদ্ধা। এটা নাগিরকরা শিখে সরকারের কাছে। যে সরকার আইনের প্রতি যতবেশি শ্রদ্ধাশীল, তাদের নাগরিকরা ততবেশি শ্রদ্ধাশীল। এর উল্টাটাও তেমনি সত্য। ইতিহাস তার সাক্ষী। দুনিয়ার ইতিহাসে তার লক্ষ নজির বিদ্যমান। আমাদের সরকার কি জনগণের প্রতি তাঁদের এই প্রাইমারী কর্তব্য করিয়াছেন? দেশের সর্বত্র সার্বিক ও প্রাত্যহিক অশান্তি-বিশৃংখলা ও বেদেরেগ নরহত্যা দেখিয়া শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মনে এই প্রশ্ন স্বতঃই জাগ্রত হইয়াছে। এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? মন্ত্রীদের অবসর কম। তাই আমি প্রশ্ন করিব, আওয়ামী লীগারদের কাছে। আওয়ামী লীগের মতো সুধীজন সমন্বয়ের গণপ্রতিষ্ঠান সচরাচর হয় না। বলিষ্ঠ নেতৃত্বই এর একমাত্র সম্বল নয়। সংগ্রামী ঐতিহ্যই এর একমাত্র পাথেয় নয়। সংগঠন হিসাবেও আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের ইন্টেলিজেনশিয়ার প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। উকিল-ব্যারিস্টার, মাস্টার-প্রফেসার, ডাক্তার-কবিরাজ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক, দর্শনী-বিজ্ঞানী, বণিক-শিল্পপতি ইত্যাদি জ্ঞানে বিজ্ঞানে-অর্থে-বিত্তে, মানে-মর্যাদায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজে যত ক্যাটিগরি আছে, সব ক্যাটিগরির লোক আওয়ামী লীগের শুধু সাংগঠনিক শাখায় নয় পার্লামেন্টারি শাখাতেও বিদ্যমান আছেন। এঁরা প্রত্যেকে এবং সকলে পৃথকভাবে ও সমবেতভাবে দেশের সমস্যা ও তার সমাধান যদি না বুঝেন, তবে আর কেউ বুঝিবে না। সেটা হইবে বাংলাদেশের চরম দুর্ভাগ্য ও পতনের অন্ধকার যুগ। আমি মনে করি না, আওয়ামী লীগের কাজেই দেশেরও তেমন দুর্ভাগ্যের দিন আসিয়া পড়িয়াছে।

তাই আওয়ামী লীগের প্রত্যেকের এবং সকলের কাছে পৃথকভাবে এবং সমবেতভাবে, আজ এই প্রশ্নটা তুলিয়া ধরিতেছি ঃ আপনাদের সার্বিক জনপ্রিয়তা, সর্বময় রাষ্ট্রক্ষমতা ও আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হইতেছে না কেন, তা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? মিটিং-এ বসিয়া নেতার কাছে, ঘরে বসিয়া বিবেকের কাছে, চোখ বুঁজিয়া আল্লার কাছে, নিজেদের মনের কথা বলিয়াছেন? নেতার কাছে, বিবেকের ধারে, আল্লার দরগায় একথা কি কখনও বলিয়াছেন যে, আপনারা নিজেরা আইন মানিয়া চলা সত্বেও দেশবাসী আইন অমান্য করিয়া চলিয়াছে? তা যদি বলিয়া না থাকেন, তবে সে আলাপে এটা কি বলিয়াছেন বা স্বীকার করিয়াছেন যে, আপনারা নিজেরা আইন মানিতেছেন না বলিয়াই জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছে?

আইন নিজে হাতে লওয়াই সবচেয়ে বড় আইন অমান্য। দেশে বিচারের জন্য আদালত আছে। অপরাধী গ্রেফতারের জন্য পুলিশ আছে। তবু আপনারা 'দুষ্কৃতিকারী'দেরে নির্মূল করিবার জন্য আপনাদের সমর্থকদের নির্দেশ দেন নাই?

'দুষ্কৃতিকারী' বলিতেছেন আপনারা কাদেরে? এটাত আইনের ভাষা নয়, ফৌজদারি দণ্ডবিধি ও কার্যবিধি আইনে ত এ শব্দ নাই। পক্ষান্তরে, আপনাদের পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাদেরই ত পাঞ্জাবী সৈন্যেরা 'দুষ্কৃতিকারী' বলিত। তৎকালীন সামরিক সরকারের প্রেস-নোট ও নিউজ আইটেমে, আওয়ামী লীগারদেরই ত 'দুষ্কৃতিকারী' বলা হইত। অন্ততঃ আপনাদের আত্মমর্যাদার খাতিরে এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির সম্মানে আজকার শান্তি-শৃংখলা আইন ভংগকারীদের বেলা ঐ শব্দটা ব্যবহার না করিয়া কি পারেন না?

আর 'দুষ্কৃতিকারী' না বলিয়া আইনভংগকারীও যদি বলেন, তবে আইন-ভংগকারী কারা, তার কি একটু খোঁজ-খবর করিবেন? পুলিশ বা মাল হাইজাকার গ্রেফতার করিয়া থানায় নিবার পরক্ষণেই কেউ কেউ পুলিশকে ধমকাইয়া তাঁদের উপরওয়ালাদের পর্যন্ত ট্রান্সফার-ডিসমিসের হুমকি দিয়া হাইজেকার খালাস করার কথা কি আপনাদের কানে উঠিয়াছে কখনও?

আপনারাই পঞ্চাশ টাকা পাটের সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিয়াছেন। আর আপনাদের লোকেরাই পঁয়ত্রিশ টাকায় পাট কিনিয়া পঞ্চাশ টাকার রশিদে সই লইতেছেন। এ ধরনের কথা কারও কাছে শুনিয়াছেন কি? খোঁজ লইয়াছেন কি এটা সত্য না মিথ্যা? এই আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি?

আপনাদেরই এক দফতর হইতে উনত্রিশ হাজার আমদানী লাইসেন্স দেওয়া হইল কোটি কোটি টাকার। এক বছর পরে অপর দফতরের মন্ত্রী বলিলেন, উনত্রিশ হাজারের মধ্যে পনর হাজারই ভোগাস। এই পনর হাজার ভোগাস লাইসেন্সধারী ঐ কোটি কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রার কি করিলেন, তার খোঁজ লইয়াছেন কি? ভোগাস লাইসেন্স, দাতা ও প্রাপকদের কোথাও বিচার হইয়াছে কি?

কাকে ফেলিয়া কার কথা বলিব? কোন্ কথা ফেলিয়া কোন্ কথা বলিব? আপনারা সবই জানেন। আমার চেয়ে বেশি জানেন নিশ্চয়ই। আপনাদের আচরণে জনগণ জানিয়াছে, আইনের প্রতি শাসকদেরই শ্রদ্ধা নাই। ফলে জনগণও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছে।

আইনের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়াছে আরও এক কারণে। আইনকে শ্রদ্ধেয় পবিত্র বস্তু মনে করাই আমাদের জনসাধারণের সহজাত ধারণা। সেখানে যদি জনগণ দেখে স্পষ্টতঃ বেআইনী আইন রচনা করিয়া সরকার তাঁদের বিরোধী লোকদেরে শাস্তি দিতেছেন তবে শুধু সেই বেআইনী আইনের প্রতি নয়, সব আইনের প্রতি জনগণের বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। দালাল আইন এমনি একটি আইন। রেট্রোস্পেকটিভলি অপরাধ সৃষ্টি করা যায়, না, এটা কাণ্ডজ্ঞানের কথা। এটা বুঝিতে আইন পড়িবার দরকার হয় না। কাজেই আমাদের জনগণও এটা বুঝিয়াছে। দালাল আইন করিয়া সরকার দেশের এবং নিজেদেরও অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, একথা আমি অনেকবার অনেক দিক হইতে

বলিয়াছি। আজ বলিতেছি একটা নতুন দিকের কথা। এটা আইন-শৃংখলার দিক। এইদিক হইতে ব্যাপারটা নতুন করিয়া ভাবিয়া দেখিতে আমি সরকারকে অনুরোধ করিতেছি।

সব কৃষিপ্রধান দেশের মতই বাংলাদেশেরও সমাজ-জীবন পল্লীভিত্তিক। দেশের শতকরা নব্বইজন আজো পল্লীবাসী। এদের প্রকৃতির দেওয়া ঐতিহ্যিক নেতৃত্ব গ্রাম্য মাতব্বর ও আলেম সমাজের হাতে। ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রবর্তনের পর হইতে ক্রমে ক্রমে পল্লীর নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এঁদের হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অনির্বাচিত 'কনসেন্সাসের' মানে 'পাঁচজনের' নেতৃত্ব স্বভাবের মতই এঁদের হাতেই রহিয়াছে। এঁদের অধিকাংশেই রক্ষণশীল বলিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। কিন্তু পল্লীসমাজের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে এঁদের শক্তি অসাধারণ ও অবদান অসামান্য। রাজনীতিতে এঁরা সব সময়েই প্রতিষ্ঠিত সরকারের সমর্থক। ইংরাজ আমলে এঁরা কংগ্রেস-প্রজাপার্টির বিরুদ্ধে আঞ্জুমানী রাজনীতি করিয়াছেন। পাকিস্তানী আমলে এঁরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ রাজনীতি করিয়াছেন। এটা করিয়াছেন তারা রাজনীতিক মতবাদের জন্য ততটা নয়, যতটা আইন-শৃঙ্খলার খাতিরে সরকারকে সমর্থনের জন্য। রাজনীতিতে মাতব্বর সাহেবের কথা তাঁর ছেলেরাও মানিত না; আলেম ও পীর সাহেবের কথা তাঁর মুরিদ মো'তেকাদরাও শুনিত না। কিন্তু সমাজ-জীবনের আর সব ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলার জন্য "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে" ছাত্র-তরুণসহ নির্বাচিত নেতারাও এঁদেরই মানিয়া চলিতেন। ফলে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে এঁরা ছিলেন বিপুল প্রভাবশালী।

দালাল আইনের বিষক্রিয়াই পল্লীসমাজের এই স্বাভাবিক নেতৃত্ব বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁদের ঘোষিত রাজনীতিক মতবাদের জন্যই এদের অধিকাংশ হয় জেলে আছেন নয়ত যাঁর-তাঁর এলাকা ছাড়িয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন। বলাবাহুল্য, রাজনীতিক মতবাদই এঁদের একমাত্র অপরাধ। ফৌজদারি অপরাধমূলক অথবা দেশদ্রোহিতামূলক কোনও দুষ্কর্মের অভিযোগ এঁদের মধ্যে খুব কম লোকের বিরুদ্ধেই আছে। এঁদেরে যাঁরা-তাঁর এলাকায় সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নেতৃত্বের এই শূন্যতা পূরণ করিলে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে এক বিরাট পদক্ষেপ নেওয়া হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আশা করি, সরকার কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৭৩

'ঐক্যজোটের' যুক্ত ইশতাহার নিতান্ত নৈরাশ্যজনক

ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের ঘোষণা নৈরাশ্যজনক। বস্তুতঃ ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের খবরে আমি যে পরিমাণে আশান্বিত হইয়াছিলাম, তাঁদের যুক্ত ঘোষণায় সেই পরিমাণ নিরাশ হইয়াছি। এত ঢাক-ঢোল পিটানো 'গুরুত্বপূর্ণ' ঐক্যজোটের পর্বত শুধু মূষিক প্রসব করে নাই। আসলে পর্বত কিছুই প্রসব করে নাই। পোয়াতি পর্বতের এবরশান হইয়াছে।

এসব কথা বলিতে আমার কষ্ট হইতেছে। কারণ আমি ত্রিদলীয় ঐক্যজোট সমর্থন করিয়াছিলাম। এই ঐক্যজোটের দ্বারা দেশের একটা উপকার হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। সে কারণে ঐক্যজোটকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম। এসবের মূলে ছিল আমার আওয়ামী লীগ সরকারের পরিণাম সাফল্য কামনা। আওয়ামী লীগ একশ' একটা ভুল করিতেছে। সেসব ভুলের কোন-কোনটা মারাত্মক। তাতে দেশের সুদূর-প্রসারী ক্ষতি হইতেছে। সেসব ক্ষতি পূরণ করিতে আমাদের অনেক সময় লাগিবে। তবু আমাদের আশা এই যে, আওয়ামী লীগ ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়া নিজেরা শিখিবে, দেশকে শিখাইবে। দেশকে উন্নতি ও প্রগতির পথে লইয়া যাইবে। ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে বলিয়া সে উন্নতির গতি মন্থর হইবে বটে, কিন্তু ঠিক এই কারণেই আমাদের উন্নতি ও প্রগতি স্থায়ী হইবে। প্রাকৃতিক কারণেই আওয়ামী লীগে তরুণের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই কারণে আওয়ামী লীগের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে কোনও বিপর্যয় ঘটে নাই। তারুণ্যের একমাত্র ত্রুটি অনভিজ্ঞতা। ভুল-ভ্রান্তি যা ঘটিতেছে, তা এই অনভিজ্ঞতার ফল; উদ্দেশ্যের অসাধুতার ফল নয়। এই বিশ্বাসেই এক বছরের হাজার ভুল-ভ্রান্তির পরেও দেশবাসী দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগকেই ভোট দিয়াছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা ভুল সংশোধনের জন্য সময় দিয়াছে। আদর্শ চ্যুত হইবার বা চরিত্র বদলাইবার সময় দেয় নাই।

ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের যুক্ত ঘোষণায় তারই আশংকা দেখা দিয়াছে এটা শুধু আওয়ামী লীগের বিপদ নয়। গোটা দেশের বিপদ। দুই বছরের অসংখ্য মারাত্মক ভুলের সংগে আরেকটা মারাত্মক ভুল যোগ হইল। কিরূপে এটা ঘটিল তা বুঝাইবার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

'ইত্তেফাকে'র পাঠকদের স্মরণ আছে, স্বাধীনতার গোড়ার দিকে সরকার যখন নিজেদের 'বিপ্লবী সরকার' আখ্যায়িত করিতেছিলেন, তখনই আমি সরকারকে এবং আওয়ামী-নেতৃত্বকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম: 'সাবধান, আপনারা ওকথা মুখে আনিবেন না। আপনারা বিপ্লবী সরকার নন। আপনারা নির্বাচিত সরকার। আপনারা বিপ্লবের সৃষ্টি নন। আপনারা গণতন্ত্রেরই সন্তান।' তরুণদের কেউ

কেউ আমার এ কথায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার মতকে তাঁরা প্রগতি-বিরোধী রক্ষণশীলতা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়মত পার্লামেন্টারি শাসনতন্ত্রের সংবিধান রচনা করিয়া আওয়ামী নেতৃত্ব একটা ঝড়ের মুখে টাল সামলাইয়া লইয়াছিলেন। সাময়িকভাবে বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল। সাময়িকভাবে এই জন্য যে, 'বিপ্লবের' রেশ আজও থামে নাই। মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী? বিপ্লবের নেশায় সেই রকম বৈরী।

আওয়ামী লীগ যে কারণে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান নয়, ঠিক সেই কারণে আওয়ামী সরকারও বিপ্লবী সরকার নয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে বলিয়াই আওয়ামী লীগ যেমন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান হইয়া যায় নাই, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সমাজবাদ গ্রহণ করাতেও তেমনি আওয়ামী লীগ বামপন্থী প্রতিষ্ঠান হইয়া যায় নাই। বরাবরের মতই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানই আছে। পাকিস্তানের মুসলিম লীগের মতো একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়। যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবি রাখে, সেই প্রতিষ্ঠানই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দল হিসাবে, পার্লামেন্টারি পার্টি হিসাবে, জনপ্রিয়তা এখানে অবান্তর। যে পার্টি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হইবে, নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া তাঁরাই পার্লামেন্টে মেজরিটি হইবে এবং দেশ শাসন করিবে। নির্বাচনের মাধ্যমে এটা ঘটিবে বলিয়া একাধিক পার্টি এইরূপ মেজরিটির দাবিদার হইতে পারে। এরা সবাই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যে সব প্রতিষ্ঠান কোনও মতবাদ বা আদর্শবাদে বিশ্বাস করে, ঐ মতবাদ বা আদর্শবাদে বিশ্বাসী না হইলে হাজার সৎ সাধু লোককেও যে প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হইতে দেওয়া হয় না, তাঁরা জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়। এটা ভাল-মন্দের গুণ-দোষ কীর্তনের কথা নয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চরিত্র বর্ণনা মাত্র। দোষী-গুণী ও মতবাদ-নির্বিশেষে গোটা জাতির সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্বে দাবিদার পার্টিরাই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। শুধু নামাযি-পরহেজগার সাধু-সজ্জনের প্রতিষ্ঠান যতই ভাল হউক, তারা জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়।

আওয়ামী লীগ এই সংজ্ঞা অনুসারেই বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানী আমলেও সে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছিল, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পূর্বপাক শাখা ছিল না। কথাটার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে এটাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নাম ছিল 'অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ', শুধু পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছিল না। এই সম্পর্কে স্মরণীয় যে, অখণ্ড ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যেও এমনি চরিত্র নির্দেশক নাম ছিল। কংগ্রেসের নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, আর মুসলিম লীগের নাম ছিল অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ। নামের এই পার্থক্য ছিল এই জন্য যে, মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে এক নেশনের অধিবাস মনে করিত না। আওয়ামী লীগের বেলাও এটা সত্য ছিল। পাকিস্তানকে আওয়ামী লীগ লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক রাষ্ট্র মনে করিত। এক রাষ্ট্রই হউক, আর দুই রাষ্ট্রই হউক, উভয় অবস্থাতেই পূর্ব পাকিস্তানকে আওয়ামী লীগ সভারেন রাষ্ট্র মনে করিত।

এই হিসাবে আওয়ামী লীগ ছিল পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমানের বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ তার একমাত্র মোকাবিলা পার্টি মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের 'সভারেন্টি'তে বিশ্বাস করিত না। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের আরও যেসব পার্টির জন্ম হইয়াছিল তারা কেউই পূর্ব পাকিস্তানের সভারেন্টি চাহিত না।

এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। ন্যাপ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কারণ মূল জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগেরই এরা অংশ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁরা তা চানও না। কমিউনিস্ট পার্টি মূলতঃ আন্তর্জাতীয়তাবাদী। নীতিতে তাঁরা জাতীয়তাবাদী নহেন। বিভিন্ন দেশে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান; ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিষ্ঠান নয়। এই কারণে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি নয়। এটা ইংরাজি 'কমিউনিস্ট পার্টি অব-বাংলাদেশের' বাংলা তর্জমা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরও নাম কমিউনিস্ট পার্টি-অব-ইণ্ডিয়া, (সি.পি. আই)। ইণ্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (আই.সি.পি.) নয়। কিন্তু ন্যাপের বেলা এ কথা বলা যায় না। তাঁরা আগে আওয়ামী লীগার ছিলেন। শুধু পররাষ্ট্র নীতিতে বিরোধ বাধায় ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়। পাকিস্তানী আমলে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ছিল বলিয়া এঁরা মাটির তলে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হইবার পর এঁদের অনেকেই 'ন্যাপ'-এ যোগ দেন। সেই হইতে বরাবর কমিউনিস্টরা মোটামুটি ন্যাপের নীতি নির্ধারণে বিপুল প্রভাব খাটাইয়াছেন। পরবর্তীকালে ন্যাপ ভাঙ্গিয়া দুই-টুকরা হইয়াছে। এক-টুকরা 'মস্কো-পন্থী,' অপর টুকরা 'চীন পন্থী' বলিয়া পরিচিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে 'ব্যান' উঠিয়া গিয়াছে। তাঁরা এখন 'মাটির নিচ' হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন এবং সমতলে দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও দুই দল: একটি মস্কোপন্থী, অপরটি চীনপন্থী। মহান প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও এই দুই দলে বিভক্ত হওয়ায় আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি দুই দল হইতে বাধ্য। তা হউক। কিন্তু পাকিস্তানী আমলে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী থাকাকালে যে সব কমিউনিস্ট অগত্যা ন্যাপে কাজ করিতেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে ব্যান উঠিয়া যাওয়ার পরও তাঁদের সকলে কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরিয়া যান নাই। মস্কোপন্থী ন্যাপের কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরিয়া গিয়া থাকুন, তাঁদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে–এটা সুস্পষ্ট। এই সূত্রটিই মস্কোপন্থী ন্যাপ ও মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

এঁদের সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম এই জন্য যে, এই দুইটি পার্টির সাথেই আওয়ামী লীগ ঐক্যজোট গঠন করিয়াছে। এই ঐক্যজোটের চরিত্র, প্রকৃতি ও আবশ্যকতা বুঝিবার

জন্যই আগের ইতিহাসের এইটুকু জানা দরকার। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই ঐক্যজোট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময়েই আমি একে অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম কি আশায় আর আজ তাদের যুক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হওয়াতে আমি নিরাশইবা হইলাম কি কারণে, সেটা বুঝিবার সুবিধার্থে পাঠকদের এইটুকু পূর্বেকার ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল।

এই তিন পার্টির মধ্যে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এরা বরাবর গণতন্ত্রে এবং বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রমাণ এই যে, এক পার্টির গণপরিষদে অন্য যে কোন সিস্টেমের গণতন্ত্র প্রবর্তনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমের সংবিধান রচনা করিয়াছেন। এটা খুব বড় কৃতিত্ব ও প্রশংসার কথা।

সংবিধান প্রবর্তনের পরে আওয়ামী লীগ একটা সাধারণ নির্বাচনও দিয়াছে। সে নির্বাচনেও বাংলাদেশের ভোটাররা বিপুল মেজরিটিতে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়া তাঁদেরেই আবার গদিতে বসাইয়াছেন। নবনির্বাচিত পার্লামেন্টেও আওয়ামী লীগ শতকরা আটানব্বইটি আসন দখল করিয়া আছে। অপজিশন দল নাই বলিলেই চলে। লীডার অব দি অপজিশন ত নাই-ই। এমন একদলীয় পার্লামেন্টে একদলীয় সরকারের নিরাপত্তার জন্য 'ঐক্যজোট' দরকার ছিল না। স্পষ্টতঃই সে উদ্দেশ্যে এই ঐক্যজোট হয় নাই। যে দুইটি দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ঐক্যজোট করিয়াছে তাদের কারও একজন মেম্বরও পার্লামেন্টে নাই। তবে আওয়ামী লীগ এই ঐক্যজোট করিল কেন? যুক্ত ঘোষণা প্রকাশের আগে এই ঐক্যজোটের উদ্দেশ্য জানিতাম না বলিয়াই আমি নিজে একটা উদ্দেশ্য আরোপ ও কর্তব্য বিতরণ করিয়াছিলাম। ঐ উদ্দেশ্য সাধিত ও কর্তব্য পালিত হইবে আশায় আমি ঐক্যজোটকে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। ঐক্যজোটের যুক্তঘোষণা প্রকাশের পরে বুঝিলাম, আমি জোটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা ও আশা পোষণ করিয়াছিলাম। আমার নৈরাশ্যের হেতু এই।

ঐক্যজোট হইতে আমি আশা কি করিয়াছিলাম? আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী লীগ জনগণের প্রতিষ্ঠান, তার নামেই এটা প্রকট। আওয়ামী মানে জনগণ। তাই আওয়ামী লীগের আদর্শ গণমুখী ও চরিত্র সংগ্রামী হইলেও তাকে বিপ্লবী বামপন্থী পার্টি বলা যায় না। বাংগালি জাতি যা আওয়ামী লীগও তাই। বাংগালি লেফটও না, রাইটও না। বাংগালি ক্যাপিটালিষ্টও না, প্রোলিতারিয়েতও না। বাংগালি জঙ্গীও না, ভীরুও না। বাংগালি গোঁড়া ফ্যান্‌টিকও না, ধর্মহীন নাস্তিকও না। এমন যে বাংগালি জাতি, আওয়ামী লীগ তার জন্মে, তার জীবনে, তার সাধনায়, তার সাফল্যে এই বাংগালিত্বেরই প্রতিবিম্ব। আওয়ামী লীগ ডানপন্থীও না, বামপন্থিও না। আওয়ামী লীগ পুঁজিবাদী ধনতন্ত্রীর প্রতিষ্ঠানও নয়। সর্বহারার সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রীর প্রতিষ্ঠানও নয়। সর্ব অবস্থায় আওয়ামী লীগ বাংগালি জাতির প্রতিচ্ছবি। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের

মাধ্যমে বাংগালি জাতি যদি ডাইনে যায়, তবে আওয়ামী লীগ দক্ষিণপন্থী। যদি বামে যায়, তবে আওয়ামী লীগ বামপন্থী। এই সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগ জাতিকে নেতৃত্ব দিবে ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিনিধিত্বও করিবে। তার মানে জোর করিয়া কোনও মতবাদ জনসাধারণকে দিয়া গিলাইবে না। নির্বাচনে বিশ্বাসী বলিয়া আওয়ামী লীগ জনগণ অর্থে জনগণের মেজরিটিকেই বুঝায়। আওয়ামী লীগ জানে দেশের বিপুল মেজরিটি শোষিত এবং মুষ্টিমেয় লোক শোষক। তাই এই শোষিত জনগণের মধ্যেই জাতি নিহিত। তাদের ভোটেই জাতির মত প্রকাশিত, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। মুষ্টিমেয়ের মুষ্টি হইতে বিপুলের অধিকার আদায়ে যে সংগ্রাম লাগে সেটা মিলিটেন্ট হইবে বটে, তবে ভায়লেন্ট হইবে না। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে সংগ্রামও করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেটা তার মিলিটেন্সি, ভায়লেন্স নয়। আওয়ামী লীগ জনগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মেজরিটির প্রতিষ্ঠান। বিপুল মেজরিটির সম্মতিক্রমে জনগণের কল্যাণ করিতে চায় বলিয়াই আওয়ামী লীগের হিংস্র ও বিপ্লবী হইতে হয় না।

নামে-কামে আওয়ামী লীগ জনগণের প্রতিষ্ঠান হইলেও সে কোনও দিন সমাজবাদী দল ছিল না তার পার্টি প্রোগ্রামে বৃহৎ ও ভারী শিল্প জাতীয়করণের কথা ছিল; সাকুল্য উৎপাদনযন্ত্র জাতীয়করণের কথা ছিল না। তার ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ছিল না। এই প্রোগ্রামের ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর ইলেকশনে জনগণের ম্যাণ্ডেট পাইয়াছিল। সে ম্যাণ্ডেট মোতাবেক কাজ করিবার আন্তরিক ইচ্ছাও আওয়ামী লীগের ছিল। নির্বাচনের পরে ১৯৭১ সালের দুসররা জানুয়ারির সোহ্‌রাওয়ার্দী ময়দানের বিশাল গণ-জমায়েতে সে মর্মে হলফও তাঁরা নিয়াছিলেন। কিন্তু সুবিদিত ঐতিহাসিক কারণে অবস্থা-গতিকে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হইয়াছে, তেমনি এবং সেই ঐতিহাসিক কারণেই সমাজবাদও আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দুই ব্যাপারের কোনোটাই কেউ চিন্তা-ভাবনা করিয়া আলোচনা ও ভোটাভুটির মাধ্যমে করেন নাই। অবস্থা-গতিকেই হইয়া গিয়াছে। এইভাবেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব অপ্রতিরোধ্য ঘটনাপ্রবাহে দুইটি বাস্তব সত্যের মুখামুখি দাঁড়াইয়াছেন; এক. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। দুই. সে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্যাটার্ন সমাজবাদ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ চিন্তার দিক হইতে আওয়ামী লীগের পরিচিত: কারণ এটাই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তান। কিন্তু সমাজবাদ ছিল আওয়ামী লীগের কল্পনার বাহিরে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল আওয়ামী লীগের দুই যুগের সাধনা। তাঁর সাথে ছিল অবশ্য বৃহৎ ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ। বৃহৎ ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ ও সমাজবাদ যে এক বস্তু নয়, এটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জানিতেন। তবু ঐতিহাসিক অপ্রতিরোধ্য ঘটনাস্রোতে সমাজবাদ যখন স্বাধীন বাংলার এবং আওয়ামী লীগের সামনে বাস্তব সত্যের আকারে আবির্ভূত হইল, তখন জনগণের ও জন-যুদ্ধের নেতা হিসাবে আওয়ামী লীগকে

বলিতে হইল: 'আমরা গণতন্ত্রও চাই, সমাজবাদও চাই'। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে যে ছাত্র-তরুণ নেতৃত্ব আওয়ামী লীগকে দিয়া সমাজবাদ গ্রহণ করাইলেন স্বাধীনতার পরে তাঁরাই আওয়ামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়া বলিতে লাগিলেন: 'গণতন্ত্র ও সমাজবাদ একসংগে চলিতে পারে না'। আওয়ামী নেতৃত্ব স্বভাবতঃই বিচলিত হইলেন। কারণ প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থ-বিজ্ঞানের মতে কথাটা সত্য। খোদ আওয়ামী নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। একজন বলিলেন: 'যদি গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এক সংগে নাই চলে, তবে আমরা গণতন্ত্র বাদ দিয়া সমাজবাদই বলিব।' আরেকজন তার জবাবে বলিলেন: 'যদি গণতন্ত্র ও সমাজবাদ একসংগে নাই চলে, তবে আমরা সমাজবাদ বাদ দিয়া গণতন্ত্রই রাখিব'। গণতন্ত্র ও সমাজবাদ উভয়টাকেই সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করিয়া এখন এই বিতর্কের অবসান করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ এই বাহ্যত: পরস্পরবিরোধী নীতিদ্বয়ের উভয়টা গ্রহণ করিয়া এক বিরাট দায়িত্ব কাঁধে লইয়াছে। অসীম সাহসের কাজ করিয়াছে, এক অভিনব এক্সপেরিমেন্টের দুঃসাধ্য কর্তব্য হাতে লইয়াছে। নজিরের জন্য আওয়ামী নেতৃত্ব চারদিকে তাকাইলেন। প্রতিবেশী ভারত গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মডেল হইতে পারিত। দার্শনিক রাজনৈতিক নেহেরু সে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তা হইল না। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নয়; কংগ্রেস, সরকারের প্রোগ্রাম মাত্র। চিলির প্রেসিডেন্ট ডাঃ এলেণ্ডে আমাদের নজির হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি ছিলেন মার্কস্‌বাদী। আওয়ামী নেতৃত্ব মার্কস্‌বাদী নন। অথচ আওয়ামী লীগকে এই এক্সপেরিমেন্টে সফল হইতেই হইবে। সংবিধানকে বাস্তবায়িত করিতেই হইবে। তা করিতে হইলে দেশবাসীকে বিশেষত: দেশের বুদ্ধিজীবীদের বুঝাইতে হইবে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ আনা যায়, এর বিপরীত কথা যাঁরা বলিতেছেন, তাঁদের মত নির্ভুল নয়।

এই কাজটিই করিতে পারেন কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য মার্কস্‌বাদীরা। বিশেষতঃ সে মার্কসবাদীরা যদি মস্কোপন্থী হয়। কারণ মস্কোর আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এটা মানিয়া লইয়াছেন যে, পরিবর্তিত পরিবেশ বিপ্লব ছাড়াই সমাজবাদ আসিতে পারে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রীরা যদি বলেন, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ কায়েম করা যায়, তবে তাতে কেউ অবিশ্বাস করিতেও পারেন। আওয়ামী লীগের বেলা তাই ঘটিয়াছে। অনেক সমাজবাদী, যাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাবেক সমর্থক অনেকে আছেন, খুলাখুলিই বলিতেছেন, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়া সমাজবাদ কায়েম করার কথা বলিয়া আওয়ামী লীগ সরকার জনগণকে ধাপ্‌পা দিতেছেন। আসলে সরকার গণতন্ত্র বা সমাজবাদ কোনটাই চান না। সরকারের শিল্প-সম্পর্কিত কতিপয় ভুল বিরোধীদের এই সমালোচনার সমর্থন করিতেছে। ত্রিদলীয় ঐক্যজোট ফলপ্রসূভাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বুঝাইবার এই কাজটি করিতে পারিত। এইজন্যই আমি এই ঐক্যজোটকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম। কিন্তু যুক্ত ঘোষণায় দেখা গেল, অমন কোনও অভিপ্রায় তাঁদের নাই। জোটের 'পাঁচদফা'

কর্মসূচিতে যা বলা হইয়াছে, তার প্রত্যেক কথা আমাদের জানা। রোজই মন্ত্রীদের মুখে সব কথা শুনিতেছি। সরকার ওসব করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টাও করিতেছেন। সরকার ও আওয়ামী লীগ যা পারিতেছেন না, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি তা পারিবেন, এটা বোধগম্য নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নয়। শান্তি-শৃংখলা স্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধের জন্য যে ব্যাপক গণ-সমর্থক আবশ্যক, সেটা পাওয়ার উপায় সর্বদলীয় সহযোগিতা। সব দলের নেতাদের সাথে একটা পরামর্শসভা ডাকিলেই এদিককার রাস্তা খুলিয়া যায়। তার জন্য 'জোট' গঠন করার দরকার হয় না।

কিন্তু ত্রিদলীয় জোট হইয়াছে একটা সাংগঠনিক মিলন। সে মিলনের যেটা আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল, 'পাঁচদফা' তার ধার দিয়াও যায় নাই। পাঁচদফার সবগুলিই সরকারী কাজ; অপর দুই দলের কেউই সরকারেও নাই, পার্লামেন্টেও নাই। যতই কম হউক, পার্লামেন্টে যে সব অপজিশন দল আছেন, তাঁদেরে বাদ দিয়া শুধু মস্কোপন্থী বাইরের দুইটি দলের সঙ্গে জোট গঠন করায় দেশে ও বিদেশে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হইতে পারে। কি পার্লামেন্ট, কি তার বাইরে, কোথাও এই জোটের প্রয়োজনও ছিল না। দৃশ্যতঃ কোন লাভও সরকারের বা আওয়ামীলীগের হয় নাই। কিন্তু লোকসান হইতে পারে অনেক; তার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় কয়েকটিতে হিতে বিপরীত হইতে পারে। সেদিকে সংক্ষেপে সরকার ও আওয়ামী নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য মনে করিতেছি।

প্রথমতঃ জোটভুক্ত তিন দলের যার তার 'দলীয় স্বাতন্ত্র্য ও কর্মসূচির' ভিত্তিতে কাজ করার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া গ্রামে-গ্রামে ও মহল্লায়-মহল্লায় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার কথাই ধরা যাউক। এটা শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক অভিযানে পরিণত হইতে বাধ্য। কোথাও কোনও দলের ইউনিট না থাকিলে সেখানে তা গড়িতে হইবে। কেন্দ্রীয় ঐক্যজোটের দলীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাত রক্ষা করা হইলে এটা অবশ্যই করিতে হইবে। সরকারী উদ্যোগে আওয়ামী লীগের কাঁধে চড়িয়া কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিট দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে, এটা খোশখবর। কিন্তু এতে অন্তর্দলীয় সংঘাতও বাঁধিতে পারে। অতএব হুঁশিয়ার।

দ্বিতীয়তঃ এই সংগঠনি অভিযানে দুষ্কৃতিকারী, রুশ-ভারতের শত্রু ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী উৎখাত অবশ্যই করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী সনাতন অর্থ মুসলমান। ফলে মফস্বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া না যায়, সেদিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ ঐক্যজোটের অভিযাত্রীরা যদি 'দুর্নীতিবাজ, সাম্রাজ্যবাদী ও গণ-বিরোধী' সরকারী কর্মচারীদের 'দূর' করিয়া প্রশাসনযন্ত্র 'গণমুখী' করিবার কাজে লাগেন, তবে প্রশাসনে যে অরাজকতা সৃষ্টি হইবে, সেটা হইবে রাষ্ট্রের জন্য বড় বিপদ।

এ সবই আভ্যন্তরীণ বিপদ। এ ছাড়া পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও যে বিপদ হইতে পারে তা এই, এই 'জোট' আমাদের পররাষ্ট্রীয় 'জোট-নিরপেক্ষতা'য় আঘাত করিয়াছে। পররাষ্ট্রে জোট-নিরপেক্ষতা আমাদের বিঘোষিত নীতি। এই নীতির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ও পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের সরকার ও নেতৃবৃন্দকে বুঝাইবার দরকার নাই। তাঁরা নিজেরাই সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ ভাষায় জোট-নিরপেক্ষতার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। 'জোট-নিরপেক্ষ' সম্মিলনীর সদস্য হিসাবে অনেকের প্রশংসা ও সহায়তা অর্জনও করিয়াছেন।

এমনি সময়ে বাংলাদেশ জোট-নিরপেক্ষতার খেলাফে সামান্য ভান করিলেও আমাদের জন্য সেটা মারাত্মক হইতে পারে। ত্রিদলীয় ঐক্যজোট তেমন কোনও ভাল হইয়াছে কি না, অন্ততঃ তেমন কোনও সন্দেহই জোট-নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বে সৃষ্টি হইতে পারে কি না, আশা করি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ঐক্যজোটের অবাস্তব ও অর্থহীন পাঁচ দফা 'তৃতীয় বিশ্বে' আমাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে। পাঁচ দফা কর্মসূচিতে আর অন্ততঃ একটি দফা যোগ করিয়া এই সন্দেহ ও সম্ভাবনা কতকটা নিরসন করা যাইতে পারে। সে দফাটি হইবে : 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সম্ভাব্যতা প্রচার।' এটা আরও বেশি দরকার এই জন্য যে, জোটভুক্ত তিন ঘাটিরই স্ব স্ব মত প্রচারের স্বাধীনতা রহিয়াছে। এটা ঐক্যজোটকে অর্থহীন করিয়াছে।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৩

‘গণ ঐক্যজোট’ কি আওয়ামী লীগের স্থলবর্তী হইতে চায়?

ঐক্যজোটের আসল উদ্দেশ্যই নাকি আমি বুঝিতে পারি নাই। ‘জোট’ সম্পর্কে আমার গত সপ্তাহের লেখাটা পড়িয়া সদম্ভে বলিয়া গেলেন জোটের কয়েকজন গোঁড়া সমর্থক। জোটের উদ্দেশ্য যে আমি গোড়ায় বুঝিতে পারি নাই সে কথাই আমি ঐ নিবন্ধেই স্বীকার করিয়াছি। জবাবে আমার সমালোচক বন্ধুরা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই শুনাইয়া গেলেন, জোটের আসল উদ্দেশ্য আমি মোটেই বুঝি নাই–আগেও না, পরেও না। বন্ধুরা ‘আসল’ কথাটার উপর বরাবর জোর দেওয়ায় আমার কৌতূহল হইল। আমি জানিবার চেষ্টা করিলাম, প্রকাশ্য ও ঘোষিত উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনও গোপন উদ্দেশ্য আছে কি না। আজকালের তরুণরা আগের দিনের বুড়াদের চেয়ে শেয়ান। সোজাসুজি আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে, আভাসে-ইশারায় অনেক কথা বলিলেন। ইশারা-ইঙ্গিতের সমর্থনে যুক্তি-তর্কও দিলেন।

তরুণ বন্ধুদের কথায় বেশ ঘাবড়াইয়া গেলাম। এত ঘাবড়াইলাম যে, তাঁরা চলিয়া গেলেও তাঁদের কথাগুলি আমার মাথায় হাতুড়ি পিটাইতে থাকিল। আমি রীতিমত আতংকিত হইলাম। গত নিবন্ধে আমি ঐক্যজোটের অপ-প্রয়োগকে সরকার ও আওয়ামী লীগের বিপদ আখ্যা দিয়াছিলাম। তরুণ বন্ধুদের সাথে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ঐক্যজোটের আসল উদ্দেশ্যের প্রয়োগটাই সরকার ও আওয়ামী লীগের ত বটেই, গোটা দেশেরও বিপদ আনিতে পারে। আমার এই আতংকে ‘ইত্তেফাকে’র পাঠকদের শরিক করিয়া নিজের বুকের বোঝা একটু হাল্কা করিবার জন্যই আজ আবার ‘ঐক্যজোটের’ উপরেই লিখিতে বসিলাম।

বন্ধুদের ইশারায় বুঝিলাম, আওয়ামী লীগে ‘পার্জিং’ মানে শুদ্ধি অভিযান শুরু হইতেছে। দেশের কল্যাণের জন্য সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই নাকি এই পার্জিং অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আওয়ামী লীগে ‘বিপুল সংখ্যক দুষ্টলোক’ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই ‘দুষ্ট আওয়ামী লীগারদের’ দরুন ‘ভাল আওয়ামী লীগাররা’ ভাল কাজ করিতে পারিতেছেন না। দেশের সমস্ত দুর্দশা-দুর্নীতির জন্য এই ‘দুষ্ট আওয়ামী লীগাররা’ই দায়ী। এদেরে ‘পার্জ’ করিয়া আওয়ামী লীগকে ‘শুদ্ধি’ করিতে না পারিলে ‘সমাজতন্ত্র’ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। দেশও পুনর্গঠিত হইবে না। অতএব এই সব ‘দুষ্ট’ লোকেরে, চলতি ভাষায় যাদেরে দুষ্কৃতিকারী বলা হয়, সবংশে আওয়ামী লীগ হইতে ‘উৎখাত’ করিতে হইবে। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ত কম নয়। কাজেই এদেরে পার্জ করিতে গিয়া ‘ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড়’ না হইয়া যায় সেজন্য ভালো লোক দিয়া তাদের শূন্যস্থান পূরণ করিতে হইবে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে ‘ন্যাপ’ও কমিউনিস্ট পার্টির

সহিত এই ঐক্যজোট করা হইয়াছে। এটাই 'ত্রিদলীয়' ঐক্যজোটের 'আসল উদ্দেশ্য।' তিন দলের 'ভাল লোকদের' সমন্বয় ঘটিলে যে ঐক্যবদ্ধ জোট হইবে সেটা হইবে সত্য-সত্যই 'গণঐক্য'। ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের নাম দেওয়া হইয়াছে 'গণঐক্য জোট' এই কারণেই। ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই নাম ঠিক করা হইয়াছে নিশ্চয়ই।

এটাই কি তবে ঐক্যজোটের 'আসল উদ্দেশ্য'? এমন উদ্দেশ্য নির্ধারণ কি ঠিক হইয়াছে? আওয়ামী লীগের চরিত্র বিশ্লেষণ কি নির্ভুল হইয়াছে? আওয়ামী লীগে খারাপ লোক আছে নিশ্চয়ই। আওয়ামী লীগ শুধু ফেরেশতার পার্টি, এ দাবি কেউ করেন নাই। আগেও করেন নাই, বর্তমানেও করা হইতেছে না, ভবিষ্যতেও করা যাইবে না। আওয়ামী লীগ জাতীয় গণ-প্রতিষ্ঠান। দেশে যখন ভাল-মন্দ দুই-প্রকার লোকই আছে, তখন আওয়ামী লীগেও ঐ দুই-প্রকার লোকই থাকিবে। দেশবাসী যখন সব ফেরেশতা নয়, তখন আওয়ামী লীগে শুধু ফেরেশতা থাকিবে এটা কেউ দাবি করিতে পারে না। আর মন্দ লোক নাই কোন পার্টিতে? যে দুইটি পার্টির সাথে আওয়ামী লীগ এই ঐক্যজোট করিয়াছে, সেই 'ন্যাপ' ও কমিউনিস্ট পার্টিতেও কি মন্দ লোক নাই? আল্লার দুনিয়ায় যখন ভাল-মন্দ সব কিসেমের লোক আছে, তখন মানুষের-গড়া পার্টি মাত্রেই সব কিসেমের লোক থাকিবেই। বরঞ্চ যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান যত বেশি গণ-ভিত্তিক হইবে, জাতীয় চরিত্রের ভাল-মন্দ উভয় দিকই সে প্রতিষ্ঠানে ততবেশি প্রতিবিম্বিত হইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতই বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগের এটা যুগপৎ শক্তি ও দুর্বলতা।

তারপর ধরুণ 'পার্জিং' কথাটা। এটা ত গণতান্ত্রিক শব্দ নয়। 'পার্জিং'-টা ত গণপ্রতিষ্ঠানের কোনও পদ্ধতি নয়। এটা টোটালিটারিয়ান সমাজের পার্টি বা ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপের পদ্ধতি। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে 'পার্জিং' পদ্ধতি অচল। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রী দেশে গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন, গঠন-পদ্ধতি অনুসারেই মেম্বরগিরি নিয়ন্ত্রিত হয়। গণতন্ত্রই যেমন গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও তেমনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা করে গণতান্ত্রিক উপায়ে ও পদ্ধতিতে। সে পদ্ধতির নাম প্রাতিষ্ঠানিক ও দলীয় শৃংখলা। তাকে কোনও মতেই 'পার্জিং' বলা চলে না। আওয়ামী লীগ বর্তমানে শাসক দল। সব শাসক দলের মতই আওয়ামী লীগেও নিশ্চয় কিছু সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী ঢুকিয়াছে। আওয়ামী নেতৃত্ব যদি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও প্রতিষ্ঠানকে কলুষমুক্ত করিবার জন্য কারো বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি এ্যাক্শনের ব্যবস্থা বা চিন্তা করিয়া থাকেন তবে সেটা ত অন্যায় হইবেই না, বরঞ্চ তেমন কাজ সাধারণভাবে দেশবাসীর দ্বারা এবং বিশেষভাবে আওয়ামী জনতার দ্বারা অভিনন্দিত হইবে।

তবু তেমন সম্ভাবনাকে পার্জিং বলিতেছে কারা? আওয়ামী রাজনীতিতে এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী পদ্ধতির কথাটা উঠিলই বা কেন? এটা লক্ষ্যণীয় যে, ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠনের সময় হইতেই আওয়ামী অভিধানেই নয়া শব্দটার আমদানি হইয়াছে।

কাজেই এখান হইতে অবস্থা বিশ্লেষণ করিলেই চলিতে পারে। আসলে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট ব্যাপারটা কি? আমি গত নিবন্ধে দেখাইয়াছি, মন্ত্রিত্ব গঠন-রক্ষণ বা সরকার পরিচালনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নাই। পার্লামেন্টের ভিতরে শক্তি হ্রাস বৃদ্ধির সাথেও এর কোনও সম্বন্ধ নাই। পার্লামেন্টের বাহিরে দেশবাসী জনসাধারণের কাছে এই ঐক্যজোটের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তাৎপর্য কি একমাত্র এটাই বিচার্য। এই দিক হইতে ঐক্যজোট আসলে দুই দলীয় ঐক্য, তিন দলীয় নয়। আমি আগের প্রবন্ধেও বলিয়াছি, আজও আবার বলিতেছি, ন্যাপের প্রায় সকল নেতা-কর্মীই আগে আওয়ামী লীগার ছিলেন। একটি মাত্র ইস্যুতে তাঁরা আওয়ামী লীগ ছাড়িয়া পৃথক হইয়া ছিলেন। সেটা ছিল পররাষ্ট্র নীতি। যাঁরা জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি চাহিতেন এবং সেই কারণে সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধী ছিলেন, তাঁরাই আওয়ামী লীগ ছাড়িয়া ন্যাপ গঠন করিয়াছিলেন। আওয়ামী লীগে থাকা নীতিতঃই তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ ঐ সময়কার আওয়ামী নেতৃত্ব সামরিক জোট হইতে বাহির হইয়া আসা ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আজ এই বিষয়ে ন্যাপের জয় হইয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও আওয়ামী সরকার সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধী ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির পক্ষপাতী হইয়াছেন। কাজেই যে কারণে কতিপয় আওয়ামী লীগার নিজেদের মূল প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া পৃথক প্রতিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে কারণ দূর হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাদের আওয়ামী লীগে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

কিন্তু ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। পৃথক ন্যাপ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তৎকালে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির কিছু লোক তাতে প্রবেশ করেন। এঁরা ন্যাপের নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। 'নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির' পথ দিয়া ন্যাপকে এঁরা সমাজবাদী দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করেন। ন্যাপ-কর্মীদের বিপুল মেজরিটি সমাজবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। এটাও হইয়া পড়ে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগে একটা মৌল বিরোধ। স্বাধীন বাংলাদেশে এ বিরোধেরও অবসান ঘটিয়াছে। আওয়ামী লীগ নীতি ও আদর্শ হিসাবে সমাজবাদ গ্রহণ করিয়াছে। সমাজবাদকে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি হিসাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং এই হেতুতেও ন্যাপ আর আওয়ামী লীগের বাহিরে থাকিতে পারে না।

ন্যাপ ও আওয়ামী লীগেরে মধ্যে তৎকালীন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও একটা বিরোধ দেখা দিয়াছিল। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশের সমন্বয়ে যে 'ওয়ান ইউনিট' হইয়াছিল, আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের স্বার্থে সেটা সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু ন্যাপ সমর্থন করে নাই। এক পাঞ্জাব ছাড়া আর সব প্রদেশেই 'ওয়ান ইউনিট' আন্‌পপুলার ছিল। সেই হেতু ঐ সব প্রদেশে ন্যাপ আওয়ামী লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গণভিত্তিক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যাপ আওয়ামী লীগের

চেয়ে শক্তিশালী ও গণ-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার এটাও একটা প্রতিবন্ধক ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ কারণও দূর হইয়াছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এইভাবে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মধ্যেকার সবগুলি বিরোধ ও মতভেদ দূর হইয়া গিয়াছে। এখন ন্যাপ-নেতা কর্মীদের আওয়ামী লীগে ফিরিয়া না আসার কোনও কারণ নাই। তাই তাঁদের অনেকে আওয়ামী লীগে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেউ কেউ মন্ত্রী-মেম্বারও হইয়াছেন।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কথা আলাদা। সব কমিউনিস্ট পার্টিই নীতিতঃ আন্তর্জাতিক পার্টি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মূলত: ভারত-ভিত্তিক। ভারতের কংগ্রেসের সাথে তথাকার কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য এলায়েন্স ও সহযোগিতা যতদূর, যতটুকু ও যে ধরনের হইতে পারে, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সাথে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য, এলায়েন্স ও সহযোগিতা ততদূর, ততটুকু ও সেই ধরনের হইতে পারে। তার বেশি নয়।

কাজেই 'ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের' রাজনৈতিক চরিত্র বিচার করিতে হইলে তিনটি পক্ষেরই চরিত্র বিশ্লেষণ দরকার। আওয়ামী লীগ আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান। তাকে আমরা চিনি। তার দোষগুণ সবই আমাদের জানা। ন্যাপ আমাদের আত্মীয়। একই পরিবারের লোক। মতভেদের দরুণ পৃথক হইয়াছিল। এখন সে সব মতভেদ দূর হইয়াছে। এক পরিবারের লোক বলিয়া দোষেগুণে তাঁরা-আমরা একই। তাঁদের সাথে ঐক্য-মিলনে এমন কি মিশিয়া যাওয়ায়ও দোষ নাই। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের অনাত্মীয়। পরিবারের লোক ত নয়ই। তাদের লইয়া যত চিন্তা-ভাবনা। তাদের মধ্যে অনেক ত্যাগী আদর্শবাদী চরিত্রবান লোক আছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শে চিন্তা-ভাবনায় তাঁরা আরেক জগতের লোক। ভারত-ভিত্তিক হওয়াটা তেমন দোষের নয়। ভারত শুধু আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র নয়, হিতৈষী রাষ্ট্রও। রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে ভারত আমাদের মডেল। গত পঁচিশটা বছর কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের দেশে নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই তারা ভারত-ভিত্তিক হইতে বাধ্য হইয়াছে। এখন স্বাধীন বাংলাদেশে ক্রমে-ক্রমে তাঁরা বাংলা-ভিত্তিকও হইতে পারে। সেটা ধরিয়া লইয়াই আমি বলিয়াছি আওয়ামী লীগের সাথে তাদের সহযোগিতা ভারতীয় কংগ্রেস ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার মতো হইতে পারে। অন্যরূপ হইতে পারে না। অতএব ভারতের কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পর্কটা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসকে ধনিক-বণিকের, বিড়লা-বাজাজের সমর্থিত বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নকল স্বাধীনতার দাবি বলিয়াছে। তাই তারা কংগ্রেসের 'কুইট-ইণ্ডিয়া' আন্দোলন সমর্থন করে নাই। বরং যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কংগ্রেস 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' বলিয়াছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'তাকে পিপলস' ওয়ার বলিয়াছে। এই যুক্তিতে ইংরাজ সরকারের 'ওয়ার এফার্টের' সহায়তা করিয়াছে।

স্বাধীনতার পরেও কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসী সরকারের সমর্থন করে নাই; কংগ্রেসের অর্জিত স্বাধীনতাকে 'ঝুটা আজাদী' বলিয়াছে। কমনওয়েলথে থাকাটাকে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতা' আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু নেহরুর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী ধার একদম ভুতা করিয়া দিয়াছে। ১৯৪৫ সালে নেহেরু যখন ডাঃ সুকর্ণ, নাসের, টিটোকে লইয়া পঞ্চশীলাভিত্তিক তৃতীয় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া রুশ-চীনের বাহ্-বাহ্ পাইলেন, তখন হইতে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তখন হইতেই এরা 'যখন-যেমন, তখন-তেমন' নীতি অবলম্বন করিয়া, 'সুইরূপে ঢুকিয়া কুড়ালরূপে' বাহির হওয়ার ফন্দি-ফিকির করিয়া আসিতেছে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ লাগায় এবং সে যুদ্ধে রুশিয়া ভারতকে শুধু মৌখিক সমর্থন দেওয়াতেই চীন রুশিয়ার উপর চটিয়া যায়। সংগে সংগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রুশপন্থী ও চীনা পন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সেই হইতে চীনাপন্থীরা সোজাসুজি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। আর রুশপন্থীরা পূর্বেকার 'যখন-যেমন' নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। নেহেরু মৃত্যুর আগেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে কংগ্রেসের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়া যাওয়ায় এবং মিসেস ইন্দিরার নেতৃত্বে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি হওয়ায় রুশপন্থী কমিউনিস্টরা খুবই বেকায়দায় পড়িয়াছে সত্য, বাহ্যতঃ অধিকতর সহযোগিতার ইচ্ছা দেখাইতেছে, তাও সত্য। কিন্তু তাঁরা নিজেরা মার্কসিষ্ট আর কংগ্রেস বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। স্বভাবতঃই এই তথ্য তারা ভুলিতে পারিতেছে না। কংগ্রেসের অর্ধশতাব্দীর জমাটবাঁধা জনপ্রিয়তা ভেদ করিয়া সুঁই হইয়া ঢুকাই যাইতেছে না। কুড়াল হইয়া বাহির হওয়াত পরের কথা। অতএব, নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের সাথে এলায়েন্স করিয়া এবং নির্বাচনের পর সরকারবিরোধী হরতালে অংশগ্রহণ করিয়া সহযোগিতা-অসহযোগিতা দুইটাই চালাইয়া যাইতেছে।

কংগ্রেসের মোকাবিলায় যা ব্যর্থ হইয়াছে, আওয়ামী লীগের বেলা তা ব্যর্থ নাও হইতে পারে। আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য কংগ্রেসের মতো সুপ্রাচীন নয়; এর জনপ্রিয়তার জমাটটাও অর্ধশতাব্দীর নয়, মাত্র দুই বছরের। অতএব, বাংলাদেশে সে চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ন্যাপকে 'হ্যাণ্ডি' ভায়া-মিডিয়া পাওয়া গেল। ন্যাপ আওয়ামী লীগেরই অংগ। একদিকে তাদের কিছু লোক আওয়ামী লীগে ফিরিয়া গিয়াছেন। অপর দিকে গত ৭ই জানুয়ারির একদিনের ঘোরতর অর্বাচীন মূঢ়তার দরুন ন্যাপ দ্বিতীয় জনপ্রিয় শক্তি হইতে বহু নিচে নামিয়া পড়িয়া দাতে আংগুল কাটিতেছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের রাগ ও অনুরাগ দুইটাই আছে। তাই তারা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে মধ্যস্থতা করিতে রাজিও হইয়াছে। তারই ফল 'গণঐক্য জোট'।

বাইরের যে কেরা বুঝুক আর নাই বুঝুক, এতে অন্ততঃ দুইটা লাভ হইয়াছে। এক, কেন্দ্রীয় ও মিটির উনিশজনের মধ্যে মাত্র তিনজন শুধু সুঁই নন, একেবারে দশ নম্বরী সুঁই। সুঁই যত ছোট হয়, ঢুকিবার ক্ষমতা তার তত বেশি হয়। ঢুকিয়াই যে এরা কুড়াল হইতে পারিয়াছে, তার প্রমাণ জিলা কমিটির এগারোজনের মধ্যে দুইজন। আরও যত মফস্বলের

দিকে যাইবে, রেশিও তত বাড়িবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটিতে যখন পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করা যাইবে, তখন মর্যাদায় ত কুড়াল বেশ বড়ই হইয়াছে। দুই এলায়েন্সের একটা গালভরা নাম রাখা সম্ভব হইয়াছে। ভারতে কোনও নামই দেওয়া যায় নাই। পশ্চিম বাংলায় যদিও একটা নাম দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু সেটাকে ঐক্য বলা সম্ভব হয় নাই। বলা হইয়াছে ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স। কোথায় 'গণতান্ত্রিক মৈত্রী' আর কোথায় 'গণঐক্য'? আওয়ামী লীগ যত বড় পার্টিই হউক, একা তারা একটা দল মাত্র। ন্যাপ ত তাদেরই গৃহত্যাগী শরিক। তাঁদের মিলনে দলীয় ঐক্য হইত মাত্র। কিন্তু যেই তাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে যোগ করা হইল, অমনি ঘটনাটা হইয়া গেল 'গণ-ঐক্য'। গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া গেল। তবেই বুঝুন, গোটা দেশবাসী কোন্ দলের সাথে আছে। আর যে আট-দশটা তথাকথিত পার্টি বাহিরে পড়িয়া রহিল, ওরা কিছু না। দেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রুলিং পার্টি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আওয়ামী লীগ একটি দল মাত্র। আর কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে মিলিলেই সেটা হইয়া যায় 'গণ-ঐক্যজোট'। আওয়ামী লীগের এই স্বীকৃতিই কমিউনিস্ট পার্টির সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট হাতে লইয়া কমিউনিস্ট পার্টি কি না করিতে পারে? 'আর কয়টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।'

এই সুঁই কিভাবে কুড়াল হইতে পারে একবার তার হিসাবটা করুন। 'গণ-ঐক্যজোট' উচ্চারণের সুবিধার জন্য মুখে মুখে শীঘ্রই 'গণ-জোট' হইয়া যাইবে। মানেও একই। 'গণ' মানে 'আওয়াম', 'জোট' মানে সংঘ, সংঘের ইংরেজী 'লীগ'। 'লীগ-অব-নেশন্সও' ছিল জাতিসংঘ। 'ইউনাইটেড নেশন্সও' আছে জাতিসংঘ। 'সংঘও' বাংলা শব্দ, 'জোটও' বাংলা শব্দ তবে সংঘের চেয়ে 'জোট' শব্দটা জনগণের বেশি আপন। এইদিক হইতে 'গণ-জোটের' ভবিষ্যৎ উজ্জল। 'গণ-জোট' অতি সহজেই 'আওয়ামী লীগের' স্থান দখল করিতে পারে। 'আওয়ামী' শব্দটা আরবী। 'লীগ' শব্দটা সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক। এটা মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িকতার স্মৃতি বহন করে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্তকারী জিন্নার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। সংবিধানে আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছি। 'মুসলিম লীগ' ব্যান করিয়াছি। বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ও বই-পুস্তক হইতে জিন্নার নাম মুছিয়া ফেলিয়াছি। শুধু 'লীগ' শব্দটাই তাঁর কুখ্যাত স্মৃতি বহন করিতেছে। এটা মুছা অত্যাবশ্যক। আর বাংগালি জাতীয়তার ভিত্তিতে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় পূর্ণত্ব লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আরবী-ফার্সী শব্দের স্থলে 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার শুরু করিয়াছি। তারই পদক্ষেপ হিসাবে আমরা 'খবর' কাটিয়া 'সংবাদ' বসাইতেছি। 'আদমশুমারি'র বদলে 'লোকগণনা' বলিতেছি। 'গোলাম' ছাড়িয়া 'দাসত্ব' গ্রহণ করিয়াছি। এই 'প্রগতির' পরিণামে 'আওয়ামী লীগের' বদলে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম যদি 'গণ-জোট' হয়, তবেই প্রগতিবাদী সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

২৮ অক্টোবর, ১৯৭৩

ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ-যত আগে তত ভাল

'ইত্তেফাকে'র পাঠকদের ঈদ মোবারক। আর ইতিমধ্যে যে চারশ' বন্দী মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁরা ও তাঁদের পরিবারকে ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক। দুইবার।

ঈদুল ফেতরের আগের শুক্রবার বাংলাদেশ সরকার একটা ভাল কাজ করিয়াছেন। বাংলাদেশের চারশ' পরিবারের লোকের মুখে হাসি ফুটাইয়াছেন ও মনে আনন্দ দিয়াছেন। মানুষের মনে ব্যথা দেওয়া ও তার মুখে কান্না ফুটানো খুব কঠিন কাজ। তবু মানুষ এই কঠিন কাজটাই বেশি করে। আর মানুষের মনে আনন্দ দেওয়া ও তার মুখে হাসি ফুটানো অতি সহজ কাজ। তবু মানুষ এই সহজ কাজটা সহজে করিতে চায় না।

বাংলাদেশ সরকার সেদিন এই সহজ কাজটাই করিয়াছেন। দালালি অপরাধে অভিযুক্ত অর্ধ-লক্ষ লোকের মধ্যে চারশ' লোককে সেদিন জেল হইতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দিনটা ছিল শুক্রবার। মুসলমানদের জন্য পবিত্র দিন। সেটা ছিল আবার ঈদুল ফেতরের আগের দিনের আগের দিন। ঈদুল ফেত্‌রের দিনটা মুসলমানের আনন্দের দিন। যে সে আনন্দের দিন নয়। মামুলি খুশির দিনও নয়। ঈদুল ফেত্‌র মানে উপোস-ভাঙ্গার উল্লাস। এবারকার ঈদটা নানা কারণে অনেকের জন্যই উল্লাসের দিন ত দূরের কথা, মামুলি আনন্দের দিনও ছিল না। কিন্তু সরকারের অনুগ্রহে ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত চারশ' লোকের পরিবারের জন্য এটি ছিল সত্য-সত্যই উল্লাসের দিন। উল্লাসের একাধিক কারণ ছিল। এমনিতেই বন্দি-জীবন হইতে মুক্তি পাওয়া কয়েদীর জন্য উল্লাসের ব্যাপার। তাঁর পরিবারের জন্য আরও বেশি। দুই দুইটা বছর পরে বাবাকে পাইয়া পুত্র-কন্যারা, পুত্রকে পাইয়া মায়েরা, স্বামীকে পাইয়া স্ত্রীরা কি পরিমাণে খুশি হইয়াছেন, যাঁরা কোনও দিন জেলে যান নাই, তাঁরা বা তাঁদের পরিবাররা তা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

সরকার যে চার শ' বন্দীকে মাফ করিয়া অথবা মাফ চাহিয়া খালাস দিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু উকিল আছেন। উকিল সম্প্রদায়টাই খারাপ। এঁরাই দেশে যত ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দেশবাসী এঁদেরে লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় আছে। বঙ্গবন্ধুও এঁদের হাত হইতে রেহাই পাইতেছেন না। সব কাজেই ফ্যাকড়া বাহির করা এঁদের স্বভাব। চার শ' বন্দী-মুক্তি লইয়াও এঁরা ফ্যাকড়া বাধাইবার তালে রহিয়াছেন। ক্ষমা করিয়াই থাকুন, আর ক্ষমা চাহিয়াই থাকুন, কাজটা করিলেন কে? এটা আবার তর্কের বিষয় কি? তবু উকিলরা বলিতেছেন, আমাদের সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদের হাশিয়ায় লেখা আছে: 'ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার।' ভিতরে বলা হইয়াছে "মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত ও হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।" আমাদের সংবিধানের এই আইন ঠিকই হইয়াছে। আমরা বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমের সংবিধান গ্রহণ করিয়াছি। এই বিধান মতে প্রেসিডেন্ট বা

রাষ্ট্রপতি হেড-অব-দি স্টেট। আর প্রাইম মিনিস্টার বা প্রধানমন্ত্রী হেড-অব দি গবর্ণমেন্ট ক্ষমা প্রদর্শনটা হেড-অব-দি স্টেটের প্রেরোগেটিভ। বৃটিশ সিস্টেমেই শুধু নয়, সভ্য জগতের সব রাষ্ট্রেই যেখানে হেড-অব-দি স্টেট ও হেড-অব-দি গবর্ণমেন্ট একই ব্যক্তি নন, সেখানেই এই কাজটি হেড-অব-দি স্টেটের এলাকা। আমাদের সংবিধানের বাংলা পাঠে 'মার্জনা,' 'বিলম্বন' ও 'বিরাম' এই যে তিনটি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এ তিনটি শব্দ ইংরাজি 'পারডন', 'রি-প্রিভ্' ও 'রেসপাইট' এই তিনটি শব্দের বাংলা তর্জমা। তিনটি ক্রিয়াই বৃটিশ ক্রাউনের অতীত প্রাচীন প্রেরোগেটিভ। বৃটিশ পার্লামেন্ট সর্বক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও 'রাজার এই বিশেষ অধিকারে কদাচ হস্তাক্ষেপ করে নাই।' বৃটিশ সরকারও তেমনি রাজার বিবাহ-শাদিতে বাধা দিয়া থাকিলেও এই প্রেরোগেটিভে বাধা দেন নাই বা নিজ হাতে গ্রহণ করেন নাই। বৃটিশ বিচার বিভাগও এ বিষয়ে বরাবর সতর্ক রহিয়া গিয়াছে। ৩৪ ক্রিমিনাল ল' জার্নালের ৪৪৭ পৃষ্ঠায় রিপোর্টেড মোকদ্দমায় প্রিভি-কাউন্সিল ১৯৩৩ সালে রায় দিয়াছিলেন; 'ক্ষমা-মার্জনা ইত্যাদি রাজার প্রেরোগেটিভ। সরকার অথবা বিচার বিভাগের এ ক্ষেত্রে কোনও ক্ষমতা নাই। সরকার এ ব্যাপারে রাজার কাছে সুপারিশ করিতে পারেন মাত্র। রাজতন্ত্রে রাজাই হেড-অব-দি স্টেট। প্রজাতন্ত্রে হেড-অব-দি স্টেট প্রেসিডেন্ট। সব প্রজাতন্ত্রের মতই আমাদের রাষ্ট্রেও ক্ষমা প্রদর্শনের বিশেষ অধিকার বা প্রেরোগেটিভ রাষ্ট্রপতির। সরকারের বা প্রধানমন্ত্রীর নয়।

হেড-অব-দি স্টেটের বিশেষ অধিকার ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের সৃষ্ট আরেক প্রকার ক্ষমার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে রাষ্ট্র প্রধানকে। ১৮৯৮ সালের রচিত ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪০১ ধারায় বিধান করা হইয়াছে, যে কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি দণ্ড সাস্‌পেণ্ড করা, রেমিট করা, অথবা কমিউট করার অধিকার গবর্ণর জেনারেল অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রাদেশিক গবর্ণরের আছে। স্বাধীন বাংলাদেশে গবর্ণর জেনারেলের ঐ ক্ষমতাই এখন রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত আছে। আমাদের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে যে 'দণ্ড মওকুফ' স্থগিত ও হ্রাস করিবার ক্ষমতার উল্লেখ আছে, তা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনে ঐ ৪০১ ধারায় বর্ণিত সাস্‌পেনশন,' 'রিমিশন' ও 'কমিউটেশন' শব্দত্রয়েরই বাংলা তরজমা। আমাদের সংবিধানমতে এবং বহুদিনের রেওয়াজ মোতাবেক এই ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী রাষ্ট্রপতি। প্রিভি-কাউন্সিলের রায় অনুসারে সরকার এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির বরাবরে সুপারিশ করিবার অধিকারী মাত্র। কাজেই সেদিন আমাদের জেলখানা হইতে যে চারশ' বন্দী মুক্তি পাইলেন, তাঁদের যদি সত্যই ক্ষমা করা হইয়া থাকে তবে সেটা প্রধানমন্ত্রী করেন নাই। করিয়াছেন রাষ্ট্রপতি। অবশ্য রাষ্ট্রপতি করিয়াছেন, মানেই আসলে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশেই করিয়াছেন। তবু সংবিধানের বিধিমতে ক্ষমাটা রাষ্ট্রপতির। প্রধানমন্ত্রীর কাজটা ক্ষমার সুপারিশ মাত্র। এ অবস্থায় যদি কেউ বলিয়া থাকেন অথবা লিখিয়া থাকেন যে, ক্ষমা প্রদর্শনটা প্রধানমন্ত্রী করিয়াছেন,

তবে তিনি এক কাজে দুইটা অন্যায় করিয়াছেন। এক. সংবিধান লংঘন করিয়া যুগপৎভাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অসম্মান করিয়াছেন। দুই. আইনের দিক হইতে ক্ষমাটা অসিদ্ধ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ক্ষমা যদি সংবিধান মোতাবেক না হওয়ার দরুন অসিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে ত তাঁদের মুক্তিটাই অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আইন ও মনের দিক হইতে তাঁরা সবাই চিন্তায় পড়িয়াছেন; তাঁরা কি জেলের বাহিরে আছেন, না ভিতরে আছেন? দেহ ও নিরাপত্তার দিক হইতে তাঁদের মনে সর্বদাই তাঁদের মুক্তি বাতিলের আশংকা থাকিবে। এ সবই উকিলদের চুলচেরা কু-তর্ক।

কিন্তু সরকার পক্ষেও উকিল আছেন। তাঁদেরও যুক্তি আছে। তাঁরা বলিবেন, সংবিধানের ৪৯নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমার অধিকার বর্ণিত হইয়াছে, সে ক্ষমা আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের বেলাই প্রযোজ্য। বিচারের আগে সে ক্ষমতার প্রশ্নই উঠে না। দণ্ডাদেশ হওয়ার আগে দন্ড মার্জনা, বিলম্বন, মওকুফ বা হ্রাসের প্রশ্ন কি করিয়া উঠিতে পারে? এটা রাষ্ট্রপতির বিশেষ প্রেরোগেটিভ ও ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪০১ ধারায় দেওয়া ক্ষমতা উভয় অধিকারের বেলাই সত্য। বিচার হওয়ার আগে আসামীকে বিনাশর্তে বা শর্তাধীনে মুক্তিদান করা বা তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া এ সব অধিকারই সরকারের। তার মানেই প্রধানমন্ত্রীর। অতএব, সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত চার'শ বন্দীকে প্রধানমন্ত্রীর মার্জনা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া মোটেই সংবিধানবিরোধী হয় নাই। ঠিক আইন মোতাবেকই হইয়াছে। তাঁদের মুক্তি অসিদ্ধ হওয়ার আশংকা অমূলক।

প্রধানমন্ত্রীর মার্জনায় যাঁরা মুক্তি পাইলেন, তাঁরা ত উপকৃত হইলেনই, যাঁদের মামলা আজো বিচারাধীন আছে, তাঁরাও এই মার্জনায় পরোক্ষভাবে উপকৃত হইলেন। এখন উকিলরা তাঁদের কাজে লাগিতে পারেন। এতদিন এ সুবিধা ছিল না। "দালালি" এমন একটা সাংঘাতিক অপরাধ যে কারো বিরুদ্ধে দালালির অভিযোগ আনা মাত্র তিনি দালাল হইয়া যান। দালালের পক্ষে উকালতি করাও দালালি। কাজেই দালালি অপরাধে অভিযুক্ত আসামীরা প্রায়ই উকিল পাইতেন না। এ দালালি মানে 'কলেবোরেশন'। 'কলেবোরেশন' হইলেও এটা কিন্তু 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কলেবোরেশনের' নয়। 'লিটারারি বা আর্টিষ্টিক কলোবোরেশন'ত নয়ই। 'কলেবোরেশনের' অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুর সহিত সহযোগিতা। কাজেই গুরুতর অপরাধ। অপরাধ এমন গুরুতর বলিয়াই তার অভিযোগটাই যথেষ্ট। প্রমাণের দরকার নাই। এই কারণেই দালালি অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। কারণ দেশপ্রেমিক তরুণরা ইচ্ছুক উকিলদের বাড়ি বহিয়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া আসিতেন। সদাশয় সরকার তাই আসামীদের পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য সরকারী খরচে উকিল নিযুক্ত করিয়া দিতেন। আসামীদের নিজের খরচে নিযুক্ত উকিলদের প্রতি দেশপ্রেমিক তরুণরা যেরূপ বিরূপ হইতেন সরকারী খরচে নিয়োজিত উকিলদের প্রতি তাঁরা তেমন বিরূপ

ভাব দেখাইতেন না। আইনের প্রতি তাঁদের অসামান্য শ্রদ্ধা ও সরকারের প্রতি তাঁদের অসাধারণ আনুগত্যেরই এটা লক্ষণ। যা হোক, আমাদের জনপ্রিয় সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী দালালদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছেন দেখিয়া দেশপ্রেমিকরাও নিশ্চয়ই অতঃপর তাদের প্রতি সহৃদয় হইবেন। এখন হইতে বাকি আসামীদের বিচারের সময় তাদের পক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া উকিলরা যাতে সরকারী তহবিল হইতে কেস্ নিতে বাধ্য না হন সেদিকে আশা করি তাহারা নজর রাখিবেন।

এইখানেই নতুন সমস্যা উদ্ভবের আশংকা দেখা দিয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় আমরা জানিতে পারিলাম, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন হাজার আসামীর বিচার হইয়া গিয়াছে। আরও সাঁইত্রিশ হাজার বাইশজনের বিরুদ্ধে চার্জশীট হইয়াছে। বাইশ মাসে যদি তিন হাজার জনের বিচার হইয়া থাকে, তবে মাসে গড়ে ১৩৬টা, তার মানে দৈনিক চারটা বিচার হইয়াছে। স্মরণীয় যে, দেশপ্রেমিক তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ খুব বেশিসংখ্যক উকিল দালালদের পক্ষে ওকালতি করেন নাই। যাঁরা করিয়াছেন, তাঁরাও খুব বেশি জেরা-জবানবন্দির ঝামেলায় যান নাই। এখন সরকার দালালদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করায় উকিলরাও জেরা-জবানবন্দিতে স্বভাবত:ই অধিকতর সহৃদয় সাহস প্রদর্শন করিবেন। তাতে প্রতি মোকদ্দমায় তুলনামূলকভাবে সময় বেশি লাগিবে। বেশি সময়ের কথা বাদ দিয়াও এই হিসাবে ধরিলেও বাকি ৩৭০২২ জন আসামীর বিচার করিতে ২৩ বছর সময় লাগিবে। এতদিন মন্ত্রীরা সকলে খোদার ফজলে বাঁচিয়া থাকিলেও সব আসামী এবং অনেক সাক্ষী বাচিয়া থাকিবেন কি না, সন্দেহ আছে।

রাখেন, রাখেন, পাঠক ভাই-বোনেরা। আপনারা আগেই আমার ভুল ধরিবেন না। আমি নিজেই আমার হিসাবের ভুল ধরিয়া ফেলিয়াছি। এই সোজা কথাটা আমার বোঝা উচিত ছিল যে, আমাদের সরকার গদিতে বসিয়াই বিচার শুরু করিতে পারেন নাই। গদিতে বসিয়াই গ্রেফতার শুরু করিয়াছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিচার শুরু করিতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল। সব রাজনৈতিক অপরাধের মতই দালালির বেলাও আগে গ্রেফতার, তারপর অভিযোগ, তার আরও পরে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড়। সব জনপ্রিয় সরকারের মতই বাংলা সরকারও গোড়ায় ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে যে, তাঁরা 'উইচ হান্টিং' করিবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ওয়াদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্বভাবতঃই পারেন নাই। দুনিয়ায় কয়টা সরকার নিজেদের সব ওয়াদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? অতএব গ্রেফতার করা দালালদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করিতে সময় লাগিয়াছিল। কতদিন সময়? যেখানে একটা শিশু-সন্তান তৈয়ার করিতে দশ মাস সময় লাগে, সেখানে দালালদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড়ে ওর কম সময় নিশ্চয়ই লাগে নাই। বিশেষতঃ ঘটনার সময় ত আমাদের সরকার ও তাঁদের কর্মচারীরা মুজিবনগরে ছিলেন। এইসব অবস্থা বিচার করিয়া ধরা যাক, বিচার শুরু করিতে দশ মাস সময় লাগিয়াছিল। বাইশ হইতে বিয়োগ করুন দশ। হাতে থাকে বার। এই বার মাসে তিন

হাজার হইলে মাসে হইল আড়াই শ। দালালির বিচার ছাড়াও হাকিমদের আরও মামলা মোকদ্দমা আছে। সে হিসাবে মাসে আড়াই শ ভাল পারফর্মেন্স। সরকার অনুকম্পা দেখাইবার পর আসামীদের পক্ষে উকিলের ভিড় হইতে পারে। ফলে এই রেইট ঠিক নাও থাকিতে পারে। তবু যদি এই রেইট ধরা যায়, তবে মাসে আড়াই'শ হারে সাঁইত্রিশ হাজারে ১৪৮ মাস, মানে বার বছর লাগিবে বিচার শেষ হইতে। হায়াত-মওতের ব্যাপারে আমার আগের হিসাব ঠিক না থাকিলেও খুব কমও হইবে না।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সরকার যখন একবার অনুকম্পার দরজা খুলিয়াছেন, ষোল হাজারের মতো বন্দীকে মাফ করিয়া দিয়াছেন, তখন বাকি সবার ক্ষেত্রেও তেমনি উদারতা প্রদর্শন করুন। অন্যথায় দুই বছর পরে আজ যেমন চার'শ লোককে প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হইল বার বছর পরে মানে গেরেফতারের সময় হইতে চৌদ্দ বছর পরে আরও অনেক লোককে তেমনি মুক্তি দিতে হইতে পারে। সেটা কি ভাল দেখাইবে?

সরকারের সর্বশেষ প্রেসনোটে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার ও সহজ হইয়াছে। আগের সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়াতেই তাঁদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষ প্রেসনোটে বলা হইয়াছে, তাঁদের বিরুদ্ধে দালালির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এবং অনেকের বিরুদ্ধে নরহত্যা, বলাৎকার, গৃহদাহ ইত্যাদি অভিযোগের তদন্তকার্য চলিতে থাকা অবস্থাতেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর মার্জনা চাহিয়া দরখাস্ত এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া বণ্ড দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তাদের মার্জনা করিয়াছেন। এটা তিনি যোগ্য জাতীয় নেতার কাজই করিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যর হলফ করিলেই যদি বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর একজনকেও বন্দী রাখতে হইবে না। সবাই এই মর্মে হলফ করিতে বা বণ্ড সহি করিতে রাজি হইবেন। আমি একাধিক বার বলিয়াছি, আজো বলিতেছি, সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন আসামীদের প্রায় সকলেই রাজনৈতিক ভিন্নমতের দরুনই কথিত কাজ তখন অপরাধ ছিল না। আমার বিশ্বাস ওদের মধ্যে বাংলাদেশ বিরোধী একজনও পাওয়া যাইবে না। দেশের প্রতি আনুগত্যে তাঁরা কেউ আমাদের পিছনে পড়িবেন না। আমার বিনীত প্রস্তাব, এই শর্তে দণ্ড-প্রাপ্ত ও বিচারাধীন সকলকে মুক্তি দেওয়া হউক। দি আর্লিয়ার দি বেটার।

২রা নভেম্বর, ১৯৭৩

পাট ব্যবসা বাঁচাইবার চেষ্টা এই মুহূর্তেই করিতে হইবে

আবার পাটের কথাতেই ফিরিয়া আসিতে হইল। গত ২৪শে আগষ্টের ইত্তেফাকে 'সোনার বাংলায় সোনালী আঁশ' কি অনাবশ্যক সাব্যস্ত হইল?' এই শিরোনামার নিবন্ধে লিখিয়াছিলাম: "বিদেশে পাট রফতানীর ব্যাপারে আমাদের পাট রফতানী কর্পোরেশনের চুক্তি ভংগের ফলে বিদেশী খরিদ্দাররা আমাদের প্রতি আস্থা হারাইয়া কলিকাতার বাজারে পাট খরিদের অর্ডার দিয়াছেন। এতে কলিকাতার শিপারদের প্রতি বিদেশী খরিদ্দারদের আস্থা প্রমাণিত হইতেছে। সে আস্থার প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বেল প্রতি তিন স্টার্লিং পাউণ্ড বেশি দাম দিতেছেন।" আমার নিবন্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পাট মন্ত্রণালয়ের তরফ হইতে প্রকাশিত হ্যাণ্ড আউটে কলিকাতার বাজারে বাংলাদেশের পাট খরিদের কথাটাকে গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, কথাটা 'সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য'। 'সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য' বলিয়াছিলেন বোধ হয় এই কারণে যে, বিদেশী পাট খরিদ্দাররা দেশ বাঁটোয়ারা হওয়ার পর কলিকাতা হইতে আর পাট খরিদ করেন নাই। কারণ ভারত কাঁচা পাট বিদেশে বিক্রিই করে না। কথাটা আমি নিজেই উক্ত নিবন্ধে বলিয়াছিলাম এইভাবে: 'বিদেশী পাট খরিদ্দাররা কলিকাতায় পাট ক্রয়ের যে অর্ডার দিয়াছেন, সেটা যে বাংলাদেশেরই পাট তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ভারত যে পাট উৎপাদন করে, তাতে কাঁচা পাট রফতানী করিবার মতো উদ্বৃত্ত পাট ভারতের হাতে থাকে না। তাছাড়া ভারতে যে শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হয়, বিদেশী কলওয়ালারাও তা কিনেন না। সেগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট।'

অর্থ ও পাট দফতরের ঐ হ্যাণ্ড আউটের জবাবে আমি ৭ই সেপ্টেম্বরের 'ইত্তেফাকে' 'প্রস্তাবিত জুট ইন্টারন্যাশনালের উভয় দিক দেখিতে হইবে'— শীর্ষক আরেকটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে আমি লিখিয়াছিলাম: "বিলাতী খরিদ্দারদের কলিকাতার বাজারে পাট কিনার কথাটাকে সরকার তাঁহাদের হ্যাণ্ড আউটে 'ভিত্তিহীন গুজব' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। সরকারী ধারণাই সত্য হউক। কিন্তু বর্ডার প্যাক্ট চালু থাকাকালে চোরাচালানের সমস্ত অভিযোগকেও সরকার এমনি ভিত্তিহীন গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐ সব অভিযোগের 'ভিত্তি' পাওয়া যাওয়ায় সরকার অবশেষে

বর্ডার প্যাক্ট বাতিল করিয়া দিয়াছেলেন। কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বিলাতী খরিদ্দারের কলিকাতার পাট কিনিবার 'গুজবটার' অবস্থাও তাই না হয়, সেদিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।"

পরে জানা গিয়াছিল যে, বাংলাদেশ সরকারের 'সজাগ দৃষ্টি' সত্ত্বেও বিলাতী পাট খরিদ্দাররা কলিকাতা হইতে এক লক্ষ বেল পাট তিন হইতে পাঁচ পাউণ্ড বেশি দাম দিয়া খরিদ করিয়াছিলেন? জানাইয়াছিলেন, খরিদ্দার নিজেরাই। জানাইতে তাঁদের কোনও লজ্জা ছিল না। কারণ, তাঁরা কোন অন্যায় কাজও করেন নাই। আমাদের সাথে চুক্তি-ভংগও করেন নাই। বরং আমরাই চুক্তি-ভংগ করিয়াছিলাম বলিয়া তাঁদের প্রয়োজনমত পাট তাঁরা অন্যত্র কিনিয়াছিলেন। আমার 'বান্ধা খরিদ্দার' হইয়াও আপনি অন্য দোকান হইতে জিনিস কিনিবেন যদি আমার দোকানে সে জিনিস না থাকে অথবা আমি সাপ্লাই দিতে না পারি। গতবার আমরা চুক্তিমত পাট সরবরাহ করিতে পারি নাই, চুক্তির চেয়ে দুই লক্ষ বেল কম রফতানী করিয়াছিলাম, এটা আমাদের সরকার স্বীকার করিয়াছেন। এইবার বলুন, আমরা পাট দিতে পারিলাম না বলিয়া বিলাতী পাটকলওয়ালারা কি কল বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবেন? না, অন্যত্র পাট খরিদ করিয়া তাঁদের কল চালু রাখিবেন? আপনার নিজের কল হইলে কি করিতেন? যেখান থেকে পাওয়া যায়, সেখান থেকেই কিনিতেন নিশ্চয়ই। বিলাতের কলওয়ালারা ঠিক তাই করিয়াছেন। অন্যত্র পাট খরিদ করিয়াছেন। এই অন্যত্রটা যে-কোনও জায়গা হইতে পারে। কলিকাতা হইতে দোষ কি? কলিকাতা পাট ব্যবসায়ীদের সাথে আমাদের কি কোনও চুক্তি আছে যে তাঁরা বিদেশে কাঁচা পাট রফতানী করিতে পারিবেন না? কলিকাতার চোরাচালানীদের সাথে আমাদের কি কোনও চুক্তি আছে যে, তাঁরা আমাদের পাটটা দয়া করিয়া স্মাগলিং করিবেন না? নিশ্চয়ই ভারত সরকারের সাথে আমাদের তেমন চুক্তি আছে। বন্ধুত্বও আছে। চোরাচালান বন্ধ করিবার সাধ্যমত চেষ্টাও তাঁরা করিতেছেন। চোরাচালানীদের গুলী করিতেছেন। কিন্তু চোরাচালান একেবারে বন্ধ করা কোনও সরকারের পক্ষেই সম্ভব না। হাজার শক্তিশালী সরকার হইলেও না। বর্তমান বিশ্বের শক্তিশালী সরকার যে মার্কিন সরকার তাঁরাও নিজ দেশের ভিতর-বাইরের চোরাচালান বন্ধ করিতে পারেন নাই। পাটের চোরাচালান বন্ধ করার উপায় সীমান্ত সীল করাও নয়, গুলী চালানোও নয়। সীমান্তের দুই পারেই যখন পাট দেওয়া-নেওয়ার চোরারা সগৌরবে অবস্থান করিতেছেন তখন 'মিয়া বিবি রাজী, কি করিবেন কাজি'? আরও মনে রাখতে হইবে, ভারতে পাট বা

পাট-ব্যবসা কোনওটাই রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। আমি আগেই বলিয়াছি ভারত সরকারের জুট কর্পোরেশন ভারতীয় পাটকল সমিতির (ইজমার) কাছে কিছু না। শক্তিতেও না, প্রভাবেও না, দেশ-বিদেশে ব্যাপ্তিতেও না। এঁরা কারা? এরা আসলে ডাণ্ডিরই চাচাত ভাই। অথচ এই ডাণ্ডি-ওয়ালারাই দুই যুগের অধিককাল হইতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ হইতে আমাদের পাট খরিদ করিয়া চাটগাঁ-চালনা দিয়াই সে পাট নিতেছিলেন। স্বাধীনতার পর হইতেই ডাণ্ডির কলওয়ালারা তারস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন, বাংলাদেশ সরকারের কাছে নালিশ করিতেছিলেন; ঢাকায় প্রতিনিধি পাঠাইতেছিলেন একটিমাত্র কথা বলিতে। কথাটি এই যে, তাঁরা নির্ধারিত সময়ে, চুক্তি মোতাবেক পরিমাণ পাট পাইতেছেন না। তাতে তাঁদের পাট-শিল্পে সংকট দেখা দিয়াছে। আমাদের সরকার নিশ্চয়ই এসবের যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়তও দিয়াছেন। 'আমরা নয়া রাষ্ট্র। বর্বর পাক-বাহিনী আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া গিয়াছে, এগুলি মেরামত করিতে কিছুটা সময় লাগিবে, কাজেই আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়'। বিলাতী খরিদ্দাররা নিজ চক্ষে দেখিয়াও গিয়াছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, আমাদের ত্রুটি-অসুবিধার অনেকগুলিই সত্য ও স্বাভাবিক। অনেকগুলি আবার আমাদের নিজ হাতে তৈয়ারিও। স্বাভাবিকই হউক; আর আমাদের তৈয়ারিই হউক, এসব ত্রুটির ফলে যদি তাঁরা ঠিকমত পাট না পান, তবে তাঁরা ত আমাদের খাতিরে তাঁদের পাটশিল্প ধ্বংস হইতে দিতে পারেন না।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই ভারত সরকারের কাচাপাট রফতানীর সিদ্ধান্তের সর্বশেষ খবরটির আলোচনা করা যাক। ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ইউরোপীয় কমন মার্কেটের রাষ্ট্রসমূহের সহিত আলোচনা শেষে দেশে ফিরিয়া ঘোষণা করিয়াছেন: 'এবার ভারত সরকার পাঁচ লাখ বেল কাঁচাপাট রফতানী করিবেন। কমন মার্কেটের দেশসমূহ ভারতের রফতানী করা কাঁচাপাটের উপর ট্যাক্সের শতকরা চল্লিশ টাকা এবার কমাইবেন। পরের বছর আরও কুড়ি টাকা কমাইবেন।'

এই খবরটির তিনটা দিক আছে। এক, ভারতের দিক; দুই, বিদেশী পাট খরিদ্দারের দিক; তিন, বাংলাদেশের দিক। প্রথমতঃ, ভারত এবার হইতে প্রকাশ্যভাবে বিদেশের কাঁচাপাটের বাজারে অবতীর্ণ হইল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতকে এ কাজে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় খরিদ্দার দেশসমূহ ভারতের রফতানী করা পাটের উপর শতকরা মওকুফ করিয়া দিল। তৃতীয়তঃ, এই বছরই পাঁচ লাখ বেল কাঁচা পাটের বাজার

বাংলাদেশ হারাইল। আর বরাবরের জন্য বিদেশী কাঁচা পাটের বাজার ভারত বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। পাঠকগণের মধ্যে যারা জানেন না, তাঁদের জানিয়া রাখা ভাল যে, এতদিন কাঁচা পাটের বিদেশী বাজারে ভারত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পাকিস্তানের পঁচিশ বছর ভারত বিদেশী কাঁচা পাটের বাজারে যায় নাই এই জন্য যে, রফতানী করিবার মতো পাটই ভারতের ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশ আমলের দুই বছরও সেই কারণেই ভারত বিদেশে কাঁচাপাট রফতানী করে নাই। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে বোঝা গেল, এই দুই বছর ভারত সরকার কাঁচাপাট রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন। মিঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিবৃতিতে বলিয়াছেন: 'গত দুই বছর কাঁচাপাট রফতানির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, ভারত সরকার এবার হইতে তা উঠাইয়া নিলেন। কারণ, এবার আশাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়াছে। তাছাড়া কাঁচাপাট রফতানি করিলে পাট চাষীরাও দামের দিক দিয়া লাভবান হইবেন।'

কাঁচাপাট রফতানির উপর ভারত সরকার গত দুই বছর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া থাকিলে তা বোধ হয় বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের খাতিরেই করিয়াছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার এই পদক্ষেপ নিয়াছিলেন কি না, জানি না। তবে, ভারত সরকারের এ কাজে বাংলাদেশের যে প্রভূত উপকার হইয়াছিল, অথবা হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বাংলাদেশ সরকার সে সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলেও সেজন্য ভারত সরকারকে দোষ দেওয়া যায় না। বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের সদিচ্ছাও তাতে অর্থহীন হইয়া যায় নাই। এবার হইতে কাঁচা পাট রফতানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লওয়াতেও ভারত সরকারকে আমরা দোষ দিতে পারি না। কারণ, কাঁচাপাট রফতানি না করা সম্বন্ধে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে অথবা তাঁদের পূর্ববর্তী পাকিস্তান সরকারের সাথে কোনও প্রকার চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না। রফতানিযোগ্য পাট ভারতের ছিল না বলিয়াই এতদিন ভারত কাঁচাপাট রফতানিযোগ্য করেন নাই। এখন তেমন পাট তাঁদের হইয়াছে। তাই তাঁরা রফতানি শুরু করিয়াছেন। আগে রফতানিযোগ্য পাট ভারতের ছিল না বলিয়া কোনও দিনই হইবে না, এমন কোন কথা নাই। তাছাড়া আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ধান ক্ষেত ভাঙ্গিয়া পাট বুনিতে ভারতকে আমরাই বাধ্য করিয়াছিলাম। দেশ বাঁটোয়ারার সময় ভারতের ভাগে পড়িয়াছিল সবগুলি পাটকল; আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল প্রায় সবটুকু পাটের জমি। আমরা যদি ভারতের পাটকলগুলির খোরাকি-আন্দাজ পাট

সরবরাহ করিতাম, তবে ভারত পাট চাষের জন্য অতঅত উদ্যোগ আয়োজন করিতে বাধ্য হইত না। কিন্তু আমাদের তৎকালীন শাসকরা ভারতকে তাদের প্রয়োজনমত পাট দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ভারত নিজেদের কলগুলি চালু রাখিবার তাদিগেই যথাসম্ভব পাট উৎপাদন শুরু করে এবং প্রয়োজনের বাকি অংশ আমাদের দেশ হইতে স্মাগলিং করিয়া নিতে থাকে। শুধু সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে এই নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা হয়। এই সময়কার পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি তিন বছর মেয়াদে ছয় লাখ হইতে আঠার-লাখ বেল পাট বেচা-কেনার ব্যবস্থা হয়। তিন বছরের মেয়াদের এই চুক্তি সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর আর চালু রাখা হয় না। সেই হইতে ভারত পাটের আবাদ ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকে। প্রথম উদ্যোগেই উৎকৃষ্ট মানের পাট উৎপন্ন না হওয়াতে এবং আমাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ভাল পাট না পাওয়াতে ভারতীয় পাটকল-ওয়ালারা স্মাগলিং করিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই ব্যবস্থাই এতদিন চলিয়া আসিতেছিল।

এবার হইতে অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। ভারত নিজ প্রয়োজন মিটাইয়াও কাঁচাপাট চালান দিতে শুরু করিয়াছে। বিদেশী খরিদ্দারদের নিকট হইতে বিশেষ সুবিধাও আদায় করিতে পারিয়াছে। আসলে গত বছর হইতেই ভারত বিদেশে কাঁচাপাট রফতানি শুরু করিয়াছে। গতবারই বিলাতী খরিদ্দাররা কলিকাতার বাজার হইতে এক লাখ বেল কাঁচাপাট খরিদ করিয়াছেলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তা জানিতেন না। এবারের পাঁচ লাখ বেল বেচা-কেনার খবরটা তাঁরা না জানিয়া পারিবেন না। জানিয়াও কিছু বলিতে পারিবেন না। কারণ ভারত স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিবে, রফতানীযোগ্য উন্নতমানের পাট এবার তাদের নিজের ক্ষেতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হইবে না কেন? বাঁটোয়ারার সময় ভারতের ভাগে পড়িয়াছিল মাত্র তের লাখ বেল। আবাদ বাড়াইয়া সেটা এবার হইয়াছে পঁচাত্তর লাখ বেল। ভারত সরকার আশা করিয়াছিলেন তেষট্টি লাখ বেল। সে জায়গায় উৎপন্ন হইয়াছে পঁচাত্তর লাখ। এরই নাম আশাতিরিক্ত উৎপাদন। পঁচিশ বছরে ভারতের পাট পরিমাণে পাঁচ গুণের বেশি বাড়িয়াছে, গুণের দিকে কিছুই বাড়ে নাই। এটা হইতে পারে না। কাজেই ভারতের গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক হইতেই রফতানিযোগ্য পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এতে আশ্চর্যজনক অস্বাভাবিক কিছু নাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভারতে রফতানি করিবার মতো পাট উৎপন্ন হইলেই সে পাট আমদানি করিবার মতো নয়া পাট খরিদ্দার ত উৎপন্ন হয় নাই। যে সব দেশ পুরুষানুক্রমে আমাদের পাট খরিদ ও তাহাদের কলে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তারা

হঠাৎ আমাদের চেনা ও পরীক্ষিত পাট ফেলিয়া ভারতের অচেনা ও অপরীক্ষিত পাটের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কেন, এর উত্তর তালাশ করিতে হইবে ভারতে নয়, বিদেশেও নয়, আমাদের এই বাংলাদেশেই। বিদেশীরা ইচ্ছা করিয়া আমাদেরে ছাড়ে নাই, ভারত ক্যানভাস করিয়া আমাদের পুরান খরিদ্দার ভাগাইয়াও নেয় নাই। আমরাই আমাদের গাফিলতির দ্বারা চৌদ্দ পুরুষের খরিদ্দার তাড়াইয়া দিয়াছি। এই গাফিলতির দ্বারা আমরা দেশে দুইটা বড় অনিষ্ট সাধন করিতেছি। স্থূলদৃষ্টিতে মনে হইবে এর একটা প্রত্যক্ষ ক্ষতি; অপরটা পরোক্ষ ক্ষতি। আসলে কিন্তু দুইটাই প্রত্যক্ষ। দুইটাই সোজাসুজি আমাদের সহিত করিতেছে। তার একটা এই যে, আমাদের পাট ব্যবসা ও পাটশিল্প ধ্বংস করিয়া আমাদের জাতীয় অর্থনীতির চিরস্থায়ী অনিষ্ট করিতেছে। অপরটা এই যে, আমাদের এই চিরস্থায়ী জাতীয় অনিষ্টের জন্য ভারতই দায়ী, গণমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। তাতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অবিশ্বাস ও তিক্ততা সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতি রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও প্রতিরক্ষিক নিরাপত্তার জন্য ভারতের বন্ধুত্ব এক অমূল্য সম্পদ। বর্তমান শাসকবর্গ ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এ বিষয়ে সচেতন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের মনে ভারত-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করিতেছেন এঁরাই। তাঁরা না জানিয়া না বুঝিয়াই এসব করিতেছেন তাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষতি যাতে হয়, না জানিয়া করিলেও তা হয়। আমাদের সরকার যে সব কাজের দ্বারা বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করিতেছেন পাট-নীতিটা তার অন্যতম। তাঁরা ভুলিয়া যাইতেছেন যে পাটের ব্যাপারে ভারত আমাদের বৃহত্তম প্রতিদ্বন্দ্বী। একজনের ক্ষতিতে আরেকজনের লাভ হইবে স্বাভাবিকভাবেই। আমাদের অযোগ্যতা-অবহেলায় আমাদের পাট সম্পদের যে পরিমাণ লোকসান হইতেছে ভারতের সেই পরিমাণে লাভ হইতেছে। দুনিয়ার বাজারে আমাদের কারবার যত ক্ষীণ হইতেছে, ভারতের কারবার তত ফাঁপিতেছে। আমাদের পাট-কল যত নিষ্ক্রিয় হইতেছে, ভারতের পাটকলের সংখ্যা তত বাড়িতেছে। এর একটার জন্যও ভারত দায়ী নয়। সরকারী স্তরেও না, জনগণের স্তরেও না। অথচ আমাদের জনগণ এসবের জন্য নাহক ভারতকেই দায়ী করিতেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের জনগণও নিশ্চয়ই আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইতেছে। এইভাবেই ভুল বুঝাবুঝি হইতেছে। পাটের ব্যাপারে গাফলতিটা আমাদের সরকারের। তার ফলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হইলে সেটা দূর করার

দায়িত্বও আমাদের সরকারেরই। আমাদের জনগণকে বুঝান দরকার যে ভারতে পাট-শিল্প বা পাট-ব্যবসায় কোনোটাই রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। কাজেই পাট-শিল্পপতি ও পাট ব্যবসায়ীদের কাজের জন্য সোজাসুজি ভারত সরকারকে দায়ী করা যায় না। পক্ষান্তরে, ভারতের জনগণের এবং সরকারেরও বুঝা দরকার পাট ভারতের বিদেশী মুদ্রার শতকরা সতর ভাগ আয় করে; আর বাংলাদেশ করে শতকরা বিরাশি ভাগ। পাট সম্পদ নষ্ট হইলে ভারতের কিছু যায় আসে না। পক্ষান্তরে, পাট গেলে বাংলাদেশ মরিবে। কাজেই পাটের বিপদে বাংলাদেশের জনগণ যে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যায় সেটা স্বাভাবিক।

অথচ আজ আমাদের পাটের কপালে তাই ঘটিতেছে এবং আমাদের সরকারের দোষেই তা ঘটিতেছে। পাট-শিল্পের বেলাও, পাট-ব্যবসার বেলাও। পাট-শিল্পের কথা আরেকদিন বলিব। আজ পাট-ব্যবসায়ের কথাটা যখন উঠিয়া পড়িয়াছে, তখন এটাই আগে বলিয়া নেই।

গত বুধবারের 'ইত্তেফাকে' 'পাট মন্ত্রণালয়ে জরুরী তৎপরতা' শীর্ষক সংবাদটি পাঠক নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। তাতে বলা হইয়াছে যে, নভেম্বর মাসে সাড়ে তিন লাখ বেল পাট রফতানির কথা। তার মধ্যে মাসের তের দিনে মাত্র পনর হাজার বেল পাট রফতানি হইয়াছে। মাসের বাকি এই কয়দিনে অবশিষ্ট তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বেল পাট রফতানি করা যাইবে কি না, সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল আশংকা করিতেছেন। ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ পাট মন্ত্রণালয়ের অফিসাররা দিন-রাত কাজ করিয়া যাইতেছেন। বিমান ও জাহাজ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়সমূহের সহিত জরুরী বৈঠকে মিলিতেছেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাদের মতে, যানবাহনের অভাবেই নির্ধারিত পরিমাণ পাট জাহজে তোলা যাইতেছে না। যা করিয়াই হউক প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া এ মাসের নির্ধারিত পরিমাণের অবশিষ্ট অংশ সাপ্লাই দিতেই হইবে।

পাট মন্ত্রণালয়ের অকস্মাৎ এমন ব্যস্ত হইবার কারণ কি? এই খবরেই বলা হইয়াছে, গত মাসেও নির্ধারিত সাড়ে তিন লাখ বেলের মধ্যে মাত্র দুই লাখ দুই হাজার বেল জাহাজে তোলা হইয়াছিল। তবু কিন্তু গত মাসে পাট মন্ত্রণালয়ে এমন 'জরুরী তৎপরতা' দেখা যায় নাই। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, পাট মন্ত্রণালয়ের চিন্তাধারায় সম্প্রতি একটা পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। এ হইতে পারে, ভারত সরকারের পাঁচ লাখ বেল কাঁচাপাট রফতানির খবর পাইয়াই পাট মন্ত্রণালয়ের কানে পানি গিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, কলিকাতার শিপাররা এক লাখ বেল কাঁচাপাট রফতানি

করিতেছেন, তখন পাট মন্ত্রণালয় ওটাকে 'অবিশ্বাস্য' 'ভিত্তিহীন' 'গুজব' বলিয়াছিলেন। এবার ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী নিজ মুখে পাঁচ লাখের কথা বলায় আমাদের মন্ত্রণালয়ের এতদিনের বিশ্বাস ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত ঐ পাঁচ লাখ বেল পাট রফতানি না করিলেই আমাদের কি লাভ হইত ? টার্গেট ছিল তেত্রিশ লাখ বেল। পরে সেটা কমাইয়া করা হয় ত্রিশ লাখ। রফতানি করা হয় মাত্র আটাশ লাখ। এবারের টার্গেট বত্রিশ লাখ। এই টার্গেট পূরণ করিবার জন্য সরকার প্রতি মাসে সাড়ে তিন লাখ বেল রফতানির শিডিউল করিয়াছেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর -অক্টোবর দুই মাসে মাত্র পাঁচ লাখ বেল রফতানি করিয়াছেন। নভেম্বরের হিসাবটাও উপরে দেখিলেন। হাজার চেষ্টা করিয়াও সরকার এমাসের টার্গেটও পূরণ করিতে পারিবেন না। এইরূপ চলিতেই থাকিবে।

এই বিপুল শর্টফল কি শুধু যানবাহনের অভাবেই হইতেছে? স্বাধীনতার প্রথম বছর আমাদের যানবাহনের অবস্থা আজকার চেয়ে বহুগুণে খারাপ ছিল। তুব সে ভাঙ্গা বছরের চার মাসে আমাদের বার লাখ বেল পাট রফতানি দিয়াছিল। প্রথম বছরের চেয়ে এখন আমাদের যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। তবু কেন প্রতি মাসে সাড়ে তিন লাখ বেল রফতানির শিডিউল রাখা যাইতেছে না? এর একমাত্র উত্তর, প্রথম বছর আমাদের পাট রফতানি কর্পোরেশন ছিল না। দ্বিতীয় বছর ঐ কর্পোরেশনের জন্ম হয়। তার এক হাতে রফতানির গোটা দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাকিস্তানী আমলে পঞ্চাশ জনেরও বেশি শিপার পাট রফতানি করিতেন। প্রতি বছর গড়ে বিয়াল্লিশ লাখ বেল পাট রফতানি হইত। এখন আমরা পাট ব্যবসায় ন্যাশনালাইযড করিয়াছি। সেই জন্যই কি আমরা একটিমাত্র রফতানি কর্পোরেশনের হাতে এত বড় দায়িত্ব দিয়াছি? না, তা করি নাই। আসলে আগের শিপাররাই আজও পাট রফতানি করিতেছেন। রফতানির জন্য তাঁরাই পাট খরিদ করিতেছেন। যোগাযোগ যানবাহন ব্যবস্থা তাঁরাই করিতেছেন। তবে, এক্সপোর্ট কর্পোরেশন কাজটা কি করিতেছেন? দুই বছরের অভিজ্ঞাতায় বোঝা গেল, এই সর্বশক্তিমান কর্পোরেশনের একমাত্র কাজ যত কম পাট রফতানি করা যায় তার প্রাণপণ চেষ্টা করা। ঠাট্টা নয়। পাট রফতানির একমাত্র অধিকারী কর্পোরেশনের দ্বারা ঠিক এই কাজটিই হইতেছে। কেমনে এটা ঘটিতেছে তা অতি স্পষ্ট, বোঝাও খুব সহজ। খবরের কাগজে এই লইয়া অনেক আলোচনাও হইয়াছে। সরকার সবই জানেন। এক্সপোর্ট কর্পোরেশন আসলে একটি 'বটল-নেক' মাত্র। এই সরু চোংগার ভিতর দিয়াই আমাদের সব কাঁচাপাটকে বিদেশে যাইতে হয়। এই সরু চোংগা বসান হইয়াছে জাতীয়করণের

নামে। অথচ পাট সম্পর্কে সরকারের চার চারটা কর্পোরেশন রহিয়াছে। এদের মধ্যে পাট-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানও দুই একটি আছে। এক্সপোর্ট কর্পোরেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া এই চারটি কর্পোরেশনকে, অথবা প্রয়োজন ও সুবিধামত আরও এক আধটা কর্পোরেশন গঠন করিয়া এদের সকলকে, সমান ক্ষমতা ও অধিকারের ভিত্তিতে পাট রফতানির দায়িত্ব দিলেই এদিককার বটলনেক অপসারিত হইয়া যাইবে। এক্সপোর্ট কর্পোরেশন ভাংগিয়া দিতে হইবে ঐ নামের দরুন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া অন্য নামে এটা বজায় রাখাও যাইতে পারে। এইভাবে চার, পাঁচটি কর্পোরেশনের হাতে পৃথক-পৃথকভাবে রফতানির দায়িত্ব দিলে তাদের মধ্যে পারফর্মেন্সের প্রতিযোগিতা হইবে। স্থানীয় খরিদের ব্যাপারে এজেন্ট নিয়োগেও পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা দূর হইবে। বিদেশী খরিদ্দারদেরও ও পার্টি বাছাই করার স্বাধীনতা থাকিবে।

পাটের বিদেশী বাজার বাঁচাইতে হইলে সরকারকে অবিলম্বে এই বছর হইতেই এটা করিতে হইবে। অন্য কারণেও অবিলম্বে এই ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আরব রাষ্ট্রসমূহ তৈল সরবরাহ হ্রাস করার ফলে পাটের বদলা সিন্‌থেটিক ফাইবার শিল্প বিরাট সংকটের মুখে পড়িয়াছে। এই সুযোগে আমাদের পাট-ব্যবসায়কে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা হওয়া দরকার। এ সুযোগ হারাইলে পরে আমাদের আফসোস করিতে হইবে। এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া হওয়া অত্যাবশ্যক। দুই দেশের মুদ্রামান ও সর্বনিম্ন মূল্যের বিপুল পার্থক্যের দরুন যে অবাধ চোরাচালান আমাদের পাট সম্পদের সর্বনাশ করিতেছে, এটা বন্ধ করিবার একটা উপায় বাহির করিতেই হইবে। পাট-দফতর এ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হউন।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৩

আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দলনির্বিশেষে জাতীয় দায়িত্ব

সরকার ইতিমধ্যে অনেকগুলি গঠনমূলক কাজে হাত দিয়াছেন। এর প্রত্যেকটাই অত্যন্ত জরুরী। একটাও বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হইলে চলিবে না। পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিবার জন্য মফস্বলে চার পাঁচ'শ ক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইতেছে। সমবায় পদ্ধতিতে সবুজ বিপ্লব সফল করার উপর আমাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তাই, সরকার একান্তে যথেষ্ট কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি করিতেছেন। খাদ্য মওজুদ ভাণ্ডার খুলিবার জন্য সরকার চার লক্ষ টন চাউল সংগ্রহের যে অভিযান চালাইবেন, তাও শুরু হইবে আগামী ১৫ই নভেম্বর হইতে। এবং প্রত্যেকটির সুষ্ঠু পরিচালন ও পরিণাম সাফল্যের জন্য চাই দেশে আইন-শৃংখলার উন্নতি। এইসব জাতিগঠনমূলক কাজ ছাড়াও সরকার আরও কতকগুলি খুব জরুরী কাজ হাতে লইয়াছেন। যেমন আদমশুমারী ও ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের ইলেকশন। এগুলির সাফল্যের জন্যও দেশের আইন-শৃংখলা অবশ্যই দরকার। কিন্তু পূর্বোক্ত কাজগুলি যে শান্তি-শৃংখলা ছাড়া এক পা আগাইতে পারে না, তা এতই সুস্পষ্ট যে, তা বুঝাইয়া বলার দরকার নাই। ও সবই হাজার হাজার ও লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। অনেক পাট খরিদ কেন্দ্রে পাট-খরিদ্দাররা ইচ্ছা সত্ত্বেও খরিদ শুরু করিতে পারেন নাই। অত অত টাকা লইয়া পথ বহিতে তাঁরা সাহস পাইতেছেন না। তাঁরা দাবি করিতেছেন প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করিয়া শাখা ব্যাংক খোলা হইক। এ দাবি স্পষ্টতঃই যুক্তিসংগত। কৃষিঋণদানের জন্যও প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শাখা ব্যাংক খোলা দরকার। এইসব শাখা ব্যাংকে টাকা আনা-নেওয়ার নিরাপত্তার জন্য পূর্ণ শান্তি-শৃংখলা অপরিহার্য। শহর-বন্দরে এবং বড় বড় কেন্দ্রেই যেভাবে ডাকাতি ও রাহাজানি চলিতেছে তাতে সুদূর মফস্বলের ছোট-ছোট কেন্দ্রে টাকা-কড়ি বহন করা যে কতদূর বিপজ্জনক তা সহজেই অনুমেয়। খোদ রাজধানী ঢাকা শহরের বুকে মীর কাদিম ব্যাংকসমূহের টাকা লইয়া সেদিন যে লোমহর্ষক রাহাজানিটা হইয়া গেল, এমন ঘটনা আজ প্রাত্যহিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাংক কর্মচারী পুলিশ ও জনসাধারণ সকলের মধ্যে একটা সার্বজনীন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে উপরোক্ত গঠনমূলক কাজ চলিতে পারে

না। সরকার ও দেশবাসী সবাই এটা উপলব্ধি করিতেছেন। সরকার এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সার্বিক চেষ্টা চালাইতেছেন : স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সহিত কনফারেন্সাদি করিতেছেন। সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন এবং বলিতেছেন, দেশবাসীর সার্বিক ও সার্বজনীন সহযোগিতা ছাড়া এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে না। তাই প্রধানমন্ত্রীসহ সব নেতৃবৃন্দই একাজে সরকারের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিবার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করিতেছেন। দল-পার্টি মত-নির্বিশেষে সকল নেতা-কর্মীরই সরকারের এই আবেদনে সাড়া দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে দ্বি-মত থাকিবার কথা নয়। দ্বি-মত নাইও। তবু সব নেতা-কর্মী, সকল সুধী-বুদ্ধিজীবী, সরকারের এই নিতান্ত ন্যায্য ও জাতীয় স্বার্থে অত্যাবশ্যক আবেদনে সাড়া দিতেছেন না বলিয়াই মনে হয়। কেন দেন নাই? সকল দলের নেতা-কর্মীরা, নির্দলীয়, বুদ্ধিজীবীরা আইন-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চান না, এটা হইতেই পারে না। প্রথমতঃ, দেশবাসীর প্রায় সকলে এবং প্রত্যেকে শান্তি চায়, তারা শান্তিতেই বাস করিতে চায়। "প্রায় সকলে" বলিলাম এই জন্য যে, কিছু লোক শান্তি-শৃংখলার বিরোধী আছে, এটা মানব সমাজের বাস্তব সত্য। সব দেশ ও সব জাতিতেই এমন লোক রহিয়াছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এদের উপদ্রব হইতে বিশাল জনতাকে রক্ষা করার জন্য সভ্য সমাজে পুলিশী ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। কাজেই দেশের জনসাধারণের দিক হইতে আইন-শৃংখলার কোনও বিপদ নাই। এ ব্যাপারে সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিতে জনসাধারণ কোনও দিনই পশ্চাৎপদ হয় না। শান্তিকামী জনসাধারণ দুষ্টের দমনে সরকারের প্রকাশ্য সহযোগিতা করিতে শুধু তখনই ভয় পায়, যখন দুষ্টের সংখ্যা পুলিশের সংখ্যার চেয়ে বেশি এবং দুষ্টের শক্তি সরকারের শক্তির চেয়ে বেশি হইয়া যায়। তেমন পরিস্থিতি আমাদের দেশে হইয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে কেন, কিভাবে হইয়াছে, সে আলোচনা পরে করিতেছি।

জনসাধারণ ছাড়া থাকিলেন অপজিশন দলসমূহের নেতা-কর্মীরা। রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কর্মীদের কেউ দেশের শান্তি-শৃংঙ্খলা রক্ষার বিরোধী হইতে পারেন না। এমন মূঢ় রাজনৈতিক নেতাকর্মী কেউ আছেন, আমি তা বিশ্বাস করি না। অপজিশন দলসমূহ ও তাঁদের নেতা-কর্মীরা বর্তমান সরকারের বিরোধী বলিয়াই তাঁরা দেশের মানে জনগণের শান্তিরও বিরোধী, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। জনগণের জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া কোনও রাজনৈতিক দল বা তাঁদের নেতারা দেশের নেতৃত্ব করিতে পারেন না। এটা বুঝিবার মতো কাণ্ড-জ্ঞান সব নেতা-কর্মীরই আছে। পজিশন দলই

হোক, আর অপজিশন দলই হোক, জনগণের, ভোটারদের আস্থাই তাঁহাদের নেতৃত্বের বুনিয়াদ। এ আস্থা অর্জন ও রক্ষা করিতে চাই অবিরাম গণ-সংযোগ। গণসংযোগ রক্ষার জন্য চাই প্রচার। প্রচারের জন্য চাই সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র। এসবের জন্য চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। সরকারের একশ একটা দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া সরকার-বিরোধী প্রচার চালাইবার জন্যও আইন-শৃংখলা রক্ষায় সরকারের সহযোগিতা করিতে হইবে আগে। সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য আহূত জনসভায়ও শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিতে হয়।

কাজেই আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে পজিশন ও অপজিশন দলের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। তবে এর মধ্যে একটু ব্যতিক্রম আছে। এক ধরনের কিছু লোক মনে করেন যে, দেশের আইন-শৃংখলা যতই তছনছ হইবে, ততই সরকার অপদস্থ ও বেসামাল হইয়া পড়িবেন; শাসনযন্ত্র ততই ভাংগিয়া পড়িবে। 'বিপ্লব' তত সহজ হইবে। সে বিপ্লবের অর্থ কি, তেমন 'বিপ্লবে' দেশের কি লাভ হইবে, এঁরা তা বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁরা নিজেরাই জানেন না। যদি আপনি বলেন: 'তাতে ত শুধু অরাজকতাই আসিবে, তাতে দেশের লাভ কি?' তাঁরা নিরুদ্বেগে জবাব দিবেন: অরাজকতাই ত আমরা চাই। যদি আরও বেশি জেরা করেন, এঁরা বলিবেন: 'সেই অরাজকতা হইতেই 'নেতা' 'জনগণের মুক্তিদাতা' বাহির হইয়া আসিবে। সে 'মুক্তির' স্বরূপ বা 'নেতা'র আদর্শ কি হইবে, জনগণের তা জানার দরকার নাই। জানিলেও বুঝিবে না। এই মূঢ় জনতার কল্যাণ করা যাইবে শুধু বিপ্লবে। নির্বাচনে তাদের কল্যাণ হইবে না। নির্বাচনী গণতন্ত্র একটা বুর্জুয়া ধাপ্পা। তাই বিপ্লবীরা জনগণের ভোট চান না। তাঁরা চান জনগণের অসন্তোষ; বুর্জুয়া সরকারের ব্যর্থতা। সেটা সম্ভব আইন-শৃংখলার অধঃপতনে। সে অবস্থাতেই আইনের বিচারের চেয়ে 'নির্মূল' ও 'উৎখাতের' রণনীতি ও 'খতমের' রাজনীতি সম্ভব। এই ধরনের লোক রাজনীতিবিদ ত ননই এঁরা 'বিপ্লবীও' নন। এঁরা 'বিপ্লবের' অর্থ বুঝেন না, রাজনীতিরও অর্থ বুঝেন না। এঁদের বিবেচনায় অরাজকতাই 'বিপ্লব'। রাষ্ট্র-'নেতি'ই এঁদের রাষ্ট্রনীতি। এঁদের কথা বাদ দিলে আর সব রাজনৈতিক দলই দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষায় আগ্রহী। সরকারের এদিককার সকল উদ্যমে এঁরা সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। তবু সে সকলের সমান ও প্রকাশ্য সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই। তার প্রস্তাবও প্রয়োজনগত কারণ নিশ্চয় আছে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, সরকার পক্ষ হইতে সেই সহযোগিতা চাওয়ার মধ্যেই ত্রুটি রহিয়াছে। এই ত্রুটি দেখাইবার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা দৃশ্যত এবং প্রধানতঃ সরকারের দায়িত্ব হইলেও

আসলে এটা গোটা জাতির এবং সমগ্র দেশবাসীর সমবেত কর্তব্য। ব্যক্তিগতভাবে এটা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটা জাতীয় দায়িত্ব। এটা কোনও এক পার্টির দায়িত্ব নয়। সে পার্টি রুলিং পার্টি হইলেও নয়। কর্তব্যটা পজিশন-অপজিশন পার্টির উভয়ের। পার্লামেন্টের বাহিরে সরকারী কর্মচারী ও নাগরিক উভয় পক্ষের। আইনভঙ্গকারীর দণ্ডবিধানের বিচার ভার আদালত ও আইন রক্ষাকারী কর্মচারী ব্যতীত আর কেউ নিজ হাতে নিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু রক্ষা করিবার এবং আইন ভংগকারীর কাজে বাধা দিবার অধিকার নাগরিকদের সকলের এবং প্রত্যেকের। একাজে সরকারকে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিবার একাধিক পন্থা ও উপায় আছে। যাচিত ও অযাচিত পরামর্শ দেওয়া তার মধ্যে একটা উপায়। আমরা তাই করিতেছি।

'ইত্তেফাক' সম্পাদক এই কর্তব্যটি করিবার একটি চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছেন। গত কিছুদিন ধরিয়া 'সমাধান কোন পথে' এই শিরোনামায় 'ইত্তেফাকে' একটি ফিচার বাহির হইয়াছে। দেশের খ্যাতনামা সুধী, অভিজ্ঞ প্রশাসক ও অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারসহ বেশ কিছু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে এই ফিচার ইন্টারভিউর আকারে। এটা সত্যিকারের একটা দেশ-সেবা। সরকারের দায়িত্বপালনে ও কর্তব্যসাধনে সহযোগিতার এ একটা গঠন-মূলক অভিনব পন্থা। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই দল-নিরপেক্ষ ও অরাজনীতিক অভিজ্ঞ প্রশাসক ও দূরদর্শী চিন্তাবিদ। বহুদর্শিতাও এঁদের অনেকের বিশেষ গুণ। সাধারণভাবে প্রশাসন ও বিশেষভাবে আইন-শৃংখলা সম্বন্ধে এঁরা যেসব অভিমত প্রকাশ করিতেছেন আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাপ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সব কথা অনুধাবন করিবেন। 'ইত্তেফাকে'র এই মূল্যবান ফিচার অনেকদিন চলিতে পারে। কারণ আমাদের দেশে সুধী-চিন্তাবিদ অভিজ্ঞ লোকের অভাব নাই। 'ইত্তেফাকের' দেখাদেখি আরও কোনও দৈনিক এই ফিচার শুরু করিতেও পারেন। এতে দেশের খুবই উপকার হইবে। বর্তমান শাসকদল যেমন উপকৃত হইবেন, ভবিষ্যতের রাজনীতিকরাও তেমনি লাভবান হইবেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থাটা একটু দীর্ঘমেয়াদী পন্থা। পক্ষান্তরে দেশের, আইনশৃংখলার উন্নতিবিধান এবং তাতে স্বাভাবিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দিক হইতে একটা জরুরী ব্যাপার। এদিককার কর্তব্য ঠিক করার জন্য সংবাদপত্রের এই ধরনের ফিচার, এমনকি সেমিনার-ডিবেটের জন্যও অপেক্ষা করা যায় না। আইন-শৃংখলার অবনতিতে আমাদের সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রম একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে।

এটাকে চালু করিতে হইলে ল' এণ্ড অর্ডার পরিস্থিতির উন্নতিবিধান করিতেই হইবে। সমাজে অর্ডার মানিতে হইলে রুল-অব-ল আইনের বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 'আইনের চোখে যে সকলে সমান' এটা সংবিধানের কিতাব হইতে নামাইয়া আমাদের জীবনে আনিতে হইবে। এ সম্পর্কে আমাদের অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ গত রবিবার ব্যাংক কর্মচারীদের সম্মিলনীতে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়া সত্যিকার জননায়কের উপযুক্ত যে মূল্যবান কথাটি বলিয়াছেন, উহাই আইনের বাদশাহীর প্রকৃত রূপ। তিনি বলিয়াছেন: 'আমি অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিনও যদি অপরাধ করি, আইনের চোখে আমি সমান অপরাধী। তাজুদ্দিন সাহেবের কথাটা বাংলার ইতিহাসের কথা এবং আজকার জন্য সময়োপযোগী কথা। এই বাংলারই এক সুলতান কিভাবে কাজীর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তার বিচার মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, ইতিহাসের পাঠকমাত্রই তা জানেন। তেমন আইনের বাদশাহী প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা আমাদের সকলের করিতে হইবে।

কিন্তু এটা করা যাইবে কিরূপে? নিশ্চয়ই উপায় আছে এবং অনেক উপায়ই আছে। আইন-শৃংখলা রক্ষায় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, যাঁরা যৌবনে এ বিষয়ে ট্রেনিং পাইয়াছিলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন এ কাজে নিয়োজিত থাকিয়া বর্তমানে বিভাগের উচ্চ পদে আছেন, স্পষ্টতঃই এ ব্যাপারে তাদের উপদেশই অগ্রগণ্য। তাঁরা কি তবে সরকারকে সঠিক উপদেশ দিতেছেন না? না কি দিতে পারিতেছেন না'? দেশবাসীর মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে বলিয়াই আমরা উম্মি রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা নিতান্ত বাঁচিবার তাগিদে সরকারকে উপেদেশ দেওয়া শুরু করিয়াছি, আমরা প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিয়াছি। 'ইত্তেফাক' সম্পাদক এমন সব ভদ্রলোকের ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু করিয়াছেন যাঁদের মধ্যে খুব কম লোকই পুলিশের চাকুরী করিয়াছেন। তাদের মধ্যে মাত্র একজন এই বিভাগে সর্বোচ্চ পদাধিকার ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সবার উপদেশে কি আশ্চার্য মিল! এমন কি আমার সাথেও। তার চেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, এই মাত্র সেদিন এক ভদ্রমহিলা 'ইত্তেফাকে' এ বিষয়ে উপদেশ দিয়া একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের সকলের কথার সাথে তাঁর কথারও চমৎকার মিল রহিয়াছে। যে কথাটির ব্যাপারে আমরা একমত হইয়াছি, স্পষ্টতঃই একজন ছাড়া আমরা আর সকলে সেসব বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। তবু বিজ্ঞ-অবিজ্ঞের কথায় এমন মিল হইল কেমন করিয়া'? উত্তর ঃ সকলে সাধু উদ্দেশ্যে কথা বলিয়াছি বলিয়া। যে কয়টি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মিল দেখা যায় সংক্ষেপে তা হইল ঃ (১) পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে সংখ্যায় ও ক্ষমতায়, (২)

শান্তি-শৃংখলার রক্ষার কাজে ডায়াকি দ্বৈত-শাসন দূর করিতে হইবে, মানে রক্ষী-বাহিনী সরাইতে হইবে। এই দুইটি ব্যাপারে সাধারণভাবে সবাই একমত হইবেন এই জন্য যে, প্রথমতঃ আমাদের লোকসংখ্যার মোকাবেলায় এবং স্বাধীনতার আগের সংখ্যাশক্তির তুলনায় বর্তমানের পুলিশ বাহিনী নিতান্তই অপ্রচুর। দ্বিতীয়ত ঃ শন্তি-শৃংখলা রক্ষা এমন একটি কাজ যাতে দ্বৈত-শাসন চলিতে পারে না। এ ছাড়া আর যে একটি ব্যাপারে সবাই একমত হইয়াছেন এবং আরও হইবেন তা এই যে একাজে জনগণের সহযোগিতা পাইতে হইবে। সে উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ও সাহস জাগাইতে হইবে। পরস্পর যৌথ বিশ্বাসই আত্ম-বিশ্বাসের বুনিয়াদ। কেউ কাকেও বিশ্বাস করে না বলিয়াই আজ কারো মনে আত্ম-বিশ্বাস ও সাহস নাই। থাকিবার উপায় নাই। কে কাকে কখন 'দালাল', 'দুষ্কৃতিকারী' বলিয়া ধরাইয়া দিবে, তার কিছুই জানা নাই। একবার ধরা পড়িলে আর জামিন নাই; 'বিচার' হইলে মিনিমাম তিন বছর। এ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, মানে আত্ম-বিশ্বাস, মনে সাহস আসিবে কোথা হইতে? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিতে আমি বহুবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, তিনটি বেআইনী আইন আজ দেশবাসীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। দেহের দিক হইতে ত বটেই, মনের দিক হইতেও। শহরের লোকের সমাজ-জীবন নাই, তাই তাঁরা বিষয়টা পুরা উপলব্ধি করিতে পারেন না। আমাদের জনজীবনের শতকরা আশি ভাগ পল্লীগ্রামে। আর সে পল্লীগ্রাম সমাজবদ্ধ জীবনের পরাকাষ্ঠা। এই সমাজজীবনের নেতা, শাসক ও পরিচালক ছিলেন লক্ষ লক্ষ আলেম-ওলামা-পীর ও মাতবররা। মসজিদে, মকতবে, মাদ্রাসায়, জুমার নামাজে, ঈদের মাঠে ওরসের জমাতে এই আলেম-ওলামারা ও পীরেরা হাটে-বাজারে, বৈঠকে, মজলিসে মাতব্বরেরা জনগণের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সকল ব্যাপারে প্রকৃতির মতোই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অবিরাম বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতেন। আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে এঁরাই ছিলেন কর্তৃপক্ষের শক্তি। রাজনৈতিক ব্যাপারসহ সকল বিষয়ে ছিলেন এঁরা শহরিয়া খানবাহদুর-রায়, বাহাদুরদের মতোই সরকারের রাজভক্ত সমর্থক। স্বাধীনতার আমলেও স্বাভাবতঃই এঁরাই হইতেন বর্তমান সরকারেরও রাজভক্ত সমর্থক। অতএব, পল্লী এলাকার আইন-শৃংখলার প্রহরী। কিন্তু দালালি আইনের ফলে এঁদের অধিকাংশই আজ হয় বন্দী, নয় পলাতক। অনেকের মতে পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাজার আলেম দালালি আইনের শিকার হইয়াছেন। এঁদের শূন্যস্থান আর পূরণ হয় নাই। সরকারের সম্প্রতি অবলম্বিত আনুগত্য-ভিত্তিক ক্ষমা প্রদর্শনের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করিলেই এই শূন্যতা পূরণ হইতে পারে।

শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সীমিত উদ্দেশ্যে সরকার অনেকটা পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। বহু উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী আজ অবসর জীবন-যাপন করিতেছেন। দক্ষ ও দূরদর্শী প্রশাসক বলিয়া এঁদের অনেকেরই সুনাম ছিল। সরকার ইচ্ছা করিলেই এঁদের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। বর্তমানে উচ্চপদাধিকারী রদবদল করিয়া তাঁদের পদমর্যাদা ডিষ্টার্ব করার দরকার নাই। সেটা বাঞ্ছনীয়ও হইবে না। কিভাবে কিরূপে সরকার এটা করিবেন তাঁরা নিজেরাই তা স্থির করিবেন। এ কাজে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। সরকার যেভাবে যাহাই স্থির করিবেন দেশের কল্যাণের স্বার্থে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসাররা বিনাদ্বিধায় তা মানিয়া লইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বর্তমান আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল সরকার সে দেশের সমস্ত অবসরভোগী জেনারেলদের যুদ্ধ পরিচালনার কাজে লাগাইয়াছিলেন। নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে ইসরাইল যে এবার বাঁচিয়া গিয়াছে এটাও তার অন্যতম কারণ।

সরকারের প্রতি আমার সর্বশেষ পরামর্শ এই যে, প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় পরামর্শ সভা ডাকুন। সে সভায় ঐক্যজোটের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ ছাড়াও বাকি দলগুলির নেতাদের দাওয়াত করুন। পার্লামেন্টে যাদের প্রতিনিধিত্ব আছে, তাদের ত অবশ্যই। আমার বিশ্বাস, আইন-শৃংখলা স্থাপনের প্রশ্নটাকে খাদ্য সমস্যার মতোই জাতীয় সমস্যা বলিয়া তাঁরা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং সরকারের কাজে সহযোগিতা করিতে রাজি হইবেন। এই প্রবন্ধে যে সব উপায়ের কথা বলা হইল, 'ইত্তেফাকে'র কলামে উল্লিখিত সুধীজনের যে সব উপদেশের উল্লেখ আছে, সে সবের কোন্‌টা গ্রহণ করিবেন অথবা নতুন কোনও উপায় উদ্ভাবিত হইবে, সে সবই বিবেচিত ও নির্ধারিত হইবে প্রস্তাবিত সর্বদলীয় পরামর্শ সভায়। আশা করি, সরকার এই সুপারিশটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সব দলেরই দেশপ্রেমে আস্থা রাখিয়া কাজ করিবেন। শুধু ঐক্যজোটের দলগুলিই দেশপ্রেমিক, আর সকলে দেশদ্রোহী, এই মতবাদ ত্যাগ করুন। পাকিস্তানের গোড়ার কয়টা বছর মুসলিম লীগ শুধু নিজেদেরই দেশপ্রেমিক মনে করিত। আর সবাইকে বিশেষতঃ আওয়ামী লীগকে 'দেশদ্রোহী', 'ভারতের দালাল', 'ইসলামের দুশমন' বলিয়া গাল দিত। আমি আজকার আওয়ামী নেতৃত্বকে বলি ঃ খোদার দোহাই, আপনারা মুসলিম লীগের পথে যাইবেন না। কারণ ও পথের গন্তব্যস্থল মাত্র ঐ একটি।

৯ই নভেম্বর, ১৯৭৩

সাবসিডি নয়, সুষ্ঠু পরিচালনাই পাট-শিল্পের রক্ষা-কবচ

সশস্ত্র বিপ্লবে যেসব নয়া রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাদের পূনর্গঠনে কতকগুলি প্রতিকূলতা ও অসুবিধা স্বাভাবিক। বাংলাদেশও এমনি কতকগুলি প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে এটা বুঝা সহজ। কিন্তু আমাদের শিল্প কারখানায় যে প্রায়-অরাজকতার বিপর্যয় ঘটিতেছে এর সবগুলিকে বিপ্লবোত্তর স্বাভাবিক প্রতিকূলতা বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। আমাদের শিল্প-কারখানাকে বাড়িতে না দেওয়ার জন্য এমনকি যা আছে তাও ধ্বংস করিবার জন্য, কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন অবিরাম তার অশুভ প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে। এটা যেন ঘটিতেছে পরিকল্পিত উপায়েই। সে প্রয়াসও যেন বিরামহীন। ব্যাপকতায় যেন তা সর্বগ্রাসী। পাট, চা, বস্ত্র, চামড়া, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ ইত্যাদি সব শিল্পেই যেন এই অশুভ চক্রের অক্টোপাস তার সহস্র চংগল বিস্তার করিতেছে। রোজই একটা-দুইটা মারাত্মক দুর্ঘটনা খবরের কাগজে ছাপা হইতেছে। সরকার নিশ্চয়ই এসবের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গরীবের সংসারের অভাবের মতই আমাদের বিপদগুলি এমনি ঝড়ের বেগে একসঙ্গে আসিতেছে যে, গোটা জাতির সামগ্রিক ও সর্বাত্মক প্রতিরোধ ছাড়া এই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে সবগুলি শিল্প-কারখানা সম্বন্ধেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আজকার আলোচনা শুধু পাটশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেছি। গত নিবন্ধে এমন ওয়াদা করিয়াছিলাম, এও একটা কারণ। পাট-শিল্পই আমাদের সর্বপ্রধান শিল্প, এও আরেকটা কারণ। তাছাড়া সন্ত্রাস-সৃষ্টিকারী ঐ অশুভ চক্র যেন আমাদের পাটশিল্পের উপরই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আঘাত হানিতেছে। মহাশক্তিধর কোনও দানব যেন দেশের সমস্ত পাট-গুদামে আগুন লাগাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। 'উড়িয়া বেড়াইতেছে' বলিলাম এই জন্য যে, আজ দেশের পশ্চিমে, কাল পূর্বে, পরশু উত্তরে, তরশু দক্ষিণে এসবই অগ্নিকাণ্ড ঘটিতেছে। একরাত্রে একাধিক মিল-গুদামে অগ্নিকাণ্ড হইতেছে। যেমন পাট-গুদাম, তেমনি পাট-কল। পাট-কলের মওজুদ স্টক পুড়িতেছে, ইঞ্জিন বিকল হইতেছে, স্পেয়ার পার্টস চুরি হইতেছে, শ্রমিকরা মারামারি করিতেছে, মিল লক্-আউট ও ক্লোজ হইতেছে।

কেন এমন হইতেছে? কল্পিত এই অশুভ শক্তিটা আসলে কি? এ সব কথা খুব ঠাণ্ডা

মাথায় নিরপেক্ষভাবে বাস্তববাদী মনোভাব লইয়া বিচার করিতে হইবে। বিচার নির্ভুল করিবার জন্য আত্ম-সমালোচনা করিতে হইবে। নিজের দোষ-ত্রুটির সন্ধান করিতে হইবে। প্রমাণ পাওয়া গেলে অসংকোচে ও নির্ভয়ে নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে। সাহসের সঙ্গে তার প্রতিকার করিতে হইবে। পরকে দোষ দিয়া নিজের ব্যর্থতা ঢাকিবার চেষ্টা করা চলিবে না। নিজেদের অযোগ্যতা ও গাফলতি, অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল আমাদেরই ভোগ করিতে হইবে। দায়িত্বও আমাদের মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। এটার জন্য আমলাতন্ত্রকে, ওটার জন্য ভারতকে এবং সেটার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করিলেই আমাদের সংকট কাটিয়া যাইবে না। সংকট দূর করিয়া দেশকে বাঁচাইতে হইলে, দেশবাসীর কল্যাণ সাধিতে চাহিলে, সব সমস্যার গভীরে যাইতে হইবে। চলুন, পাটশিল্প সম্বন্ধে আজ সকলে মিলিয়া সে চেষ্টাই করি।

প্রথমেই ধরা যাক, আমাদের পাট-শিল্পের দুশমন কে হইতে পারে? এই আলোচনা করিতে গেলেই সকলের আগে মনে পড়ে একশ্রেণীর লোকের কথা। সরকারী লোকের মধ্যেই এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, আমাদের পাট-শিল্প স্থাপন করাই অর্থনীতির দিক দিয়া ভুল হইয়াছে। তাঁরা নাকি সরকারকে এই মতবাদে দীক্ষা দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সরকার স্বভাবতঃই এই মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সরকার অগ্রাহ্য করিলেও ঐসব লোক তাঁদের মত বদলাইয়াছেন, একথা বলা যায় না। অনেকেই মনে করেন, ভারত তথা বাংলা ভাগ হওয়া ভুল হইয়াছে। আগেরটার মতো এটাও একটা মতবাদ। যে কোন মতবাদ পোষণ করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই আছে। শুধু সরকারী কার্য-পরিচালনায় সেই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হইলেই হইল।

তবু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁদের কথা যাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশের পাটশিল্প সরকারী অর্থ সাহায্য মনে সাবসিডি ছাড়া কোনও দিনই চলিতে পারে না। আমরা শুনিতেছি, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বিভাগ (এন. আই. ডি) মন্ত্রিসভাকে লিখিতভাবে এই কথা জানাইয়াছেন এবং এই যুক্তির বলে সাবসিডি দাবি করিয়াছেন। আমাদের পাটশিল্প কেন সাবসিডি ছাড়া চলিতে পারে না? এন. আই. ডি কারণ দেখাইয়াছেন যে, এই শিল্পে যেসব জিনিস তৈয়ার হয়, তাতে লাভ হওয়া তো দূরের কথা, খরচা দামেই বিক্রি হয় না। পাঠকগণ হয়ত মনে করিতেছেন, এন.আই.ডি স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণামস্বরূপ সাময়িক লোকসানের কমাই বলিতেছেন। জি, না। এন. আই. ডি তেমন সাময়িক লোকসানের কথা বলিতেছেন না। তাঁরা বলিতেছেন, আমাদের পাট-শিল্পের 'ম্যাকসিমাম

এফিসিয়েন্সি লাভ হইবার পরও' এটা আমাদের লাভের কারবার হইবে না। সাবসিডি দিয়া এই লোকসান পোষাইয়া নিতেই হইবে। বরাবর। চিরকাল।

হায় বাংলাদেশের পাটকল! বাংলাদেশের পাটচাষীর মতই, দেখিতেছি, তোমারও বরাদ মন্দ। বাংলাদেশের পাটচাষীরা কোনও দিন তাদের উৎপন্ন পাটের ন্যায্য মূল্য পায় নাই। পাটের আবাদী খরচাই উঠে নাই। তাই পাট-চাষটা চাষীদের জন্য ছিল বরাবরই লোকসানের কারবার। লোকসানটা তারা পোষাইত উপাস করিয়া। বিদেশী ব্যাপারীরা ন্যায্য মূল্য না দিয়া আমাদের পাট-চাষীদের ঠকাইত। তাই আমরা নিজের দেশে পাট-কল করিলাম, পাট-চাষীদের বিদেশী ঠকদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু ঐ যে শাস্ত্রে আছে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া ভানে!' পাট-কল করিয়াও আমরা ন্যায্য মূল্য অর্থাৎ আবাদী খরচা পাইলাম না। পাট-চাষীরা উপাস করিয়া লোকসান পোষাইয়া আসিতেছে। পাট-কলেরা ত আর উপাস করিতে পারে না। তাই তাদের সাবসিডির 'তোলা দুধ' খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কি? 'তবে'টা বলা হয় নাই সত্য, কিন্তু তাৎপর্যটা সুস্পষ্ট। আমাদের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন, বাংলাদেশে পাটকল স্থাপন করাটাই ভুল হইয়াছে তাঁদের প্রতিপাদ্যের সাথে কিন্তু এন. আই. ডি-র কথার তাৎপর্যের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কলিকাতায় এত-এত পাটকল থাকা সত্ত্বেও এবং সেখানে আমাদের সাকুল্যপাট যাওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে পাটকল করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে। এন. আই. ডি বলিতেছেন, বাংলাদেশে পাটশিল্প লোকসানের কারবার; আর কলিকাতায় ওটা লাভের কারবার। তাঁদের হিসাবটা এইরূপ: ১৯৭২-৭৩ সালে প্রতিটন চটে খরচ হইয়াছে ৪৯৪২ টাকা। বিক্রয়মূল্য ৩৯০০ টাকা। ছালা তৈয়ার খরচা ৩০২১ টাকা। বিক্রয়মূল্য ২৭৫০ টাকা। কার্পেটব্যাকিং তৈয়ার-খরচা ৫৫০৫ টাকা। বিক্রয়-মূল্য ৪৮৫০ টাকা। বলিয়া রাখা দরকার, উপরে যে বিক্রয়-মূল্যের উল্লেখ করা হইল তা সাম্প্রতিককালের বিশ্ববাজার মূল্যের সর্বোচ্চ দর। তার মানে, পাটজাত দ্রব্য বর্তমানে বিশ্বের বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এই সর্বোচ্চ মূল্য পাইয়াও আমাদের পাটশিল্প বিপুল পরিমাণ লোকসান দিতেছে। এর ভেদ কি? উত্তর ঃ আমাদের উৎপাদন-খরচা বেশি। একই বাজারে একই দামে বরঞ্চ কোনও কোনও ক্ষেত্রে কম দামে বিক্রয় করিয়াও ভারতের পাট-শিল্প মুনাফা করিতেছে কেমন করিয়া? উত্তর ঃ তাদের উৎপাদন-খরচা কম বলিয়া। বলা হয়, ভারতীয় পাটশিল্পের উৎপাদন-খরচা আমাদের খরচের

চেয়ে গড়ে শতকরা ৬০ ভাগ কম।

এই হিসাব আমরা পাইলাম কই? আমাদের সরকারী বিশেষজ্ঞেরা ও এন. আই. ডি-র কর্তৃপক্ষ কাজে নামিয়াছেন দুই বছরেরও কম সময় হইল। তাঁরা আমাদের পাট-শিল্পের খরচাটা কষিলেন কখন? তাঁরা নিজেরা কষেন নাই। কষা-কষির দরকার বা সময় তাঁদের ছিল না। তাঁরা হাতের কাছেই একটা রেডিমেড দলিল পাইয়াছিলেন। দলিলটি হইল পাকিস্তান সরকারের নিয়োজিত 'টেকনিক্যাল সাব কমিটি'র একটি রিপোর্ট। ১৯৬৯ সালের ৬ই সেপটেম্বর ইয়াহিয়া সরকার এই 'টেকনিক্যাল সাব-কমিটি' নিয়োগ করেন। এই সাব-কমিটির টার্ম-অব-রেফারেন্স বা বিচার্য বিষয় ছিল: 'পাকিস্তানী পাটকলের উৎপাদন কম ও উৎপাদন-খরচা বেশি কেন?' পাঠক লক্ষ্য করিবেন, লজিকে যাকে 'ডাবল কোয়েশ্‌চন,' দ্বিত্ব প্রশ্ন, বলা হয়, এখানে তাই করা হইয়াছে। 'আপনি চুরি করেন কেন?' এই প্রশ্নে আপনার চুরি করাটা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তারপর চুরির কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ইয়াহিয়ার আমলের পাকিস্তান সরকারও ধরিয়া লইয়াছেন, আমাদের পাট-শিল্পের উৎপাদন-পরিমাণ কম ও উৎপাদন খরচা বেশি। এটা ধরিয়া লইয়াই ঐ টেকনিক্যাল সাব-কমিটিকে ঐ 'কম'-'বেশি'র কারণ আবিষ্কার করিতে বলা হইয়াছিল। আমাদের উৎপাদন সত্য-সত্যই কম কি না, অথবা খরচা সত্য-সত্যই বেশি কি না, তার অনুসন্ধান করিবার কোনও ক্ষমতা, এলাকা ও অধিকার ঐ সাব-কমিটির ছিল না। তাঁরা এ অবস্থায় কি করিলেন? পাট-কলগুলির নিকট কতকগুলি বিষয় জানিতে চাহিয়া একটা প্রশ্নাবলী জারি করিলেন। অধিকাংশ মিল তার উত্তর দিলো না। যাঁরা দিলেন, তাঁদের উত্তর বিবেচনার যোগ্য নয় বলিয়া সাব-কমিটি সেসব বাতিল করিয়া দিলেন। তার বদলে পাট-শিল্পের উৎপাদন-খরচা সম্বন্ধে 'আর্মিটেজ এণ্ড নর্টন' নামক এক খরচা-হিসাব-বিশেষজ্ঞ কষ্ট-একাউন্টিং কোম্পানীর রিপোর্ট মানিয়া লইলেন। পাকিস্তান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন কিছুদিন আগেই এই 'আর্মিটেজ এণ্ড নর্টন' কোম্পানীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিদেশী ঐ কোম্পানীর সততার বিরুদ্ধে কোনও অসাধু ইংগিত না করিয়াও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পাটকলের মালিকরা তাদের সামনে যে সব তথ্যাদি ও বুক্‌স্-অব একাউন্টস পেশ করিয়াছিলেন, তারই ভিত্তিতে তাঁরা রিপোর্ট তৈরি করিয়াছিলেন। পাটকলওয়ালাদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই ওটা করা হইয়াছিল। উৎপাদনের পরিমাণ কম ও উৎপাদন খরচা বেশি দেখানো স্পষ্টতঃই পাটকলওয়ালাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল। ইন্‌কাম ট্যাক্স, সেল্‌স ট্যাক্স ও এক্সাইয ডিউটি

ফাঁকি দেওয়াটা ছিল তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ। এটা ছিল বিরাট অংকের টাকা। এছাড়া তাঁদের একটা রাজনৈতিক স্বার্থও ছিল। পাটের কলে ও পাটের তেজারতিতে বিপুল লাভ করিয়া পশ্চিমা পুঁজিপতিরা পূর্ব পাকিস্তানীদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করিতেছেন, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয়ভিত্তিক কোনও কোনও চেম্বার অব-কমার্স এই ধরনের অভিযোগ করিয়া পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবির পক্ষে এবং পাকিস্তান সরকার ও পুঁজিপতিদের বিপক্ষে জনমত বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন। কাজেই পশ্চিমা পুঁজিপতিদের এটা দেখান দরকার হইয়া পড়িয়াছিল যে পাটকল হইতে তাঁরা মোটেই মুনাফা করিতেছে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ ও তাদের পাটের স্বার্থেই পশ্চিমারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি লইয়া পাটের কল চালাইয়া যাইতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিদেশ হইতে কষ্ট একাউন্টিং-এর বিশেষজ্ঞ আনিয়া বাংগালিদেরে ঐ হাইকোর্ট দেখাইলেন।

ইন্‌কাম-ট্যাক্সের অর্থনৈতিক দিকটায় না হইলেও আঞ্চলিক শোষণের দিকটায় পুঁজিপতি ও পাকিস্তান সরকারের স্বার্থটা অবিকল এক ছিল। তাই পাকিস্তান সরকার তাড়াহুড়া করিয়া ঐ টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটি গঠন করিলেন। ঐ কমিটি আর্মিট্যাজ নর্টন কোম্পানীর 'বেশি খরচের' রিপোর্টটা মানিয়া নিলেন এবং কম উৎপাদনের বাকি কাজটা সাত তাড়াতাড়িতে সারিয়া ফেলিলেন। সাত তাড়াতাড়ির দরকার পড়িয়াছিল এই জন্য যে ফাটিয়া-পড়া গণ-আন্দোলনের মুখে আইউব ও তাঁর 'আগরতলা মামলা' উড়িয়া গিয়াছিলেন, যে আন্দোলনের আকাশচুম্বী ঢেউ ১৯৬৯ সালেও চলিতেছিল। ঐ আন্দোলনের হৈ-হুল্লার মধ্যে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটির প্রশ্নাবলীর জবাব দিবার পরিবেশ দেশে ছিল না বলিয়াই পাট কলওয়ালারা করিতে পারেন নাই। এতে এক্সপার্ট কমিটির সুবিধাই হইয়াছিল। তাঁরা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার, বিজলী সরবরাহ ও শ্রমিক-কল্যাণ সম্বন্ধে কিছু ভাল ভাল উপদেশ দিয়া এবং 'কম উৎপাদন' সম্বন্ধে ভারতের উৎপাদন হইতে আমাদের উৎপাদন শতকরা ৪০ কম দেখাইয়া শিল্প-মালিক ও পাকিস্তান সরকারের মনমত একখানা রিপোর্ট দিলেন। ভারতের কলসমূহের তুলনায় আমাদের কলগুলি অত্যাধুনিক ভারতের পাটের চেয়ে আমাদের পাট গুণে উৎকৃষ্ট ও দামে সস্তা, শ্রমিকও সুলভ ইত্যাদি অনুকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতের চেয়ে আমাদের উৎপাদন ও খরচা বেশি প্রমাণ করাটা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু পাঠকরা জানেন, কঠিন কাজটাই সহজে করা যায়। এই ধরুন, নয়া কলের চেয়ে পুরান কল অনেক ভাল। নয়া কল মসৃণ

হইতে সময় লাগে, পুরান কল স্মুথলি চলে। যেমন, নতুন জুতার চেয়ে পুরান জুতা পরিতে আরাম। রাস্তাও হাঁটা যায় বেশি। এই কারণে কলিকাতার পুরান কলে উৎপাদন হয় বেশি। আর পাট সস্তা! কামলা সস্তা! জানেনত, সস্তার তিন অবস্থা! সস্তা কামলায় কাম হয় কম। জানেন না, সস্তা কলায় চিড়া নষ্ট? অতএব প্রমাণিত হইয়া গেল, বাংলাদেশের নয়া নয়া কলে ভারতের পুরান পুরান কলের চেয়ে কম উৎপাদন হয়। চিড়া নষ্ট হয় বলিয়াই খোরাকি খরচাও বেশি হয়।

এটাত হইল পশ্চিমা পাটকলওয়ালাদের প্ররোচিত-আয়োজিত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের এন. আই. ডি ও জুটমিল কর্পোরেশন এটা মানিয়া লইতেছেন কেন? গলার জোরে বলিতেছি কেমন করিয়া? পাকিস্তানী শোষকদের সব কাজ খারাপ হইয়া এই একটি কাজ এত ভাল হইয়া গেল কিরূপে? উত্তর সহজ। কারণ একটাই। যে কারণে সর্ববিষয়ে পাকিস্তানী মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরোধী হইয়াও বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ-নেতৃত্ব একটি কাজে তাঁদের হুবহু অনুকরণ করিতেছেন, ওদের 'ইসলাম' রক্ষার স্বার্থে চারদিকে শুধু 'পাকিস্তানের দুশমন' দেখার মতই এঁরা 'সমাজতন্ত্র' রক্ষার স্বার্থে চারদিকে কেবলই 'বাংলাদেশের দুশমন' দেখিতেছেন, ঠিক সেই কারণেই আমাদের শাসকরা পাট-শিল্পের লোকসানের ব্যাপারে পশ্চিমা শোষকদের অনুকরণ করিতেছেন। এই 'লোকসান'টা ওঁদের জন্যও দরকার ছিল। আমাদের জন্যও দরকার পড়িয়াছে। কি প্রকারে এটা ঘটিল, সংক্ষেপে তার আলোচনা করা যাউক।

বিনা-প্রস্তুতিতে সবগুলি শিল্প একসংগে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ভুল হইয়াছে, এ কথা আমি বহুদিন আগে বহুবার বলিয়াছি। পাট-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারেও সে কথারই পুনরুক্তি করিয়া আজ আরও বলিতেছি যে, শুধু নীতির দিক হইতে নয়, পদ্ধতিগত দিক হইতেও এ ব্যাপারে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-প্রমাদ ঘটিয়াছিল। বাণিজ্য দফতর ও শিল্প দফতরের মধ্যে পাট-শিল্পের টানা-হ্যাঁচড়া এবং তজ্জনিত মারাত্মক অব্যবস্থাটাই ঐ সব ত্রুটি-প্রমাদের প্রধান। পাটের খানিকটা শিল্প ও খনিকটা বাণিজ্য বলিয়াই এই ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কৃষি দফতরের কথা এই টানা-হ্যাঁচড়ায় যে কারণে বাদ পড়িয়াছিল, সে কারণেই স্বাধীনতার পর পরই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে জুটবোর্ডের প্রাধান্যই মানিয়া লওয়া মন্ত্রীদের উচিত ছিল। কারণ ঐ অবস্থায় পাট-শিল্প ও বাণিজ্য উভয় ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞ লোক তখন জুট-বোর্ডেই ছিলেন। এই বাস্তবতা না মানিয়া জুট-বোর্ডকে পাকিস্তানী আমলের মতই বাণিজ্য দফতরের বিভাগ মনে করা

হইয়াছিল। তাতেই শিল্প-বাণিজ্য দফতরের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ফলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অদল-বদলের যে ধাক্কাধাক্কি লাগে এবং তার পরিণামে সব পাটকলে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয় তাতেই পাট-শিল্পের বারটা বাজিয়া যায়। পাট-কলের সঞ্চিত ষ্টক, ক্যাশ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের যে ক্ষতি এই মুহূর্তে হইয়া যায়, পাট-শিল্প সে টাল আজও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। শিল্পমন্ত্রী পার্লামেন্টে পাটশিল্পের যে সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা লোকসানের কথা বলিয়াছেন এবং এন.আই. ডি 'স্বাধীনতা-পূর্ব দায়-দায়িত্ব'রূপে যে পয়তাল্লিশ কোটি টাকা লোকসানটা ক্যাপিটালাইয করিতে বলিয়াছেন, এই সত্তর কোটির সব ক্ষতিই ঐ মুদ্দতের লুটপাটের ফল। জুটবোর্ডের অফিসারদের সুপারিশমত ঐ সময় পাটকলসমূহের সম্পত্তির কোনও ইন্‌ভেন্ট্রি করা না হওয়াতে ঐ লোকসানের আসল পরিমাণ আর কোনও দিন জানা যাইবে না। এ অবস্থায় আমাদের অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের কাগজপত্রের ভিত্তিতে যে দুইশ কোটি টাকা লোকসানের কথা বলিয়াছিলেন, সেটাই বোধ হয় সত্যের অধিকতর কাছাকাছি। দুইশ কোটিই হোক আর সত্তর কোটিই হোক ওটা স্বাধীনতা খরিদের দাম হিসেবে খরচের খাতায় লিখিতেই হইবে। কিন্তু ঐ খরচকেই পাটশিল্পের বার্ষিক স্বাভাবিক খরচ ধরাতেই আমাদের আপত্তি। কোনও এক বছরে আপনার বাড়িতে ডাকাতি হইলে কিংবা কোনও এক মাসের বেতন পাইবার দিন আপনার পকেট মারা গেলে সেটাকে আপনি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণে বরাবরের বার্ষিক ও মাসিক খরচ ধরিতে পারিবেন না। পাটের ঐ লোকসানটা পাটশিল্প চলাকালে বা পরিচালন ব্যপদেশে এক বছরের বার মাসে হয় নাই। হইয়াছে মাত্র শিল্প বাণিজ্য দফতরের ধাক্কাধাক্কির সুযোগের ঐ কয়টা মাসে।

অতএব আসুন আমাদের পাটশিল্পের আসল আয়-ব্যয় হিসাব করিতে বসি। কার বন্ধু আর কার শত্রু কত টাকা মারিয়াছে, এই তর্ক ও বিতণ্ডা এখন ভুলিয়া যাইতে হইবে। তবেই আমরা ঠাণ্ডা মাথায় সবই হিসাব করিতে পারিব।

তেমন হিসাব করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, পাট-শিল্প আমাদের একটি সুস্থ, সবল, লাভজনক জাতীয় সম্পদ। এই শিল্পকে অন্য কোনও দফতরের সাবসিডি দিতে হইবে না। পাটশিল্পই সব দফতরকে এবং গোটা জাতিকে সাবসিডি দিবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, পাট-শিল্প যদি এতই লাভজনক তবে পশ্চিমা মিল-মালিকেরা এবং তাঁদের এক্সপার্টরা এমন লোকসানের হিসাবটা দিলেন কেন এবং কেমন করিয়া? 'কেন'র উত্তর আগেই দিয়াছি। 'কেমন করিয়া'র উত্তর এখন দিতেছি। নিজেদের লোকদের রাজসিক

বেতন ভাতা ও ভ্রমন ভাতা দিয়া মাথাভারী প্রশাসনের খরচ ত ছিলই, তার উপর পাট ও সরঞ্জামাদি খরিদেরও কারচুপি করা হইত। প্রায় সব কলওয়ালারই সরবরাহ ঠিকাদার থাকিত। এইসব ঠিকাদার আসলে মিল মালিকদেরই বেনামদার। এই ঠিকাদাররা, ধরুন, পঁচিশ টাকা দরে পাট কিনিয়া পঁয়ত্রিশ টাকা দরে মিলের কাছে ঐ পাট বেচিল। মণ-প্রতি দশ টাকা লাভ হইল। অপরদিকে কাঁচামালের দাম মণ-প্রতি দশ টাকা তার মানে, টন-প্রতি দুইশ পঁচাত্তর টাকা বাড়িল। শিল্পজাত দ্রব্যের দামও ঐ হারে বাড়িয়া গেল। ব্যাচ্ওয়েল, স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্যাদিও এমনি করিয়া বেনামদার ঠিকাদারের মারফত অতিরিক্ত বেশি দামে খরিদ দেখান হইত। তাতে একদিকে মিলমালিকের লাভের অংশ, অপরদিকে উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইত। যেসব মিলমালিক এমন অসাধুতা করিতেন না, তাঁদের মিলের উৎপাদন খরচা কম হইত। তাঁদের মিলে প্রচুর মুনাফা হইত। শিল্পমন্ত্রীর পার্লামেন্টের বিবৃতিতেই প্রকাশ, ষাটটি 'বড় বড়' কলে ৭২-৭৩ সালের ২৬ কোটি সাড়ে চার লাখ টাকা লোকসান হইয়াছে। আর ঐ মুদ্দতে দশটি 'ছোট ছোট' কলে এক কোটি দুই লাখ টাকা লাভ হইয়াছে। আড়াই শ তাঁতের দুইটি মিলের একই মুদ্দতের হিসাবে দেখা যায় একটিতে খরচ হইয়াছে চটে টন প্রতি ৪৮১০ টাকা ৩৫ পয়সা এবং ছালায় খরচ পড়িয়াছে প্রতি টনে ২৩১৩ টাকা ৭৫ পয়সা। অপর খরচ হইয়াছে প্রতি টন চটে ৭১৭৭ টাকা ৮৯ পয়সা আর প্রতি টন ছালায় খরচ পড়িয়াছে ২৪৭৫ টাকা ৮২ পয়সা। বহু নজিরের মধ্যে এই একটি হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন পাটকলওয়ালারা উৎপাদন-খরচায় কি পরিমাণ চতুরালি করিতে পারেন এবং অধিকাংশেই করিতেনও।

এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কাঁচামালের খরিদ-দামে অমন কারচুপি করার কেউ থাকিবেন না। ফলে উৎপাদন খরচা বৃদ্ধির দরুন পাট-শিল্প আর লোকসান বহন করিবে না। এন. আই. ডি-র দাবি-মত সাবসিডি দিবারও আর দরকার হইবে না। এখন দরকার শুধু সুষ্ঠু পরিচালনের ব্যবস্থা করা।

এই একটি কাজে সরকারকে 'বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন' আনিতে হইবে। কারণ বর্তমান ব্যবস্থাটাও তাঁরা করিয়াছেন 'বিপ্লবাত্মক উপায়েই'। পশ্চিমা টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাণ্ড ও দক্ষ লোকেরা চলিয়া যাওয়ায় এমনিতেই আমাদের দক্ষ লোকের অভাব হইয়াছে। তার উপর জুট মিল কর্পোরেশন করিয়া আমরা ডাণ্ডি-ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিল্পপরিচালনার যোগ্য লোকদেরে মিল হইতে সরাইয়া আনিয়াছি। মতিঝিল অফিসে

তাঁদের ডিরেক্টরের গালভরা নামে কেরানীর কাজে বসাইয়াছি। যাঁরা শিল্প-পরিচালনার যোগ্য তাঁদের এইভাবে টেবিলে বসাইয়াছি; যাঁরা শিল্পের কাজ জানেন না তাঁদের উপর শিল্প-পরিচালনার ভার দিয়াছি। তাই শিল্পে আজ এই অরাজকতা। এঁদেরে যাঁর তাঁর কাজে আবার বসাইতে হইবে। তাঁদেরে দায়িত্ব, অধিকার ও ক্ষমতা দিতে হইবে। কর্পোরেশনের ক্ষমতাও বাঁটিয়া দিতে হইবে।

আর শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদেরে শরিক করিতে হইবে। এমনিতেই শিল্পোন্নয়ন উৎপাদন বৃদ্ধির গুঢ়তত্ত্ব লেবার পার্টি সিপেশনইন-ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ম্যানেজমেন্ট। সমাজবাদী শিল্পে এটা আরও বেশি সত্য। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিক মাত্র দুই জন : এক. সরকার দুই. শ্রমিক। এই দুই শরিকের সমান প্রতিনিধি লইয়া পরিচালনবোর্ড গঠন করিতে হইবে। শ্রমিকদের হাতে পরিচালন-ভার পড়িলে শিল্পক্ষেত্রের অনেক সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে। বস্ত্রশিল্পের লক্ষ্মীনারায়ণ মিল ও পাটশিল্পের লতিফ বাওয়ানী মিল শ্রমিক-পরিচালনায় সাফল্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত। ঐ দুইটি মিলই এ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের আমলে ধ্বংস হইতেছিল। শ্রমিকরা তাদেরে বাঁচাইয়াছে এবং উৎপাদন আশাতিরিক্ত বাড়াইয়াছে। সর্বশেষ সরকারী হ্যাণ্ড-আউটে পাটশিল্পের উন্নতির যে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে, পরিচালনায় এমনি পরিবর্তনের দ্বারাই তা সম্ভব। শ্রমিক-রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সরকার এটা পরখ করিয়া দেখুন।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৭৩

আদর্শগত বিভ্রান্তি দূর করাও একটা বড় কাজ

গত শনিবার আওয়ামী লীগ অফিসে ও গত সোমবার গণ-ভবনে একটা ত্রিদলীয় বৈঠক হইয়াছে। এটা একটা শুভ সংবাদ। বৈঠকটা হইয়াছে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মুজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে। কেউ কেউ বলিবেন, ওটা সুখবর ত নয়ই, কোনও খবরই না ওটা। ওটা আসলে এ-টিম-বি-টিমের পারিবারিক ব্যাপার। আমার মতে তা হইলেও ওটা সুখবর। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে পজিশন-অপজিশন দলের সম্পর্কটাই আসলে এ-টিম-বি-টিমের ব্যাপার। বৃটিশ পার্লামেন্টে পজিশন-অপজিশন দুই পার্টিই রাজার পার্টি।

কিন্তু আমি সে কারণে ঘটনাটাকে সুখবর বলি নাই। সে জন্যও কথাটার অবতারণা করি নাই। ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হইতে এটা খবর না হইতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দিক হইতে এটা খবরতো বটেই সুখবরও। আওয়ামী লীগ পার্টি আমাদের পার্লামেন্টে এমন বিপুল মেজরিটি পার্টি যে তাঁরা অপজিশনকে অগ্রাহ্য, উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করিয়া চলিতে পারেন। করিতেছেনও তাই। অপজিশনের প্রতি এই আচরণটা আমি কোনও দিন পছন্দ করি নাই। আমার মতে রুলিং পার্টি হিসাবে আওয়ামী লীগের উচিত, অপজিশনের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করা। এটা করা উচিত অপজিশন পার্টির শক্তি ও সংখ্যা নির্বিশেষেই। আমাদের দেশে এটা আবশ্যক বিশেষ করিয়া দুইটা কারণে। এক. পার্লামেন্টে উল্লেখযোগ্য অপজিশন না থাকিলেও পার্লামেন্টের বাহিরে, জনগণের মধ্যে এবং গোটা দেশে বিপুল অপজিশন রহিয়াছে। সে অপজিশনের বিপুলের পার্লামেন্টে প্রতিবিম্বত হইতেছে না বলিয়াই শাসক পার্টি হিসেবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দুই. দেশের শান্তি-শৃংখলার ব্যাপারে এবং খাদ্য ও ভোগ্য দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে গোটা দেশবাসীর কর্তব্য এক ও অবিভাজ্য। এই কারণে আমার সব সময়ে এই আশা ছিল যে, অন্ততঃ এই দুইটি ব্যাপারে সরকারী দল পার্লামেন্টের ভিতর ও বাহিরের সকল দল, পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সংগে প্রকাশ্যভাবে সলা-পরামর্শ করিবেন। প্রকাশ্য কথাটার তাৎপর্য এই যে, দেশবাসীকে জানিতে দিতে হইবে যে, সরকার সকল ব্যাপারে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের

সাথে পরামর্শ করিয়াই কাজ করিতেছেন। সরকার যদি বুঝিতেও পারেন যে বিরোধী দলের নেতারা কোনও গঠনমূলক পরামর্শ দেন না, দিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাঁদের নাই, তবু এই ধরনের সভা-সম্মেলন ডাকিবেন এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দের সহিত বিচার-বিমর্শ করিবেন। পজিশন-অপজিশন উভয় পক্ষের জন্যই এবং গোটা দেশবাসীর জন্যও, এমন আলাপ-আলোচনা হিতকর। উভয়পক্ষের মধ্যে পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের জন্যই এটা অত্যাবশ্যক, এমন কি অপরিহার্য।

এই গণতান্ত্রিক চেতনা বোধটারও দুইটা দিক আছে। একটা বর্তমান সমস্যাসমূহের আশু সমাধানের উপায় নির্ধারণের দিক। অপরটা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও আদর্শগত ধ্যান-ধারণা ও প্রচার-প্রচারণার দিক। প্রথমটা আসন্ন বিপদের আশু নিরশনের প্রশ্ন। সুতরাং খুবই আর্জেন্ট ও জরুরী তাতে সন্দেহ নাই। এ দুই সমস্যা সমাধানের আগে অন্য দিকে গড়ন-নির্মাণ ও উন্নতি-প্রগতির কথা ভাবাই যায় না। এটাও ঠিক। কিন্তু এটাও সত্য যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনের মধ্যে অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও বিরোধের কুয়াশার মধ্যে বৈষয়িক দৈহিক সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র' নামক আমাদের দুইটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির কথাই ধরা যাক। এই দুইটিকে আমাদের রাষ্ট্রের চারটি খুঁটির অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করিয়া ও সংবিধানে তা লিপিবদ্ধ করিয়াই আওয়ামী লীগ দল তাদের কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন ভাবিয়া বসিয়া আছেন। গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক কি, 'সমাজতন্ত্র'টাই বা কি, সে সম্পর্কে পার্টি বা সরকারী প্রচার দপ্তর হইতে কোনও প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় নাই। সংবিধান রচনার সময়েই আমি হুঁশিয়ার করিয়াছিলাম, সোশ্যালিযমে'র বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে। আমি বলিয়াছিলাম 'ইযমের' বাংলা 'তন্ত্র' করিবেন না তাতে বিপদ আছে। 'বুরোক্র্যাসি', থিওক্র্যাসি', 'ডেমোক্র্যাসি', 'অটোক্র্যাসি' ইত্যাদি শব্দ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় ক্র্যাসিটা আর্থিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রেশাসনিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মাক্সিযম, কমিউনিযম, সোশ্যালিযম ইত্যাদি শব্দর বাংলা যথাক্রমে 'মার্কসবাদ' 'সাম্যবাদ' ও 'সমাজবাদ'ও করা হইয়া থাকে। সমাজবাদকে 'সমাজতন্ত্র' বলায় এই বিশেষ মতবাদকে প্রশাসনিক একটি অজ্ঞাত রূপ মনে করা ও করানো সহজ হইয়াছে। বিপ্লবীরা সমাজবাদকে প্রশাসনেও প্রসারিত করিতে চায়। তাদের জন্য 'সমাজবাদের' চেয়ে সমাজতন্ত্রই অধিকতর উপযোগী।

তাই আমাদের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের অনেকে বলিতেছেন 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র' একসংগে চলিতে পারে না। অনেক বক্তা, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক খুব জোরের সংগেই বলিতেছেন, যারা 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র' এক জোয়ালে জুড়িতে চাহিতেছেন, এরা জনগণকে ধাপ্পা দিতেছেন। দেশবাসীর সাথে তারা রীতিমত তঞ্চকতা করিতেছেন। জনগণও লেলিনের কোন বই না পড়িয়াই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে বুঝিয়া ফেলিতেছেন: দুইটার যখন 'তন্ত্র' তখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক সংগে চলিতে না পারাই বেশি সম্ভব। আর আওয়ামী লীগাররা জনগণকে এই বিভ্রান্তির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া মুজিববাদের জয়-ধ্বনি দিতেছেন। সংবিধানে উল্লিখিত আছে. গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি। আওয়ামী বিরোধীরা বলিতেছেন, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক সংগে চলিতে পারে না। আওয়ামীরা জবাবে বলিতেছেন, আমরা মুজিববাদ কায়েম করিব। পাঠকরা কি বুঝিলেন? আমি যা বুঝিলাম, আপনারা নিশ্চয়ই তাই বুঝিলেন। আমরা সবাই বুঝিলাম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এক সঙ্গে চলিতে পারে না, বিরোধীদের এ কথা আওয়ামীরা মানিয়া লইলেন বলিয়াই এখন মুজিববাদের কথা বলিতেছেন। আওয়ামীরা এখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুইটাই বাদ দিয়া মুজিববাদ নামে এক নতুন মতবাদ কায়েম করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। এর পরেও যদি গণমনে কোনও সন্দেহ থাকিয়া থাকে, তবে সেটা দূর করার জন্যই যেন আওয়ামীরা ধ্বনি তুলিতেছেন, 'বিশ্বে এল নতুন বাদ, মুজিববাদ মুজিববাদ।' গণমনে আর কোন সন্দেহ থাকিল না যে, মুজিববাদ একটা নয়া বস্তু। সংবিধানে যখন এটা নাই তখন সংবিধান অমান্য করিয়াই এটা গ্রহণ করিতে হইবে। আওয়ামী সরকার সংবিধান বিরোধী অনেক কাজই করিতেছেন, এটা না হয় আরেকটা হইল।

অথচ 'মুজিববাদ'ই যে 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্রে'র এক সাথে চলার পথ এ কথাটাও তাঁরা জোরের সংগে বলিতেছেন না। বলিলে কিন্তু সায়েন্টিফিক সোশ্যালিযমের প্রবক্তাদের দাঁত-ভাংগা জবাব দেওয়া হইয়াই যাইত। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা কদাচ বিজ্ঞান অমান্য করিতেন না। অক্সিজেন-হাইড্রোজেন একত্রে মিশিয়া পানি হইয়া যায়, এটা বিজ্ঞানের কথা। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একত্রে মিশিয়া মুজিববাদ হইয়াছে এটাও তেমনি বিজ্ঞানেরই কথা।

কিন্তু রসিকতা ও রং-তামাশার কথা এটা নয়। জাতীয় জীবনের ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সিরিয়াস কথা এটা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সমাজবাদী অর্থনৈতিক সাম্য ও অসত্য

চলিতে পারে, দুনিয়ার সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আজ তার এক্সপেরিমেন্ট চলিতেছে। সে এক্সপেরিমেন্ট সফলও হইতেছে। মার্ক্সবাদ ও রাশিয়া সমাজবাদের শিক্ষক প্ল্যান্‌ড্‌ ইকনমি মানে পরিকল্পিত অর্থনীতিই এর গোড়ার কথা এবং বুনিয়াদ। এটা ছাড়া আজ কোনও রাষ্ট্রেরই অর্থনীতি চলিতেছে না। এই বুনিয়াদ ঠিক রাশিয়া সমাজবাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। রাশিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবের এলাকা পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সমাজবাদ গ্রহণ করিয়াছে। এদের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রো-এশিয়ান ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়া হইতেই সমাজবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এই সব দেশের নব-উদ্দীপিত জাতীয়তাবোধ খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজবাদকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এটা ঘটিয়াছে দুর্নিবার অপ্রতিরোধ্য পরিবেশের জোরেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় নেতারা নিজ নিজ জনপ্রিয়তা রক্ষা ও জন-সমর্থন লাভের খাতিরেই সমাজবাদের মূল সূত্রকে নিজ নিজ দেশের জনগণের পছন্দ মতো শ্লোগানের দ্বারা ভূষিত ও বিশেষিত করিয়াছেন। পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও আলজিরিয়া সবাই যার তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সমাজবাদকে যার-তার জাতি নাম দিয়াছে। বিশ শতকের মধ্যভাগেই এটা ঘটিয়াছে। ঐ সময়কার ভারত ও পাকিস্তানেও 'গান্ধিয়ান সমাজবাদ' ও ইসলামী সমাজবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

সমাজবাদের এই জাতীয় রূপ সর্বপ্রথমে দেখা দেয় মার্ক্সের জন্মস্থান খোদ জার্মানীতেই। কার্লমার্ক্সের সম-সময়ে ১৮৬৩ সালে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্ম হয়। ঐ সময়ে এই পার্টি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে কার্লমার্ক্সের প্রেরণায় গোটা ইউরোপের সমাজবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। পরবর্তীকালে এই সংগ্রামের নেতৃত্ব রুশ কমিউনিস্ট নেতা লেনিনের পরিচালনাধীনে পূর্ব ইউরোপে চলিয়া যায়। কিন্তু এখনও জার্মান ও ফরাসী সমাজবাদীদের মধ্যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের অবসান হয় নাই। ইটালীতে মুসোলিনী ও তাঁর অনুসারী জার্মানীতে এড্‌লফ হিটলার সমাজবাদকে জাতীয় নামে ও রূপে শক্তিশালী আবেগের বস্তু করিয়া তুলেন। জাতীয় সমাজবাদের মতো একটা সুন্দর ও নির্ভুল মতবাদকে এঁরা ব্যক্তি পূজার ও গোত্র-কৌলিন্যের কালিমায় মসী লিপ্ত করিয়া ফেলেন। এককালের জাতীয় সমাজবাদ বিশ্বের

সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য এ জঘণ্য ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদে পরিণত হয়। ফলে খোদ জার্মানীতেও জাতীয় সমাজবাদ আর জনপ্রিয় থাকে নাই। নিবিড় জাতীয়তাবাদ ও নিষ্ঠ সমাজবাদ আজও সজীব মতবাদ। কিন্তু কেউ সেটাকে আর জাতীয় সমাজবাদ বলিতে রাজি নন। জার্মান ফেডারেশন রিপাবলিক রাষ্ট্রের আজকার শাসকদল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। তাঁদের নামে ও কাজে এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা এক সংগে গণতন্ত্র ও সমাজবাদে বিশ্বাসী।

খোদ রাশিয়াতে সমাজবাদের দুই সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী রূপায়ণের চেষ্টা হয়। অধিকতর বাস্তববাদী লেনিন ও স্টালিনের মতবাদ সফল হয়। অবাস্তব ইউরোপিয়ান ট্রটস্কির মতবাদ ব্যর্থতায় মিলাইয়া যায়। লেনিনও স্টালিনের সে সমাজবাদ সফল হয়, ওটাও আসলে সমাজবাদের একটা জাতীয় রূপ। রুশ জাতির বিশেষ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াইয়াই সমাজবাদকে সেখানে সাফল্য অর্জন করিতে হইয়াছে। রাশিয়ার বাহিরে পূর্ব ইউরোপের এক এক দেশে সমাজবাদ এক এক রূপ নিয়াছে। দূরবর্তী চীনদেশে গিয়া তার রূপ আরও বেশি বদলাইয়াছে। এটা স্বাভাবিক। স্থান ও সময়ের দূরত্বের প্রভাব সব মতবাদেই এমন করিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে, পড়িবেও।

স্বাধীন বাংলাদেশেও সমাজবাদ তার নিজস্ব ও বিশিষ্ট জাতীয় রূপ ধারণ করিবে স্বাভাবিকভাবেই। তার মানে আমাদের সমাজবাদ খুঁটিনাটিতে রুশ বা চীনা সমাজবাদের হুবহু ও অবিকল নকল হইবে না। হইতে পারে না। ইংরাজ আমল হইতেই অবিভক্ত ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা চলিয়া আসিতেছে। ভারতের কল্পিত এই সমাজবাদ গণতন্ত্রের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হইবে, এটাও তৎকালীন নেতারা ধরিয়াই লইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বাটোয়ারা হইবার পরও এই উদ্যমের অবসান ঘটে নাই। গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই সমাজবাদ রূপায়িত হইবার ধারণা সুস্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও এটাকে কেউ গণতান্ত্রিক সমাজবাদও বলেন নাই। পক্ষান্তরে আমাদের গণতন্ত্রকে কেউ সমাজবাদী গণতন্ত্রও বলেন নাই। তার মানে, গণতন্ত্র গনতন্ত্রই থাকিবে আর সমাজবাদও সমাজবাদই থাকিবে। একটাকে দিয়া অপরটা বিশেষিত করা হইবে না। সে চেষ্টাও করা হয় নাই। এটা ঠিকই করা হইয়াছে। জার্মান ইত্যাদি ইউরোপীয় কতিপয় দেশের মতো আমরা যদি সমাজবাদকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ আখ্যা দিতাম তবে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি আরও বেশি হইত। মনে হইবার আশংকা থাকিত যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বুঝি আসল গনতন্ত্র নয়। একটা নতুন কিছু। এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করিয়া আমাদের নেতারা

ঠিক কাজই করিয়াছেন। আমরা গণতন্ত্র চাই। আমরা সমাজবাদও চাই। আমাদের সে গণতন্ত্রও হইবে অবিকৃত আসল গণতন্ত্র; আমাদের সমাজবাদও হইবে অবিকৃত আসল সমাজবাদ। আমাদের সংবিধানে গণতন্ত্র ও সমাজবাদকে পৃথক রাখিয়া, একটার দ্বারা আরেকটাকে বিশেষিত না করিয়া, কাজেই, নির্ভুল পদক্ষেপই নেওয়া হইয়াছে।

তবে একথাও আমাদের বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন ব্যবস্থায় দুইটি ত্রুটি ঘটিয়াছে। সমাজবাদকে গণতন্ত্রের সমান মর্যাদা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করায় গণতন্ত্রকে একটা বিশেষ ধরাবাঁধা ছাঁচেঢালা পরিধিতে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সমাজবাদকে গণতন্ত্র-নিরপেক্ষ আদি মার্কসবাদী সমাজবাদ বলিয়া ভুল বুঝা ও ব্যাখ্যা করার দরজা খোলা রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, বার্মা ও সিংহল তাদের সংবিধানে রাষ্ট্রকে সমাজবাদী রাষ্ট্র আখ্যায়িত করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভারত তাদের সংবিধানে রাষ্ট্রকে সমাজবাদী রাষ্ট্র আখ্যয়িত করে নাই। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ভারতের পন্থাটিই ঠিক। সেখানে রাষ্ট্র পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র। আর শাসক দলের দলীয় আদর্শ সমাজবাদ, তার ফলে সমাজবাদ সেখানে সরকারী নীতি, রাষ্ট্রীয় নীতি নয়। আমার বিবেচনায় বাংলাদেশেও সেই ব্যবস্থা করিলেই অধিকতর উপযোগী ও দূরদর্শী সুবিবেচনার কাজ হইত। অন্ততঃপক্ষে আমাদের বামপন্থী তরুণ নেতৃত্ব তাতে বিভ্রান্ত হইতেন না।

আমার মতে আমাদের বামপন্থী নেতৃত্বের একাংশ এই কারণেই বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। তারা সমাজবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান অনুসারী। তারা বলিতেছেন, সমাজবাদ ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র একসংগে চলিতে পারে না। সমাজবাদের আদি প্রবর্তক সোভিয়েট রাশিয়া এবং বৃহত্তম সমাজবাদী রাষ্ট্র গণচীনসহ বিশ্বের প্রায় সকল সমাজবাদী রাষ্ট্রই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এড়াইয়া চলিতেছে। ফলে, সমাজবাদীদের অনেকের মনে এমন বিশ্বাস হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রবর্তিত হইতে পারে না। তাঁদের এই বিশ্বাসকেই জোরের সাথে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁরা 'সায়েন্টিফিক' সোশ্যালিযমের কথা বলিতেছেন। তাঁরা স্পষ্টই বলিতেছেন, এই 'সায়েন্টিফিক' সোশ্যালিযম ভোটের মাধ্যমে আসিবে না, আসিবে বিপ্লবের মাধ্যমে। ওটা রূপায়িত হইবে 'সর্বহারার একনায়কত্বে।'

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতি এই অনাস্থা শুধু আমাদের তরুণ বামপন্থীয় মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। খোদ আওয়ামী লীগের নেতাদের কারো কারো মধ্যে এই দ্বিধা-সন্দেহ

দেখা দিয়াছে। বামপন্থীদের গণতন্ত্রবিরোধী কথার জবাবে জনৈক মন্ত্রী তার জনসভায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'যদি দেখা যায় যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এক সংগে চলিতে পারে না, তবে আমরা গণতন্ত্র ছাড়িয়া সমাজবাদই রাখিব।' এই উক্তির জবাবে অপর একজন মন্ত্রী আরেক জনসভায় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'যদি দেখা যায় গণতন্ত্র ও সমাজবাদ একত্রে চলিতে পারে না, তবে আমরা সমাজবাদ বাদ দিয়া গণতন্ত্রই রাখিব।' একই পার্টির একই সরকারের দুই মন্ত্রীর এইরূপ দুই বিপরীত উক্তিতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কারণ গণতন্ত্রে একই পার্টির ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে।

কিন্তু সেটা ছিল সংবিধান রচিত হইবার আগের ঘটনা। সংবিধানে 'গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' দুইটাই আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি হওয়ায় অন্ততঃ আওয়ামী লীগারদের মধ্যে সে, বিতর্কের অবসান হইয়াছে। বাইরে বিতর্কের অবসান হইলেও অন্তরের দিক হইতেও ঐ মতবিরোধ মিটিয়া গিয়াছে, এটা আশা করা উচিৎ নয়।

কিন্তু শত মতবিরোধ থাকিলেও আমাদের সংবিধানকে সফল করিতেই হইবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজবাদ রূপায়িত করিতে হইবে। এটা শুধু আওয়ামী লীগারদের একক কর্তব্য ও দায়িত্ব নয়। সাধারণভাবে গোটা দেশবাসী এবং বিশেষভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল অপজিশন দলেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য। ন্যাপ (মোজাফফর), কমিউনিস্ট পার্টিও আওয়ামী লীগের সহিত ঐক্যজোট করায় এই কারণেই আমি আশান্বিত হইয়াছি। এতে এটাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগের মতই ঐ দুইটি দলও গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এই দুইটি দলেরই বিশেষত: কমিউনিস্ট পার্টির, রাজনৈতিক বিশেষত্ব এই যে, তাঁরা মার্ক্সবাদী বলিয়াই সুপরিচিত। আমাদের দেশেরও শাসকদলের সৌভাগ্য এই যে, গণতন্ত্র ও সমাজবাদকে একই সাথে সফল করিবার উদ্যেগে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাক্রমে আমাদের সহযাত্রী ও সহায়ক। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রবর্তনের উদ্যোগ ভারত নিয়াছে অনেক আগে হইতেই। আমাদের প্রয়াসে ভারত নিশ্চয়ই আদর্শ ও মডেল হইতে পারে। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজবাদের আদি প্রবর্তক হইয়াও এবং নিজেরা সর্বহারার একনায়কত্বে সমাজবাদ সফল করার কাজে নিয়োজিত থাকিয়াও গণতন্ত্রের পথে সমাজবাদ প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা মানিয়া লইয়াছে। সময় ও পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধারা ও পন্থার পরিবর্তন রহিয়াছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শের সমর্থক বলিয়া সুপরিচিত। মোজাফফর পন্থী ন্যাপও তাই। কাজেই এই দুইটি পার্টি যদি আমাদের সংবিধান রূপায়ণে আওয়ামী লীগের সহিত সহযোগিতা করে তবে তা বিশেষ অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হইতে বাধ্য। এই দুইটি পার্টির সহযোগিতায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি বর্তমান সমস্যা সমাধানের কোনও হিল্লা হইবে, এটা অবশ্য আশা করা যায় না। কিন্তু আদর্শগত দিক হইতে দেশবাসীকে সঠিক পথ-নির্দেশে গণতন্ত্র ও সমাজবাদে সহাবস্থানের সম্ভাবনা বিশ্লেষণে এই দুটি সুপরিচিত মার্ক্সবাদী পার্টির কর্মতৎপরতা বিশেষ মূল্যবান অবদান রাখিতে পারিবে, তাতে সন্দেহ নাই।

এইদিক হইতে ত্রিদলীয় এই ঐক্যজোট দেশের স্বার্থে একটি শুভ সূচনা। আমাদের তরুণ সমাজের একাংশের চিন্তা জগতের যে বিভ্রান্তির কুয়াশা দেখা দিয়াছে এই ঐক্যজোট সেটা দূর করিতে পারিবে বলিয়াই আমার ধারণা। আমার এই আশায় দেশের বিপুল মেজরিটিই শরিক আছে বলিয়াই বিশ্বাস।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

রেভলুশনের বৃত্ত-চক্র অন্তে বৃত্তান্ত-চক্রান্ত আসিবেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইউনিয়ন ও ডাকসু ইলেকশনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই নতুন ঘটনা। মিলিটারী স্বৈরাচারীর আমলেও এমনটা ঘটে নাই। কাজেই সকলেই এ ঘটনার নিন্দা করিতেছেন। ছিনতাইকারীদেরে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন।

শুধু ব্যালট ছিনতাই নয়। ছিনতাইর পরের রাত্রে জিপ ও টয়োটাওয়ালা একদল সশস্ত্র লোক অন্য স্থান হইতে পাঁচটি তরুণকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ক্যাম্পাসের ভিতরে আনিয়া গুলি করে এবং একজন বাদে সবাইকে হত্যা করিয়া গাড়ী দাবড়াইয়া চলিয়া যায়। এটাও কি নতুন ঘটনা নয়? শুধু "নতুন নয়, নৃশংস, মর্মান্তিক, বর্বরতাও বটে। অনেকেই এটার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। স্বয়ং ভার্সিটির ভিসি ডঃ মতিন চৌধুরীও 'বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে' এই মর্মান্তিক নৃশংসতার নিন্দা করিয়াছেন। সব হৃদয়বান সভ্য মানুষই করিবেন।

কিন্তু সত্যই কি তাই? সবাইকি এ ঘটনার নিন্দা করিতেছেন? আসলে সকলেই কি এই ঘটনায় মর্মাহত, স্তম্ভিত ও বিহব্বল হইয়াছেন? যারা জীপ ও টয়োটা গাড়িতে চড়িয়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে এই নৃশংস ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডটি করিয়াছে তারাও কি সভ্য-ভব্য শিক্ষিত মানুষ নয়? যদি শুধু মৃত লোকদের প্রাণ লওয়াই তাদের উদ্দেশ্য হইত তবে তারা দূরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পাঁচটি তরুণকে একত্র করিয়া তাদের চোখ বাঁধিয়া দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ও শিক্ষা সভ্যতার জন্মভূমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আংগিনায় আনিয়া এ কাজটি করার তাগিদ অনুভব করিত না। হত্যাকারীদের আরও কোনও উদ্দেশ্য অভিপ্রায় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ অনেক সুধীজনের এবং সাংবাদিকদের কারোর নিন্দা মাটিতে পড়িবার আগেই পুলিশসূত্র হইতে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার সাথে বলা হইল যে, নিহত আহতরা সবাই ডাকাতি ও নরহত্যা-মামলার পলাতক আসামী। এরই বা তাৎপর্য কি? এতে কি এই হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা কিছু লঘু হইয়া গেল? গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত পলাতক আসামীকে ধরিয়া আনিয়া চোখ বাঁধিয়া ঠাণ্ডা রক্তে হত্যা করিবার অধিকার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি সরকারী লোকেরও নাই। পলাতক আসামী বলিয়াই

হত্যাকারীরা এদেরে হত্যা করিয়াছে। আশা করি, এমন কথা কেউ বলিবেন না। বিশ্বাসও করিবেন না। পলাতক আসামীদেরে তাদের সহ-অপরাধী দুষ্কৃতিকারী লোকেরাই হত্যা করিয়াছে, এমন ইংগিত করাও বোধ হয় কারও অভিপ্রায় নয়। তবে এর রহস্য কোথায়?

এমনি রহস্যপূর্ণ ব্যালট ছিনতাইর ব্যাপারটাও নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁদের কেউ এ ছিনতাই করেন নাই। প্রমাণ? সবাই একবাক্যে ছিনতাইর নিন্দা করিতেছেন। ছিনতাইকারীদের কঠোর শাস্তি দিবার নির্দেশও সরকারকে দিতেছেন। দুইটি প্রধান পক্ষেই দাবী করিতেছেন যে, নির্বাচনে তারাই বিপুল ভোটে জয়ী হইতেছিলেন। তাই অপরপক্ষ পরাজয়ের গ্লানি এড়াইবার উদ্দেশ্যেই ব্যালট বাক্স ছিনতাই করিয়াছেন। যাঁরা নির্বাচনে অধিক ভোট পাইয়াছিলেন, তাঁরা যে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করেন নাই, এটা নিতান্ত আহাম্মকেও বুঝিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা এখন আর বুঝিবার উপায় নাই বলিয়াই উভয় পক্ষকেই ছিনতাইর ব্যাপারে নিরপরাধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। দুই প্রধান পক্ষ ছাড়া আর ছোট ছোট যে সব পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথচ সব ভোট তাঁরাই পাইয়াছিলেন এমন দাবী করিতেছেন না। তারাও সকলের সাথে গলা মিলাইয়া দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দাবী করিতেছেন। তা যদি তারা নাও করিতেন, তবু ছিনতাইর ব্যাপারে তাঁদেরে কেউ দোষী মনে করিত না।

তবেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে, ছিনতাইটা করিল কে? ফৌজদারী অপরাধে পুলিশী তদন্ত করিবার সময় সকলের আগে অপরাধীর উদ্দেশ্য, 'মোটিভ অব্ দি ক্রাইম,' বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা কেউ নিহত হইলে পুলিশ সবার আগে তালাশ করেন: এই লোকটির মৃত্যুতে কে বা কাহারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হইয়াছে? ঠিক সেইরূপ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই অথবা পরের রাত্রের পাঁচজন পলাতক আসামীর হত্যা দ্বারা কে বা কাহারা বেশি লাভবান হয়েছেন?

আমি সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ব্যালট বাক্স ছিনতাই-এ লাভবান হইয়াছেন ভিসিসহ অধ্যাপকরা। আর পলাতক আসামী হত্যায় লাভবান হইয়াছেন আসামীদের পিতা-মাতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ সব অধ্যাপকই ছাত্রদের হিতৈষী। বিনা বাধায় শিক্ষালাভই ছাত্রদের ব্রত। নির্বাচনের হৈ-হুল্লায় ছাত্রদের পড়াশোনায় বিষম ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। নির্বাচনে তাঁদের প্রাণ-প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ ও স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি হয়। নির্বাচন-টির্বাচনের ঝামেলা

অবসান হইলে ছাত্ররা অখণ্ড মনোযোগে লেখা-পড়া শুরু করিবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যই অধ্যাপকরা ব্যালট ছিনতাই'র দ্বারা চিরতরে নির্বাচন বন্ধ করিবার ব্যাবস্থা করিয়াছেন। এতে অবশ্য পরিণামে শিক্ষার্থীদেরই লাভ হইয়াছে, কিন্তু সরল-মতি অবোধ ছাত্ররা তো আর নিজেদের লাভ-লোকসান সময়মত বুঝিতে পারে না। তাই ছাত্রদের লাভ-লোকসানটার কথা শিক্ষকদেরেই ভাবিতে হয়। ছাত্রদের পরিণাম লাভই শিক্ষকদের লাভ। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যালট ছিনতাই-এ অধ্যাপকগণই বেশি লাভবান হইয়াছেন।পাঠক বাকিটা বুঝিয়া লউন।

পলাতক আসামীদের হত্যার ব্যাপারটাও তাই। এদের বাপ-মারা কত দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। দক্ষ পুলিশ বাহিনীর নযর এড়াইয়া এরা বেশি দিন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিত না। একদিন ধরা পড়িতই। ধরা পড়িলে এদের জামিনের তদবিরে ও মামলা মোকদ্দমা পরিচালনে বাপ-মার কত দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইত। এদের হত্যায় বাপ-মা এই দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। কাজেই এদের মৃত্যুতে বাপ-মারাই বেশি লাভবান হইয়াছেন। এখানেও বাকিটা বুঝুন পাঠকরাই। আমি বুঝিতে পারিতেছি, পাঠকগণ আমার এই যুক্তির অকাট্যতা ও সিদ্ধান্তের অপ্রতিরোধ্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। কিন্তু মুখে স্বীকার করিবেন না। তার বদলে অনেকে বলিবেন: আপনার এই যুক্তি ও সিদ্ধান্ত হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর মুখেই সাজে। আপনার মুখে সাজে না। আমি জবাবে নিবেদন করিব: 'আগে সাজিত না ঠিকই, কিন্তু ইদানিং সাজার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।'

বস্তুতঃ দিনকাল যা পড়িয়াছে তাতে শ্রী শ্রী মহারাজ হবুচন্দ্র রাজা মহোদয় ও তদ্বীয় যোগ্যমন্ত্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত মাননীয় গবুচন্দ্র মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁ সাহেব তার অসাধারণ ভবিষ্যদৃষ্টি বলে পাকিস্তানে যে রেভলিউশন আমদানী করিয়াছিলেন, সেটা আজো থামে নাই। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিক কারণেই তার স্পীড বাড়িতেছে। অরবিট ও অ্যাকসিস্ উভয়দিকেই সে গতিবৃদ্ধি। মোটরের হর্স-পাওয়ারের কথা আজকাল সবাই শুনিয়াছেন। কিন্তু মোটরের শক্তিকে ঘোড়ার শক্তির সহিত তুলনা কেন করা হইল, তা হয়ত অনেকেই জানেন না। একেই তো আমাদের দেশে আজকাল ঘোড়ার ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে, তার উপর বর্তমান সরকার ঘোড়দৌড় বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ঘোড়ার গাড়ি তুলিয়া দেওয়ায় শহরের লোকেরা হয়ত কালে-ভদ্রেও ঘোড়া দেখেন না। তাই মফস্বলের

পাঠকদের মধ্যে যারা ঘোড়ায় চড়িয়াছেন তাঁদের অবগতির জন্য বা স্মরণ করাইবার জন্য বলিতেছি যে, ঘোড়া যত বেশিক্ষণ দৌড়ায় তার গতিবেগ তত বাড়ে। কথা আছে, ঘোড়া না ঘামিলে তেজ হয় না। মানুষ-সহ জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে একমাত্র ঘোড়ারই এই গুণ আছে। সেইজন্য মোটরের শক্তিকে সিংহ ব্যাঘ্রের মতো শক্তিশালী জীব বাদ দিয়া অর্থাৎ 'লায়ন পাওয়ার' বা 'টাইগার পাওয়ার 'না বলিয়া 'হর্স পাওয়ার' বলা হইয়া থাকে। সকল প্রকারের মোটরের মধ্যে আবার রেভলিউশনের হর্স পাওয়ার বেশি। কারণ মোটরেরও গতিটাই রেভলিউশন। এই রেভলিউশন যখন অন্য কোনও বস্তুর উপর ভর না করিয়া নিজেই ঘুরিতে থাকে তখন তার গতি স্বভাবতই বেশি হয়। এটা সহজ বুদ্ধির কথা। রেভলিউশন যখন মোটরের মতো একটা ভারী বস্তু ঘুরায় তখন স্বভাবতই ঐ ভারী বস্তুটার এ্যাকশান রি-এ্যাকশানে রেভলিউশনের স্পীড কিছুটা মন্দীভূত হয়। রেভলিউশন অন্য কোনো বস্তুকে না ধাক্কাইয়া নিজেই যদি ছুট দেয় তবে তার গতি হয় অবাধ। কাজেই বেশি দ্রুত। ধরুন, আপনি যদি একজনকে কাঁধে লইয়া দৌড় দেন, তবে একা দৌড়ের চেয়ে গতি কিছুটা মন্দীভূত হইবেই। তবে অবশ্য গাধার ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রম আছে। গাধার পিঠে যত বেশি ভারী বোঝা দিবেন, তত সহজে সে চলিতে পারিবে। ঘোড়া ও গাধা যে দুইটাই চতুষ্পদ জন্তু একমাত্র এক জায়গাই তাদের মিল আছে। ঘোড়াকে যত খাটাইবেন তার তত শক্তি বৃদ্ধি হইবে। গাধাকে যত বেশি ভারী বোঝা দিবেন, তার তত শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু আমরা ঘোড়ার কথাই বলিতেছিলাম। কারণ, আমাদের আলোচ্য বিষয় রেভলিউশন। রেভলিউশন যত বেশি ঘুরে তার গতিবেগ তত বেশি বাড়ে। আশা-করি এই সহজ কথাটা কাউকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এটা নিতান্ত টটলজি বা পুনরুক্তিও নয়। কারণ, মানুষকে মানুষ হইতে বলায় টটলজির দোষ হয় না, রেভলিউশনের মধ্যে এই স্বয়ংক্রিয়তা আছে বলিয়াই আইয়ুব-ইয়াহিয়াকে তাড়াইয়াও আমরা তাদের রেভলিউশন ছাড়ি নাই। বাঙ্গালিসহ এই উপমহাদেশের লোকেরা বড়ই গুণগ্রাহী। উপমহাদেশ থেকে আমরা ইংরাজ তাড়াইয়াছি বটে, কিন্তু তাদের পার্লামেন্টারী প্রথার শাসনবিধিটা রাখিয়া দিয়াছি। আমরা বাঙ্গালিরা পশ্চিমা মিলিটারী শাসকদের পিটাইয়া-তাড়াইয়াও তাঁদের রেভলিউশনটা ছাড়ি নাই। বরং আমাদের পজিশন-অপজিশন উভয় শ্রেণীর মধ্যে কে কত বেশি রেভলিউশনারি তা লইয়া রীতিমত প্রতিযোগিতা করিতেছি। রেভলিউশনের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের জন্য এ-দল ও দলকে 'বিট্রেয়ার অব-

রেভলিউশন' বলিয়া গাল-মন্দ পারিতেছেন। অতএব, আমাদের নেতাদের মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও শাসন-শোষণ সম্পর্কে যত মতভেদই থাকুক, রেভলিউশনের প্রতি আনুগত্য তাঁদের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই।

পজিশন-অপজিশন উভয় পক্ষ হইতে জোর আসিয়া আমাদের রেভলিউশন এত দ্রুত গতিতে চলিতেছে যে মহারাজ হবুচন্দ্রের যুগ ফিরিয়া আসিতে খুব বেশি দেরী থাকিবার কথা নয়। পাঠকগণের হাতের কাছে কোনও বিজ্ঞানের বই, অন্ততঃপক্ষে একটা ডিকশনারী থাকিলে তাই খুলিয়া রেভলিউশন শব্দটার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করুন। যে বিন্দু হইতে ঘুরা আরম্ভ সেখানে ফিরিয়া আসার নামই রেভলিউশন। এই রেভলিউশন সঠিক পথে চালাইতে পারিলে যে বিন্দু হইতে আমরা ছুটিয়াছিলাম সেই বিন্দুতেই আসিব, এটা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। শুধু প্রশ্ন থাকিবে শুরুর বিন্দুতে কতদিনে পৌঁছিতে পারিব? রেভলিউশনের গতি বাধাপ্রাপ্ত হইলেই এ কাজে বিলম্ব ঘটে। আমাদের নেতাদের একদল যদি রেভলিউশন করিতেন, আরেক দল যদি বাধা দিতেন, মানে তারা যদি কাউন্টার রেভলিউশনারি হইতেন তবে আমাদের অগ্রগতি মন্দ হইত। ফলে শুরু বিন্দুতে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের পজিশন-অপজিশন কোনও দলের মধ্যেই কাউন্টার রেভলিউশনারি নাই। উভয় পক্ষই সমান রেভলিউশনারী হওয়ায় আমাদের রেভলিউশনের গতি ডবল হইয়া উঠিতেছে।

রেভলিউশন হয় সার্কেলে। সার্কেল মানে বৃত্ত বা চক্র। বৃত্তের শেষ বৃত্তান্ত। আর চক্রের শেষ চক্রান্ত। অতএব রেভলিউশনে বৃত্তান্ত ও চক্রান্ত দুইটাই থাকিতে হইবে। একটার প্রকাশ ঐতিহাসক বস্তুবাদে। অপরটার বিকাশ সশস্ত্র সংগ্রামে। বস্তুবাদ ছাড়া কথা নাই। সংগ্রাম ছাড়া কাজ নাই। কাজেই পজিশন-অপজিশন দুই পক্ষ মিলিয়া যে রেভলিউশান সাধন করিতেছেন, তার বৃত্তান্তের ও চক্রান্তের দিকে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যেখান হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন, আমরা সত্বর সেখানে পৌঁছিব, তার আলামত দেখা যাইতেছে। ধরুণ আগেকার দিনে পুলিশ-সূত্র হইতে বলা হইত আমরা অত-অত দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার করিয়াছি। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করিয়াছি। আজকাল পুলিশসূত্র হইতে সগৌরবে ঘোষণা করা হয়; 'অমুক থানার অমুক গ্রামে অত-অত জন দুষ্কৃতিকারীকে আমরা নিহত করিয়াছি।' প্রতি দিনের খবরের কাগজেই এমনি নিহত ও হত্যার খবর থাকে। 'জনতা কর্তৃক পিটাইয়া দুষ্কৃতিকারী হত্যার' খবরও অনেক থাকে। পুলিশ ও দুষ্কৃতিকারীর মধ্যে গুলী

'বিনিময়,' 'পুলিশের হাতে দুষ্কৃতিকারী হত্যা,' 'দুষ্কৃতিকারীর হাতে পুলিশ হত্যা', আততায়ীর হাতে রাজনৈতিক কর্মী হত্যা' ইত্যাদি লোমহর্ষক খুন-খারাবির খবর আজকাল খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ভরিয়া থাকে।

আর ঐ সঙ্গে থাকে মন্ত্রী ও নেতাদের বক্তৃতা, 'আহবান' নির্দেশের' খবর। তাতে থাকে ফলনা মন্ত্রী দুষ্কৃতিকারীদেরে নির্মুল করিতে চাহিতেছেন, দেশ ও সমাজের দুশমনদের উৎখাত করিবার জন্য দেশবাসীকে নির্দেশ দিতেছেন। ফলানা নেতা পার্টি-কর্মী ও দেশবাসীকে গ্রাম্য-রক্ষী দল গঠন করিয়া সমাজ শত্রুদের নিপাত করিতে বলিতেছেন। রোজই এ সব ঘটিতেছে। দেশবাসী ও খবরের কাগজের পাঠকদের পক্ষে 'দুঃখিত' ও 'মর্মাহত' হওয়া আর সম্ভব হইতেছে না। রোজ রোজ আর কত মর্মাহত হওয়া যায়? তার বদলে তাঁরা এখন আতংকিত হইতেছেন।

ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাবের আতংকের কথা নয়।দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কথাও। দেশের শাসকদল শান্তি-শৃংখলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমাজ-শত্রুদের ধরিয়া পুলিশের হাতে সোপর্দ্দ করিতে জনগণকে বলিতেছেন না। 'নির্মুল' করিতে বলিতেছেন। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী দুষ্কৃতিকারীদের 'নিহত' করার খবর সগৌরবে ঘোষণা করিতেছেন। 'পুলিশের দুষ্কৃতিকারী হত্যা' ও দুষ্কৃতিকারীর পুলিশ হত্যাকে একই পর্যায়ের একই গুরুত্বের ঘটনা মনে করা হইতেছে। এতদ্বারা পুলিশ ও দুষ্কৃতিকারীকে শান্তি রক্ষক ও শান্তির শত্রুকে যে একই ক্যাটাগরিতে ফেলা হইতেছে, সে কথা কেউ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য পুলিশের গুলী চালাইবার অধিকার ও আবশ্যকতা আগের দিনেও ছিল। কিন্তু তৎকালে পুলিশের গুলীতে একটা লোক খুন বা জখম হইলে কর্তৃপক্ষ কত কৈফিয়ত দিতেন। 'গুলী ছোড়ার আগে হুঁশিয়ারী দেওয়া হইয়াছিল,' নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যই গুলী ছুড়িতে পুলিশ বাধ্য হইয়াছিল, 'গুলী ছুড়িবার আগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের হুকুম লওয়া হইয়াছিল,' 'গুলী ছুড়িবার মতো মর্মান্তিক কাজ করিতে বাধ্য হওয়ায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং স্বয়ং সরকারও দুঃখিত,' 'পুলিশের গাড়িতে করিয়া নিহত আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে' ইত্যাদি ইত্যাদি ধরণের কৈফিয়ত সরকার পক্ষ হইতে দেওয়া হইত। তার মানে তৎকালে পুলিশের গুলী ও দুষ্কৃতিকারীর গুলীর মধ্যে একটা মর্যাদার পার্থক্য করা হইত। একটা শান্তিরক্ষাকারী গুলী নিতান্ত অনিচ্ছায় ও বাধ্য হইয়াই করা হইয়াছে, উপর হইতে মর্যাদার স্তর হইতেই তেমন কথা বলা হইত। শান্তি ভঙ্গকারী দুষ্কৃতিকারীর গুলির সাথে ওটা 'বিনিময়ের' যোগ্য একই শ্রেণীর কাজ নয়, দেশবাসীকে সে বিষয়ে সচেতন রাখা হইত। যে যত বড় অপরাধীই হউক, কেউ তাকে হত্যা করিতে পারে না, এ কথা সরকার ও নেতাদের পক্ষ হইতে সর্বদা স্মরণ করান হইত।

আজকালের শাসকরা এমন ধরনের কথা আর বলিতেছেন না। শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা অধিকার একমাত্র আদালতের আছে, আর কারও নাই, স্বয়ং পুলিশ বা

সরকারেরও নাই। আগের দিনে এ কথা দেশবাসীকে মনে রাখিতে বলা হইত। এমন উপদেশ সরকার, মন্ত্রী ও নেতাদের পক্ষ হইতে সব সময়ে দেওয়া হইত। এটাই যে 'আইনের শাসন' এমন আইনের শাসন ছাড়া যে দেশের শান্তি-শৃংখলা আসিতে বা অন্য কোনও কল্যাণ আসিতে পারে না– আজকালের শাসকরা এ সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা তারা দেশ শাসনের প্রচলিত মূলনীতি 'বিপ্লবী' পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন।

দেশের গভর্ণমেন্ট যে সাধু-অসাধু, সৎ-অসৎ, পাপী-পুণ্যবান, অপরাধী-নিরপরাধী অভিযুক্ত অভিযোগকারী, অত্যাচারী-অত্যাচারিত সকল নাগরিকেরই সরকার, গভর্ণমেন্টটা যে কোন শ্রেণী বা দলের নয়, কে দোষী কে নির্দোষ তার বিচার করিবার একমাত্র মালিক যে আদালত, বিচারের আগে সকলেই সে সরকারের আশ্রয় পাইবার সমান অধিকারী, এসব কথা যেন আজকার সরকার ও শাসকদল ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা এসব কথা তারা আর মানেন না। চট্টগ্রাম জিলায় সাতকানিয়া থানার চরনীতে 'পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ষাটজন দুষ্কৃতিকারীর নিধনের' সংবাদটা শান্তি-রক্ষাকারী সরকার ও শান্তিভঙ্গকারী দুষ্কৃতিকারীদের সংঘর্ষের তাৎপর্য বহন করে না। বহন করে যুদ্ধমান দুই পক্ষের সংঘর্ষের তাৎপর্য। যে পরিবেশে এটা ঘটিতে পারে, যে মনোভাবে এমন সংবাদ প্রচার, পাঠ ও শ্রবণ করা যায়, সেটা নিশ্চয় শুভ নয়।

কিন্তু এটা স্থূলদৃষ্টি কাউন্টার রেভলিউশনারী ও প্রগতি বিরোধী প্রাচীন পন্থীদের চিন্তা-ভাবনা। ওরা সব নূতনের বিরোধী। ওরা কোনও পরিবর্তনই সহ্য করিতে পারে না। এই জীর্ণ-পুরাতন ফসিলেরা মনে করে তাদের আমলে যা যা ছিল সবই ভাল। আর তরুণদের যা যা আছে সবই খারাপ। ওদের কথায় কান দিলে বিপ্লব চলে না। ওদের কথা শুনিলে অর্থে নামক প্ল্যানেটটির রেভলিউশন করে স্তব্দ হইয়া যাইত।

অতএব ব্যালট ছিনতাই বা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পাইকারী হত্যায় দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। ফসিলেরা এটাকে তাদের জয় প্রমাণের জন্য হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্রের কথা তুলিবে। কিন্তু আসলে ছিনতাইটা পুঁজিপতিদের ধন হরণের একটি বিপ্লবী পন্থা এবং পাইকারী হত্যা নক্সালীদের খতম টেকনিকের একটা রণ-কৌশল মাত্র। জয় বিপ্লবের হইবেই।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

শিল্প-কারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের শরীক কর

. বাংলাদেশ ফেডারেশন-অব-চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের সভাপতি গত শুক্রবার একটি মূল্যবান বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি আসলে বঙ্গবন্ধুর সরকারের নিকট একটি আবেদন। এই আবেদনে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা সাধারণভাবে এবং শিল্প-বাণিজ্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কথাগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা ধরিয়া লওয়া যায়, সভাপতি সাহেব ফেডারেশনের পক্ষ হইতেই কথা বলিয়াছেন; ব্যক্তিগতভাবে বলেন নাই। তা যদি সত্য হয় তবে ব্যক্তিগতভাবে বিবৃতির আকারে এসব কথা না বলিয়া ফেডারেশনের প্রস্তাব আকারে অথবা সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি হিসাবে পেশ করিয়া তারই কপি সংবাদপত্রে ছাপানো উচিত ছিল। সভাপতি সাহেবের ব্যক্তিগত মর্যাদা হেয় না করিয়াও একথা বলা চলে যে, ফেডারেশনের প্রস্তাবাকারে অথবা স্মারকলিপি হিসাবে এসব অভিমত প্রকাশ করিলে অনেক দিক হইতেই বেশি কাজে লাগিত। প্রথমতঃ তাতে বিভিন্ন দিককার সমস্যাসমূহের বিবরণের সাথে তাদের সমাধানের সুপারিশও থাকিত। দ্বিতীয়তঃ ঐ কারণে প্রস্তাব বা স্মারকলিপির বিষয়বস্তু সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে বিবেচিত হইত এবং সেই দফতরের নির্দেশ মতো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সব বিষয় আলোচিত ও মীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হইত। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এটা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। সভাপতি সাহেব ফেডারেশনকে দিয়া এই কাজ এখনও করাইতে পারেন। সভাপতি সাহেবের বিবৃতিতে সরকারী নীতি সংশোধন-পরিবর্তনের সুপারিশের ইংগিত আছে। কাজেই এটা ধরিয়া লওয়া যায়, ফেডারেশন সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে মৌল, ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতে চান। এ ধরনের কথা সুপারিশ সরকারের বলাই ভাল। ফেডারেশনের মতো দায়িত্বশীল ও কর্তব্যবোধসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের কথা তেমনভাবে প্রকাশ করা উচিৎও। অপজিশন লিডারদের অনেকের মত সরকারের শুধু সমালোচনা করিয়াই দায়িত্ব শেষ করা ফেডারেশনের মতো প্রতিষ্ঠানের উচিৎ হইবে না। দেশের কল্যাণের খাতিরে ত বটেই, সাধারণ ন্যায়-নীতির খাতিরেও কারো ত্রুটি দেখাইতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে ত্রুটির প্রতিকারটাও দেখান উচিৎ। আশা করি ফেডারেশনের সভাপতি বিশেষভাবে এবং মেম্বার সাহেবান সাধারণভাবে, এ কাজে উদ্যোগী হইবেন। সে উদ্যোগে বিলম্ব করিবেন না। কারণ সভাপতি সাহেব তাঁর বিবৃতিতে ঠিকই বলিয়াছেন: 'এ সব ব্যাপারে এই মুহূর্তে পদক্ষেপ না নিলে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে।'

ফেডারেশনের সভাপতি সাহেব অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য, বিদেশী মুদ্রা ও আইন-শৃংখলা ইত্যাদি প্রায় সব জরুরী ব্যাপারেই কথা বলিয়াছেন। আমি স্বভাবতঃই আজকার আলোচনার জন্য একটি বিষয় বাছিয়া লইতেছি। সে বিষয়টি হইতেছে আমাদের শিল্প-কারখানা। সভাপতি সাহেব বলিয়াছেন যে শিল্প-কারখানা, বিশেষতঃ পাটকল বন্ধ হইতেছে তারা পৌনঃপুনিক লোকসান খাইতেছে; শিল্প উৎপাদন মারাত্মকরূপে হ্রাস পাইতেছে। সভাপতি সাহেবের এসব কথাই সত্য। এই অবস্থার কারণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন; 'স্বাধীনতার পর শিল্পে অভিজ্ঞ অস্থানীয় পুঁজিলগ্নিকারী লোকেরা বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাতে শিল্পক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কতিপয় বৃহৎ-শিল্পের বাঙ্গালি লগ্নিকারীরাও দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানাগুলিতেও ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এতেই উৎপাদন প্রতিনিয়ত ব্যাহত হইতেছে।' পরিচালক সম্বন্ধে সভাপতি সাহেব এই যে সব কথা বলিয়াছেন, তার সাথেও দেশবাসী মোটামুটি একমত হইবে। আমি নিজেও মোটামুটি এরূপ ধারণাই পোষণ করি। শিল্পের আসল পরিচালক যে শ্রমিকরা তাদের সম্পর্কে সভাপতি সাহেব বলিয়াছেন: ধর্মঘট, ঘেরাও, অবিবেচনা প্রসূত ও অসংগত মজুরি দাবি। কোন মুনাফা অর্জনের আগেই বোনাস দাবি, উৎপাদনে অংশ গ্রহণ না করিয়াই মজুরি দাবি ইত্যাদি আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। এসব কথাতেও আমাদের দ্বিমত নাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এমন হইবার কারণ কি? সে সব কারণ দূর করিবার উপায় কি? উপায় নিশ্চয়ই আছে এবং একাধিকই আছে। সে সব উপায় সম্পর্কে আলোচনা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বিভাগীয় মন্ত্রী আছেন। তাঁকে সাহায্য করিবার জন্য পার্লামেন্টারি হাউস কমিটি আছেন। প্ল্যানিং কমিশনের বিশেষজ্ঞরা আছেন। তাঁরা সকলে মিলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তা প্রয়োগ করিবার জন্য মন্ত্রণালয় আছেন। নাই কি? সবই আছে। সবাই আছেন। তাঁরা সবাই যার তাঁর কাজও নিশ্চয়ই করিতেছেন। নিশ্চয়ই করিতেছেন এই জন্য যে, কিছু না করিয়া তাঁরা মাহিয়ানা খাইতেছেন। এটা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা যে কি করিতেছেন দেশবাসী তা জানিতে পারিতেছে না। জানিতে পারিতেছে না এই জন্য যে, সমস্যাগুলির কোনও সমাধান হইতেছে না। সমাধানের যে চেষ্টা হইতেছে, সে সম্পর্কে যে সংশ্লিষ্ট সকলে আলোচনা ও ডিবেট করিতেছেন, তারও কোনও প্রমাণ দেশবাসী পাইতেছে না। দেশবাসীর সামনে এ সব আলাপ আলোচনা উপস্থিত হয় ওপেন ডিবেটে, খোলাখুলি আলোচনায়। তেমন আলোচনা ডিবেট হয় পার্লামেন্টে, পার্লামেন্টারি হাউস কমিটিতে। তেমন আলোচনা বিতর্কের রিপোর্ট প্রকাশ হয় খবরের কাগজে, প্রচার হয় রেডিও-টেলিভিশনে। বিভাগীয় যে আলোচনা বিতর্ক প্রকাশ্যে হইতে পারে না, তাও

দেশবাসীকে শোনান হয় সরকারের প্রচার দফতরের হ্যাণ্ডআউট, প্রেসনোট ও প্যামফ্লেট পুস্তিকার মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সরকারী প্রচারদফতর এ বিষয়ে অতিশয় দুর্বল ও নিতান্ত নিষ্কর্মা। সরকারের বহু ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দু'চারটা ঠিক কাজও নিশ্চয়ই তারা করিয়াছেন। সমস্যাসমূহের সমাধান আজও হয় নাই বটে, কিন্তু সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চেষ্টার বিরাম নাই। প্রচারদফতর হইতে এ সবের সঠিক বিবরণ প্রচারিত হওয়া দরকার। তার মানে সরকারের সাফল্যে-অসাফল্যে, ভাল-মন্দে, সকল অবস্থায় জনগণকে কনফিডেন্সে নেওয়া, সরকারী চিন্তা-ভাবনায় জনগণকে শরিক করা, গণতন্ত্রী সরকারের বড় দায়িত্ব এবং প্রথম কর্তব্য। আমাদের পার্লামেন্ট প্রায় এক পার্টি সংসদ বলিয়া এখানে কোনও প্রাণবন্ত বিস্তারিত ও শিক্ষাপ্রদ ডিবেট হয় না। পার্লামেন্টারি রাজনীতির জন্য এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এ জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে দায়ী করা যায় না। যত দোষ ভোটারদের। ভোটারদের দোষ ও পরিণামে রাজনৈতিক নেতাদেরই দোষ যারই হোক, আমাদের দেশের বাস্তব সত্য এই যে, আমাদের পার্লামেন্ট কার্য্যতঃ একদলীয় পার্লামেন্ট। এমন অবস্থায় রুলিং পার্টিকেই পজিশন-অপজিশন উভয়পক্ষের ভূমিকা পালন করিতে হয়। অভিজ্ঞতার অভাবে বর্তমান রুলিং পার্টির পক্ষে এটা সম্ভব হইতেছে না। ফলে পার্লামেন্টের এই ভূমিকা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল রেডিও এবং সংবাদপত্রের। রেডিও ও সংবাদপত্রকে আমি একই পর্যায়ে ফেলিলাম এই জন্য যে, কোনও কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রেডিও ও সংবাদপত্র দুইটাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সেই কারণে আমাদের দেশে এ দুইটাই সরকারী প্রতিষ্ঠান। রেডিও-টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানটি আমরা সরকারীযন্ত্র হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি। আর সংবাদপত্রকে আমাদের সরকার সরকারীযন্ত্র হিসেবে অর্জন করিয়াছেন। ফলে এক-আধখানা সংবাদপত্র ছাড়া আর সবাই মন্ত্রীদের সব কাজে 'মারহাবা, মারহাবা' করিয়া চলিয়াছেন। ফলে আইউবী ট্রেনিং প্রাপ্ত অতি চালাক সাংবাদিকরা নিতান্ত 'হাবা' সাজিয়া মন্ত্রীদের যে কোথায় 'মার' দিতেছেন, স্বয়ং মন্ত্রীরাও তা বুঝিতেছেন না। মূঢ়দেশবাসী ত নয়ই। এই অবস্থার সুযোগে যাঁর যা খুশি বলিয়া যাইতেছেন। কারণ কারও কথা কেউ রাখিতেছেন না। কান পাতিয়া কেউ কারও কথা শুনিতেছেন না। বুঝিবেন কি? বক্তারা নিজেরাই নিজের কথা বুঝিতেছেন না। কারণ বুঝিবার বা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কেউ কথা বলিতেছেন না। বরঞ্চ কেউ তাঁর কথা শুনিতেছেন না এটা জানিয়া সকল চক্রই যা-তা বলিতে শুরু করিয়াছেন। সবাই ভাবিতেছেন, কেউ যখন তাঁর কথা শুনিতেছেন না তখন বাক্যকে অর্থপূর্ণ করিয়া লাভ কি? এই কারণেই বক্তার কোন দায়িত্ব নাই শ্রোতার প্রতি। সংবাদপত্রের কোনও দায়িত্ব নাই পাঠকদের প্রতি। দোকানদারের কোনও দায়িত্ব নাই খরিদ্দারের প্রতি। মেম্বারদের কোনও দায়িত্ব নাই ভোটারদের প্রতি। এই সব না থাকার

গোড়ার কথা; শাসকের কোনও দায়িত্ব নাই শাসিতের প্রতি। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে বিস্ময়কর। বক্তারা অর্থপূর্ণ কথা বলেন না বলিয়া শ্রোতারা নিজেরাই অর্থপূর্ণ চিন্তা শুরু করিয়াছেন। সংবাদপত্রেরা সরকারের সমালোচনা করেন না বলিয়া পাঠকরা নিজেরাই সরকারের সমালোচনা শুরু করিয়াছেন। পার্লামেন্টে সরকারবিরোধীদল নাই বলিয়া গোটা দেশটাই বিরোধীদল হইয়া গিয়াছে। সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু প্রচারের অভাব ও বিপক্ষে প্রচারের প্রাদুর্ভাবই এই বিপর্যয়ের কারণ। সরকারী প্রচারদফতরের ব্যর্থতার এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সরকারী-বেসরকারী সব প্রচার বিভাগেরই আধুনিক নাম পাবলিক রিলেশনস্ ডিপার্টমেন্ট। অতি সুন্দর নাম। অর্থবহ নাম। সরকারী ব্যাপারের বেলায় পাবলিক রিলেশনস্ বিভাগ সরকার পরিচালনায় সক্রিয় গণ-শরিকানা মাস্ পার্টিসিপেশন ইন্ দি এডমিনিস্ট্রেশন, স্থাপন করিয়া সত্য-সত্যই পাবলিক রিলেশন্স দফতরে পরিণত হইতে পারে। বাংলাদেশের এক দলীয় পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে প্রচার দফতরের এদিককার দায়িত্ব আরও বেশি ছিল। তার বদলে প্রচার দফতর যা করিয়াছেন তাতে কুল্লে দুইটি কাজ হইয়াছে: একটি নেগেটিভ অপরটি পজেটিভ। নেগেটিভ এই দফতর অতীতের কিছু ভুল 'প্রতিবাদ' বাহির করিয়াছেন। আর পজিটিভলি মন্ত্রী-মেম্বাররা হাতী-ঘোড়া মারিয়াও, আসমানের চান ধরিয়া আনিয়া 'সোনার বাংলা' গড়ার ভবিষ্যতের যে সব ওয়াদা করেন, ঢাক-ঢোল পিটাইয়া সে সব প্রচার করিয়াছেন। বর্তমানের কোনও কথাই তাঁরা বলেন নাই। প্রচার দফতরের এই ব্যর্থতার দরুণই বোধ হয়, প্রধানমন্ত্রী তিন তিন বার প্রচার-দফতরের দায়িত্ব হস্তান্তর করিয়া অবশেষে নিজের হাতে লইতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখা যাক, এবার কি হয়।

কথায় কথায় অনেক দূরে চলিয়ে গিয়াছিলাম। এবার শিল্পকারখানায় ফিরিয়া আসি। ফেডারেশনের সভাপতি সাহেব আমাদের শিল্প কারখানার অব্যবস্থা বিশৃংখলা ও তজ্জনিত উৎপাদন হ্রাসের অনেক কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি আজ তার মধ্যে মাত্র একটির আলোচনা করিব। সেটা, শ্রমিক সমস্যা। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদের শিল্প সেক্টরের সমস্ত লোকসানের বড় কারণ শ্রমিক অসন্তোষ। এমনকি ব্যবস্থাপক পরিচালকদের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির দরুণ মিল কারখানার কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি চুরি জারির যে সব অভিযোগ শুনা যায় এবং তার ফলে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে বলা হয়, সে সবেরও মূলে রহিয়াছে ঐ শ্রমিক অসন্তোষ। কারণ আমি বিশ্বাস করি, সন্তুষ্ট শ্রমিক শুধু মিল কারখানা চালু রাখেন না, তাঁরা মিলের হেফাজত ও পাহারাদারিও করেন। প্রায় সব মিল-কারখানার শ্রমিকরা মিল এলাকাতেই বাস করেন। তাঁরা উদাসিন না হইলে অথবা সহযোগিতা না করিলে পরিচালক ম্যানেজারেরা মিলের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি অবৈধ বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারেন না। কাজ না করিয়া বসিয়া বেতন

খাওয়া বা ভৌতিক শ্রমিকদের নামে বেতন ড্র করা, ইত্যাদি সব দুর্নীতির কথা ফেডারেশনের সভাপতি সাহেব বলিয়াছেন, তার সবগুলির মূলে আছে অসন্তোষ।

কেন এই শ্রমিক অসন্তোষ? আমাদের সরকার প্রায় সবগুলি মিল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন। এখন হইতে সব মিল-কারখানার মালিক আর কতিপয় পুঁজিপতি নন। মিল-কারখানার মালিক এখন গোটা জাতি, বিশেষ করিয়া শ্রমিকরা নিজেরাই এই ধরনের উদ্দীপনাময়ী মর্মস্পর্শী অনেক বক্তৃতা মন্ত্রীরা করিয়াছেন। শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে সেগুলিতে জনগণের অংশ হিসাবে শ্রমিকদেরও মালিকানা বর্তায়, আমাদের শ্রমিকরাও তাদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, তা ভালরূপ জানেন। তাছাড়া বর্তমান জনপ্রিয় সরকার বেতন-ভাতা সম্পর্কে শ্রমিকদের কিছু কিছু সুবিধাও দিয়াছেন। তবুও শ্রমিকরা সন্তুষ্ট নন কেন?

আমার বিবেচনায় সমাজবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিকদের মিল-কারখানা পরিচালনে শরিক না করার দরুণই এই অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্প পরিচালনে 'শ্রমিকদের শরিকানা' লেবার পার্টিসিপেশন ইন ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট পুঁজিবাদী সমাজেও অজানা নয়। পাকিস্তান আমলেও কথাটা ভারতবর্ষে চালু করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পার্টিসিপেশনের এলাকা ছিল খুবই সংকীর্ণ। তৎকালীন ওয়ার্কস কমিটি শ্রমিক-মালিকদের যুক্ত কমিটি হইলেও শ্রমিক মালিকদের মধ্যেকার মামলা নিষ্পত্তি করার মধ্যেই তাদের এলাকা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। সমাজবাদও আমরা রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূলনীতিরূপে সংবিধানে গ্রহণ করিয়াছি। অনেকগুলি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছি। অথচ সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের ভূমিকা আজও নির্ধারণ ও নির্দেশ করি নাই। স্বাধীনতার পরে আমাদের সরকার যে শ্রমনীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাতেও শ্রমিকদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নাই। সংবিধান চালু হইবার পর যে সমাজবাদী অর্থনীতিক ভিত্তিকে শ্রমনীতি ঘোষণা করার কথা ছিল তা আজও করা হয় নাই।

তবু ঘোষণাটা বড় কথা নয়। কাজটাই বড় কথা। এই কাজটাই হইল শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের সক্রিয় শরিকানা। পুঁজিবাদী শিল্পেই হউক আর সমাজবাদী শিল্পেই হউক। মালিকানাটা আসলে থিওরেটিক্যাল কথা। শুধু শিল্প-কারখানায় নয় সব সম্পদ ও সম্পত্তি সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। মালিকানাটা এখানে মাত্র কাগজী ব্যাপার। পরিচালন ও ভোগটাই বড় কথা। সমাজবাদী রাষ্ট্রের শিল্প-কারখানার শ্রমিকের স্থান নির্দেশ করা হয় সর্বপ্রথম নেহেরু নেতৃত্বের ভারতে ১৯৫৬ সাল। ঐ সালে ভারত সরকার যে শ্রমনীতি ঘোষণা করেন তাতে বলা হয় ঃ "সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকরা শিল্পের অংশীদার পার্টনার। এই অংশীদারত্ব পরিচালনায় প্রতিফলিত হইবে।

পরিচালক, টেকনিশিয়ান শ্রমিকদের যুক্ত পরামর্শে সব শিল্প চলিবে। পাবলিক সেক্টরের শিল্পসমূহকেই এ ব্যাপারে পথ দেখাইতে হইবে।"

মনে রাখিতে হইবে, ভারত আমাদের মতই সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইলেও আমাদের মত ভারতের সংবিধান সমাজবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। এই কারণে এ ব্যাপারে শ্রমিকদের কাছে আমাদের সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। এ দায়িত্ব শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এটা বাস্তব দায়িত্বও বটে। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি হিসেবে শ্রমিকরা শিল্পের মালিক সত্য, কিন্তু পরিচালনায় হাত না থাকিলে সে মালিকানা কাগজী অধিকার মাত্র। বাস্তব জীবনে তা নিতান্তই অর্থহীন। পরিচালনা মানে, শিল্পে কি বস্তু, কত পরিমাণে, কত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইবে, তার খরচ কত পড়িবে, কত মুনাফা হইবে, প্রতিষ্ঠানের কার কত বেতন হইবে, কার কি এলাকা ও কার কি ক্ষমতা থাকিবে, সে সবই ঠিক করিবেন যে বোর্ড, সেই বোর্ডে শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবেন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিকানার দুই শরিক। সরকার ও শ্রমিক। পরিকল্পনা বোর্ডে দুই শরিকের প্রতিনিধিদের মধ্যে কি রেশিও থাকিবে, সেটা প্রথমতঃ সরকারী শ্রমনীতিতে ঘোষণা করা হইবে। পরে সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই এর খুঁটিনাটি নির্ধারিত হইবে।

শ্রমিকদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সরকার শ্রমিকদের উপর আস্থা রাখুন। শিল্প-পরিচালনায় তাঁদের দায়িত্ব দিন। দেখিবেন, শিল্পে স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিতেছে।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৩

স মা প্ত